RICE IAS

RICE IAS - এর সাথে শুরু হোক
আপনার **UPSC CSE** প্রস্তুতির যাত্রা।

এপ্রিল -2026

MAINS- এর জন্য প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS

Sealdah, Kolkata 8100819447
Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849
At Adamas University 8100971442

RICE IAS

Daily Deep Analysis

for IAS Mains

- ***In-depth*** coverage of ***micro-topics*** from the ***UPSC GS Mains syllabus***
- One ***GS Mains topic*** covered ***comprehensively*** every day
- ***Systematic*** GS Mains syllabus ***mapping***
- Focused coverage of ***GS Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions*** with model answers

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis on our website

SCAN this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849

At Adamas University 8100971442

RICE IAS

Daily Editorial Explained

for IAS Mains

- *UPSC **Mains-oriented editorial** decoding*
- ***Theme-based** conceptual clarity*
- *Clear linkage with **UPSC GS papers***
- *Focused coverage of **UPSC Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions** with model answers*

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis
on our website
SCAN
this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447
Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849
At Adamas University 8100971442

সূচক

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১ — 1

1.1. ভারতীয় সমাজ — 1

1.1.1. ভারতের "নীরব জনতান্ত্বিক বিপ্লব" — 1

1.1.2. রক্ত, আচার এবং পুনর্জন্ম: লালের অদৃশ্য ভাষা — 5

1.2. ভূগোল — 9

1.2.1. ভূমিকম্প — 9

1.3. ইতিহাস ও সংস্কৃতি — 14

1.3.1. ভারতীয় জাতীয় পতাকা ও প্রতীক — 14

1.3.2. মহাদ সত্যাগ্রহ — 18

2. সাধারণ অধ্যয়ন ২ — 22

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা — 22

2.1.1. হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ — 22

2.1.2. এক দেশ এক নির্বাচন — 25

2.1.3. রাজ্যপাল, সাংবিধানিক সীমারেখা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক — 28

2.1.4. ভারতের কারাগারে মহামারীর প্রাদুর্ভাব: জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্থানাভাব — 33

2.1.5. স্বেচ্ছামৃত্যু এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার — 36

2.1.6. NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ: বিচার বিভাগীয় দায়বদ্ধতা ও বাক-স্বাধীনতার পরীক্ষা — 38

2.1.7. যখন প্রধান বিচারপতি সরে দাঁড়ান: বিচারিক প্রত্যাহার এবং স্বার্থের সংঘাত — 42

2.1.8. স্বাধীনতা থেকে বাধ্যবাধকতা? বাধ্যতামূলক ভোটদান নিয়ে বিতর্ক। — 45

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — 49

2.2.1. ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতি — 49

2.2.2. ভারতের প্রতিবেশী নীতি — 52

2.2.3. হরমোজ প্রণালী (STRAIT OF HORMUZ) সংকট — 56

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার — 60

2.3.1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা — 60

2.3.2. সংঘাত ও অস্থিরতার মাঝে নারী অধিকার রক্ষা — 63

2.3.4. কর্তব্যের দায়বদ্ধতা: টিকা জনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি — 67

2.3.5. ভারতে শৈশব স্থূলতার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা — 70

2.3.6. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা: কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের পথ — 74

2.3.7. ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) বা টিবি — 78

3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ — 80

3.1. অর্থনীতি — 80

3.1.1. ভারতের নারী কৃষক — 80

3.1.2. ভারতের আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা — 84

3.1.3. ভারতের জন্য টেকসই জ্বালানি 87
3.1.4. ভারতে শ্রম সংস্কার: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিশ্রুতি বনাম কাঠামোগত বাস্তবতা 90
3.1.5. ভারতের জিডিপি (GDP) সিরিজের সংশোধন: মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব 95
3.1.6. ভারতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা(CSR) 99
3.1.7. জাতীয় গ্যাস গ্রিড 103
3.2. পরিবেশ 107
3.2.1. ভারতে জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা 107
3.2.2. জলবায়ু বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা: কঠোর প্রমাণ এবং ক্রস-ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ 111
3.3. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 115
3.3.1. ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 115
3.3.2. অ্যানথ্রপিক বনাম মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং ওপেনএআই-এর কৌশলগত প্রবেশ 118
3.3.3. সার্বভৌম এআই: ডিজিটাল যুগে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন 122
4. সাধারণ অধ্যয়ন 8 126
4.1. নীতিশাস্ত্র 126
4.1.1. অমর্ত্য সেনের 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ' বা সক্ষমতা তত্ত্বের সহজ পাঠ 126

***

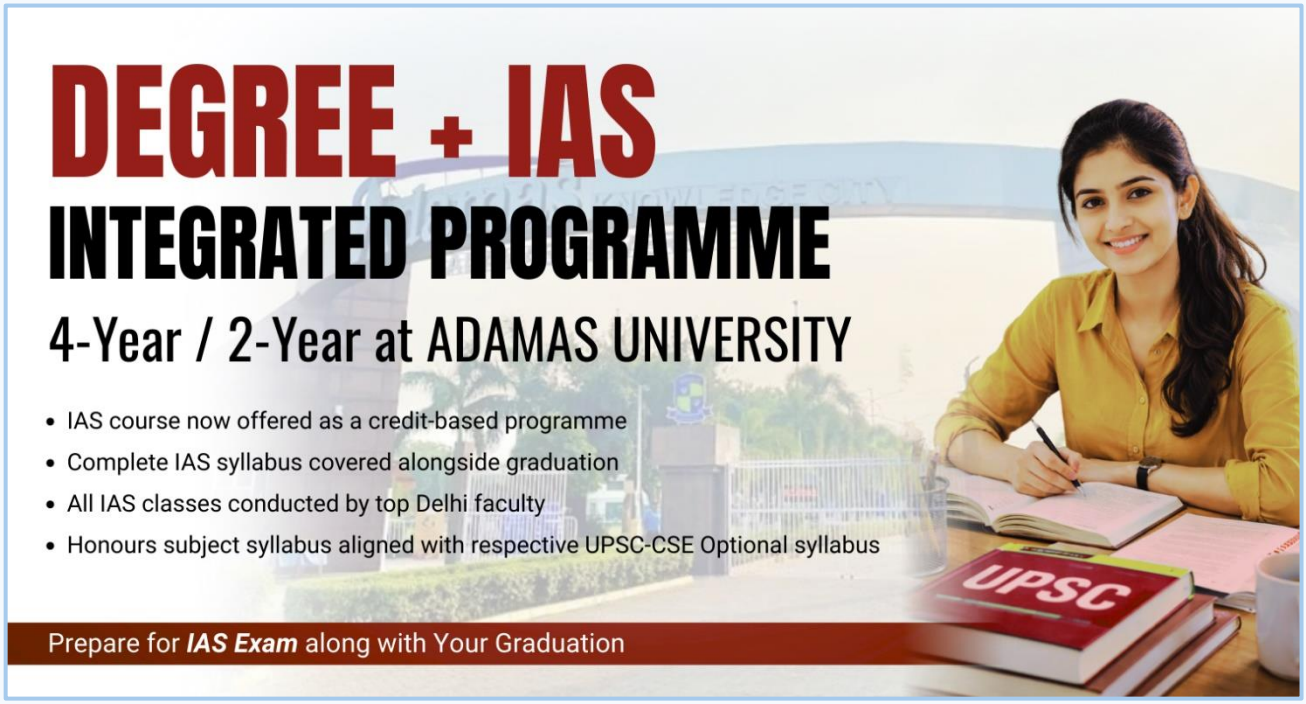

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ভারতীয় সমাজ

1.1.1. ভারতের "নীরব জনতাত্ত্বিক বিপ্লব"

প্রেক্ষাপট

ভারতের **"নীরব জনতাত্ত্বিক বিপ্লব"** বলতে উচ্চ প্রজনন হার থেকে নিম্ন প্রজনন হারের দিকে দ্রুত ও চূড়ান্ত পরিবর্তনকে বোঝায়। দেশ এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে মূল চ্যালেঞ্জ আর **"জনসংখ্যা বিস্ফোরণ"** নয়, বরং একটি **"খণ্ডিত উত্তরণ"** (Fragmented Transition) মোকাবিলা করা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ম্যালথাসীয় যুগ: "জনসংখ্যা বিস্ফোরণের" আতঙ্ক

১. **মূল যুক্তি: "জ্যামিতিক বনাম গাণিতিক"** থমাস ম্যালথাসের ১৭৯৮ সালের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারতের পরিকল্পনাবিদদের ভয় ছিল যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করলে **"পজিটিভ চেক"** বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বা মহামারী) অনিবার্য।

- **জনসংখ্যা:** বৃদ্ধি পায় **জ্যামিতিক** হারে (২, ৪, ৮, ১৬...)।
- **খাদ্য সরবরাহ:** বৃদ্ধি পায় **গাণিতিক** হারে (১, ২, ৩, ৪...)।
- **ফলাফল:** একটি **"ম্যালথাসীয় বিপর্যয়"** যেখানে জনসংখ্যা জমির **"ধারণ ক্ষমতা"** ছাড়িয়ে যায়।

২. **ভারত কেন আতঙ্কিত ছিল?**

- **বিশাল লাফ:** ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় **দ্বিগুণ** হয়ে গিয়েছিল (৩৬১ মিলিয়ন থেকে ৬৮৩ মিলিয়ন)।
- **মৃত্যুহার হ্রাস:** আধুনিক চিকিৎসা ও টিকার কারণে মৃত্যুহার কমলেও **প্রজনন হার** বা জন্মহার অনেক বেশি ছিল।
- **সম্পদের টানাপোড়েন:** খাদ্যের জন্য আমেরিকার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা (শিপ-টু-মাউথ) প্রতিটি বাড়তি জন্মকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছিল।

৩. **নীতিগত প্রয়োগ: "লাল ত্রিকোণ"**

- **বিশ্বে প্রথম:** ১৯৫২ সালে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে **জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি** চালু করে।
- **জবরদস্তিমূলক নীতি:** আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে **জরুরি অবস্থার** (১৯৭৫-৭৭) সময় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
  - লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।
  - গণহারে বাধ্যতামূলক **বন্ধ্যাকরণ** (Vasectomy)।
  - জনসংখ্যাকে একটি **"দায়"** (Liability) হিসেবে দেখা হয়েছিল যা নির্মূল করা প্রয়োজন।

৪. **পরিবর্তনের মোড়** দুটি "বিপ্লবের" ফলে ম্যালথাসীয় ভয় দূর হয়:

- **সবুজ বিপ্লব:** প্রমাণ করে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহও দ্রুত বাড়ানো সম্ভব।
- **গণতান্ত্রিক উত্তরণ:** দেখা যায় যে **সাক্ষরতা** (বিশেষ করে নারী শিক্ষা) বাড়লে কোনো সরকারি জবরদস্তি ছাড়াই প্রজনন হার স্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

বর্তমান পরিস্থিতি

সর্বশেষ SRS (Sample Registration System) পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী:

- **জাতীয় প্রজনন হার (TFR):** বর্তমানে কমে **১.৯**-এ দাঁড়িয়েছে, যা পুনস্থাপন স্তর বা **রিপ্লেসমেন্ট লেভেল (২.১)**-এর নিচে।
- **মোট জনসংখ্যা:** আনুমানিক **১৪৭ কোটি**। প্রজনন হার কমলেও **"জনসংখ্যা ভরবেগ"** (Population Momentum)-এর কারণে জনসংখ্যা এখনো বাড়ছে (কারণ প্রজননক্ষম বয়সে থাকা তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা অনেক বেশি)।
- **সাফল্য:** ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে **৩১টি** ইতিমধ্যেই রিপ্লেসমেন্ট লেভেল প্রজনন হার অর্জন করেছে। এমনকি **গ্রামীণ ভারতেও** প্রথমবারের মতো এই হার **২.১**-এ পৌঁছেছে।

আঞ্চলিক প্রজনন হার: বিভাজন রেখা

ভারত বর্তমানে দুটি ভিন্ন জনতাত্ত্বিক বাস্তবতায় বিভক্ত:

- **উত্তরণ-পরবর্তী দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত:** কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলোতে প্রজনন হার **১.৩ থেকে ১.৭**-এর মধ্যে। এটি ইউরোপের দেশগুলোর মতো এবং রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের (২.১) নিচে।
- **বিলম্বিত উত্তরণ উত্তর ও পূর্ব ভারত:** বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলো এখনও প্রজনন হার **২.৪ থেকে ২.৯**-এর মধ্যে। যদিও এখানে হ্রাসের গতি আগের চেয়ে অনেক বেশি, তবুও ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এরাই প্রধান অবদান রাখছে।

প্রজনন হার হ্রাসের কারণ

১. **প্রাথমিক সামাজিক-অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি**

- **নারী শিক্ষা ও সাক্ষরতা:** মেয়েদের স্কুল শিক্ষা বিয়ের বয়সকে পিছিয়ে দেয় এবং প্রজনন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়।
- **সন্তান লালন-পালনের খরচ ("সংখ্যার বদলে মান"):** অভিভাবকরা এখন অনেক সন্তানের বদলে একটি বা দুটি সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পেছনে বেশি বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন।
- **নগরায়ন ও আবাসন:** ছোট শহুরে অ্যাপার্টমেন্ট এবং মেগাসিটিগুলোতে জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় বড় পরিবার রাখা অসম্ভব করে তুলছে।
- **কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে সন্তান নেওয়ার **"সুযোগ ব্যয়"** (Opportunity Cost) বৃদ্ধি পায়, ফলে তারা দেরিতে সন্তান নেন।

২. **স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত কারণ**

- **শিশু মৃত্যুহার হ্রাস (IMR):** অতীতে শিশু মৃত্যুর হারের আশঙ্কায় মানুষ বেশি সন্তান নিত। স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি হওয়ায় সেই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে।
- **আধুনিক গর্ভনিরোধকের সহজলভ্যতা (mCPR):** সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গর্ভনিরোধকের বিভিন্ন বিকল্প (বড়ি, ইনজেকশন ইত্যাদি) সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।
- **বন্ধ্যত্বের বৈপরীত্য (Infertility Paradox):** শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার চাপ, দেরিতে বিয়ে এবং পরিবেশগত কারণে অনেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্তান নিতে পারছেন না, যা প্রজনন হারকে আরও কমিয়ে দিচ্ছে।

৩. **আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন**

- **সামাজিক মর্যাদা:** ছোট পরিবার এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে একটি **মর্যাদার প্রতীক**।
- **পুত্রের প্রতি অধিক আগ্রহের হ্রাস:** অনেক রাজ্যে কন্যা সন্তানরা এখন পরিবারের প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হয়ে ওঠায় পুত্র সন্তানের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে।

প্রজনন হার হ্রাসের প্রভাব

১. **অর্থনৈতিক প্রভাব**

- **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ:** শিশুর সংখ্যা কম হওয়ার অর্থ হলো "শিশু-নির্ভরশীলতার অনুপাত" কমে যাওয়া। এটি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের পেছনে মাথাপিছু বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ করে দেয় (**সংখ্যার চেয়ে গুণের ওপর গুরুত্ব**)।
- **শ্রমবাজারের পরিবর্তন:** দীর্ঘমেয়াদে যুবশক্তির অভাব শ্রমসংকট তৈরি করে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো ইতিমধ্যেই এর সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে সেখানে অটোমেশন বা যন্ত্রনির্ভরতা বাড়ছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।
- **ভোগের ধরণ:** বাজার এখন **"সিলভার ইকোনমি"** (বয়স্কদের কেন্দ্র করে অর্থনীতি)-র দিকে ঝুঁকছে। চাহিদা এখন শিশুদের পণ্য ও স্কুলের বদলে স্বাস্থ্যসেবা, বিমা এবং বয়স্কদের বিনোদনের দিকে সরে যাবে।

২. **সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব**

- **নারীর ক্ষমতায়ন:** প্রজনন হার কমে যাওয়ার সাথে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সন্তান লালন-পালনের পেছনে কম সময় ব্যয় হওয়ায় নারীরা দীর্ঘসময় কর্মজীবনে টিকে থাকতে পারছেন।
- **একাকিত্বের সংকট:** প্রথাগত "বার্ধক্যের নিরাপত্তা" দেওয়ার জন্য সন্তানের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বয়স্কদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, বিশেষ করে শহরের একক পরিবারগুলোতে।

৩. **রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব**

- **ডিলিমিটেশন বা সীমানা নির্ধারণ বিতর্ক:** যেসব রাজ্য সফলভাবে প্রজনন হার কমিয়েছে (যেমন কেরালা ও তামিলনাড়ু), তারা বিহারের মতো উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলোর তুলনায় সংসদে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।
- **আর্থিক চাপ:** বয়স্কদের হার বেড়ে যাওয়া রাজ্যগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা এবং পেনশনের খরচ বাড়ছে, অথচ করদাতা যুবশক্তির সংখ্যা কমছে। এটি রাজ্যের কোষাগারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

৪. **পরিবেশগত প্রভাব**

- **সম্পদের স্বস্তি:** জনসংখ্যার চাপ কমলে জল, জমি এবং শক্তির মাথাপিছু চাহিদা কমে, যা ভারতের **২০৭০ সালের নেট জিরো** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।
- **কার্বন ফুটপ্রিন্ট:** বিপরীতে, প্রজনন হার কমলে এবং মাথাপিছু আয় বাড়লে মানুষের ভোগের মাত্রা বেড়ে যায়, যা মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

সরকারি উদ্যোগ

১. **উচ্চ-প্রজনন হার বিশিষ্ট অঞ্চলের জন্য**

- **মিশন পরিবার বিকাশ (MPV):** বর্তমানে এর বর্ধিত পর্যায়ে (২০২৫-২৬), এটি ৭টি রাজ্যের (উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, আসাম) **১৪৬টি উচ্চ-প্রজনন হার বিশিষ্ট জেলাকে** লক্ষ্য করছে।
    - **লক্ষ্য:** সারথি (SAARTHI) নামক ভ্রাম্যমাণ প্রচার এবং আশা (ASHA) কর্মীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গর্ভনিরোধক পৌঁছে দিয়ে প্রজনন হার **২.১**-এ নামিয়ে আনা।
- **অন্তরা ও ছায়া (Antara & Chhaya):** বন্ধ্যাকরণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জন্মবিরতি বাড়ানোর জন্য নতুন প্রজন্মের ইনজেকশন এবং হরমোনবিহীন বড়ি চালু করা হয়েছে।

২. **বার্ধক্যজনিত জনসংখ্যার জন্য)**

- **আয়ুষ্মান ভারত (AB-PMJAY 70+):** ২০২৪-২৫ থেকে আয়ের সীমা নির্বিশেষে **৭০ বছরের উর্ধ্বের সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে** ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে। এটি বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।
- **অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা (AVYAY):** এটি একটি ছাতা প্রকল্প যার অধীনে রয়েছে:
  - IPSrC: দুস্থ ও প্রবীণ নারীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন।
  - **রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা:** শ্রবণযন্ত্র, হুইলচেয়ার এবং কৃত্রিম দাঁতের মতো সহায়ক সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ।
- **এল্ডারলাইন (১৪৫৬৭):** প্রবীণ নাগরিকদের তথ্য, পরামর্শ এবং মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি জাতীয় টোল-ফ্রি হেল্পলাইন।

৩. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমন্বয়**

- SAGE (Seniorcare Ageing Growth Engine): বয়স্কদের সেবার জন্য (যেমন প্রযুক্তিগত সহায়তা, রিমোট মনিটরিং) পণ্য তৈরি করা স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা করার একটি পোর্টাল।
- SACRED **পোর্টাল:** অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিকরা যাতে পুনরায় কর্মসংস্থান খুঁজে পান এবং উৎপাদনশীল থাকতে পারেন, তার জন্য এটি একটি জব-এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম।
- **প্রজেক্ট সঞ্জীবনী:** ভারতকে বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের পুনর্বাসন ও সুস্থতার একটি কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **"সিলভার সুনামি" বা বার্ধক্য মোকাবিলায় কৌশল**

- **বার্ধক্যকালীন পরিকাঠামো (Geriatric Infrastructure):** প্রতিটি জেলা হাসপাতালে একটি করে 'জেরিয়াট্রিক উইং' (বার্ধক্য বিভাগ) বাধ্যতামূলক করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (PHC) স্তরে প্রবীণদের যত্নকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- **সিলভার ইকোনমি:** গ্রামীণ এলাকায় একাকী থাকা প্রবীণদের জন্য সহায়ক প্রযুক্তি এবং 'রিমোট মনিটরিং' ব্যবস্থা তৈরি করতে SAGE উদ্যোগের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে উৎসাহিত করা।
- **নমনীয় অবসরের বয়স:** শিক্ষা ও কনসালটেন্সির মতো ক্ষেত্রগুলোতে অবসরের বয়স পুনর্বিবেচনা করা যাতে অভিজ্ঞ জনশক্তিকে বা **"সিলভার ডিভিডেন্ড"**-কে কাজে লাগানো যায়।

২. **উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন দূর করা**

- **পরিযান ব্যবস্থাপনা নীতি (Migration Management Policy):** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে কর্মরত উত্তর ভারতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সামাজিক ও ভাষাগত সমন্বয় নিশ্চিত করতে 'আন্তঃরাজ্য পরিযান'-এর জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা।
- **দক্ষতার সমন্বয় (Skill Harmonization):** উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলোর (উত্তরপ্রদেশ/বিহার) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাজ্যগুলোর (তামিলনাড়ু/কেরালা) শ্রমের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

৩. **রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফেডারেলিজম**

- **ডিলিমিটেশন সংস্কার:** নিশ্চিত করা যেন ২০২৬/২০৩১ সালের সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সফল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে "শাস্তি" না দেয়। একটি **ভারসাম্যপূর্ণ সূত্র** (জনসংখ্যা + স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সাফল্য) এক্ষেত্রে অপরিহার্য।
- **আর্থিক প্রণোদনা:** রাজকোষের ভারসাম্য বজায় রাখতে যেসব রাজ্য 'রিপ্লেসমেন্ট লেভেল' প্রজনন হার অর্জন করেছে, **অর্থ কমিশন** (Finance Commission) কর্তৃক তাদের পুরস্কৃত করা অব্যাহত রাখা উচিত।

৪. লিঙ্গ ও প্রজনন অধিকার

- **'লক্ষ্যমাত্রা' নয়, 'পছন্দ'-কে গুরুত্ব দেওয়া:** পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী-কেন্দ্রিক বন্ধ্যাকরণের পরিবর্তে **পুরুষদের অংশগ্রহণ** বৃদ্ধি এবং গর্ভনিরোধকের বহুমুখী বিকল্প নিশ্চিত করা।
- **শহুরে অভিভাবকত্বের প্রতি সমর্থন:** মেট্রো শহরগুলোতে অতি-নিম্ন প্রজনন হার মোকাবিলায় শিশু যত্ন (Childcare) সহায়তা এবং কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, যাতে যেসব দম্পতি সন্তান নিতে চান তারা আর্থিক চাপের ভয় ছাড়াই তা করতে পারেন।

উপসংহার

ভারতের জনতাত্ত্বিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি **"খণ্ডিত উত্তরণ"** (Fragmented Transition) সঠিকভাবে পরিচালনার ওপর। উত্তর ভারতের যুবশক্তির শ্রমের সাথে দক্ষিণ ভারতের বার্ধক্যজনিত মূলধনের সমন্বয় ঘটিয়ে ভারত এই জনতাত্ত্বিক ভিন্নতাকে একটি টেকসই **'বিকশিত ভারত'**-এ রূপান্তরিত করতে পারে।

Q. ভারতের জনতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ এখন 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' থেকে 'জনসংখ্যার বার্ধক্যের' দিকে মোড় নিচ্ছে। প্রজনন হারের হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এটি আলোচনা করুন।

1.1.2. রক্ত, আচার এবং পুনর্জন্ম: লালের অদৃশ্য ভাষা

ভূমিকা: সমাজের অদৃশ্য ভিত্তি হিসেবে প্রতীক

মানব সভ্যতাকে সাধারণত রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং আইনের মতো দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বোঝা হয়। কিন্তু এই কাঠামোগুলোর নিচে রয়েছে এক গভীর ও **অদৃশ্য ভিত্তি** (Invisible foundation): প্রতীক। রং, আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী এবং রূপকগুলো নীরবে মানুষের **চেতনা** (Consciousness) এবং **যৌথ আচরণকে** (Collective behavior) রূপ দেয়। দার্শনিক আর্নস্ট ক্যাসিরারের মতে, 'মানুষ কেবল এক যুক্তিবাদী প্রাণী নয়, বরং সে একটি **প্রতীকী প্রাণী** (Symbolic animal)।'

সমস্ত প্রতীকের মধ্যে, 'লাল' বর্ণটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতীক হিসেবে স্বতন্ত্র। এটি জীবন ও মৃত্যু, ত্যাগ ও নবায়নের মধ্যবর্তী সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে—যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একটি **প্রান্তিক প্রতীক** (Liminal symbol) বলা হয়। লালের এই প্রেক্ষাপট দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কীভাবে প্রতীকগুলো সভ্যতার **নীরব স্থপতি** (Silent architects) হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের মূল্যবোধ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক কাঠামো গঠন করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে লাল: অর্থের প্রথম ভাষা (Red in Prehistory: The First Language of Meaning)

সৃজনশীল বা অর্থপূর্ণ প্রতীক হিসেবে লালের গুরুত্ব প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিদ্যমান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাচীন মানুষেরা ওয়েলস (প্যাভিল্যান্ড), ইসরায়েল (কাফজেহ) এবং অস্ট্রেলিয়ার (লেক মুঙ্গো) মতো অঞ্চলে **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সমাধি** (Burial practices) দেওয়ার সময় লাল গেরুয়া মাটি (Red ochre) ব্যবহার করত। মৃতদেহগুলোকে প্রায়শই লাল রঞ্জক দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হতো, যা একটি সুনির্দিষ্ট **আচারগত উদ্দেশ্য** (Ritual intent) নির্দেশ করে।

এই ব্যাপক অনুশীলনটি ইঙ্গিত দেয় যে, লাল রং রক্ত, **জীবন-শক্তি** (Life-force) এবং **পুনর্জন্মের** (Regeneration) প্রতীক ছিল। মৃত্যু তখন কেবল শেষ হিসেবে গণ্য হতো না, বরং একে একটি রূপান্তর বা সম্ভাব্য পুনর্জন্ম হিসেবে দেখা হতো। সুতরাং, আদিম সমাজেও লালের মতো প্রতীকগুলো মানুষকে তাদের **অস্তিত্ববাদী প্রশ্নগুলোর** (Existential questions) উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, সংস্কৃতি হলো "প্রতীকী আকারে প্রকাশ করা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধারণার একটি পদ্ধতি।" তাই লাল ছিল সেই আদিমতম হাতিয়ারগুলোর মধ্যে একটি, যার মাধ্যমে মানুষ প্রথম তাদের **বাস্তবতা** (Reality) এবং জীবনের অর্থ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল।

প্রান্তিকতা: রূপান্তরের চিহ্ন হিসেবে লাল

ভিক্টর টার্নার প্রবর্তিত **'প্রান্তিকতা'** (Liminality) ধারণাটি লালের প্রতীকী ভূমিকা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রান্তিকতা' বলতে বোঝায় সেই সন্ধিক্ষণ বা **উত্তরণকালীন পর্যায়কে** (Threshold phases), যখন কোনো ব্যক্তি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পদার্পণ করে—যেমন জন্ম, বয়ঃসন্ধি, বিবাহ বা মৃত্যু।

লাল বর্ণটি প্রায়ই এই ধরনের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত থাকে:

- জন্ম এবং **প্রজনন ক্ষমতা** (Fertility) সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানে।
- দীক্ষা বা **অভিষেক অনুষ্ঠানে** (Initiation ceremonies)।
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা **শবাধার রীতিতে** (Funeral rites)।

এটি বিপদ এবং সম্ভাবনা—উভয়েরই প্রতীক, যা মূলত **রূপান্তরকে** (Transformation) মূর্ত করে তোলে। ভারতীয় সমাজে বিবাহে লালের ব্যবহার (যেমন- সিঁদুর, বিয়ের বেনারসি) একটি নতুন সামাজিক ভূমিকায় প্রবেশের রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। একইভাবে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় লালের ব্যবহার জীবন থেকে **পরলোক বা পরজন্মের** (Afterlife) পথে যাত্রার প্রতিফলন ঘটায়।

সুতরাং, লাল হয়ে ওঠে রূপান্তরের এক দৃশ্যমান ভাষা, যা মানুষের জীবনের অনিশ্চিত অথচ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করে।

দেহ, রক্ত এবং আচার: নৈতিক ও সামাজিক মাত্রা

- রক্তের সাথে লালের গভীর সম্পর্ক একে মানবদেহ এবং জৈবিক প্রক্রিয়ার (যেমন- ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসব এবং আঘাত) সাথে যুক্ত করে। ঐতিহাসিকভাবে এই প্রক্রিয়াগুলোকে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি **প্রতীকী অর্থ** (Symbolic meaning) প্রদান করা হয়েছে।
- নৃতাত্ত্বিক ক্যামিলা পাওয়ার একে **'যৌথ আচারের প্রযুক্তি'** (Technology of collective ritual) হিসেবে বর্ণনা করেছেন—এটি এমন এক ব্যবস্থা যা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান বা আইন গড়ে ওঠার অনেক আগেই মানুষের আচরণকে রূপ দিয়েছিল। আচার বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই **পবিত্র** (Sacred) এবং **অপবিত্রের** (Profane) সীমানায় থেকে এই অনুশীলনগুলো পরিচালনা করতেন।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

- এই ধরনের আচারগুলো একটি **অংশীদারিত্বমূলক নৈতিক কাঠামো** (Shared moral frameworks) তৈরি করেছিল।
- এগুলো কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়াই **সামাজিক শৃঙ্খলা** (Social discipline) নিশ্চিত করেছিল।
- এগুলো পবিত্রতা, ত্যাগ এবং **কর্তব্যবোধের** (Duty) ধারণাকে সুসংহত করেছিল।

ভারতে **'ধর্ম'** (Dharma) এবং **'কর্ম'** (Karma)-র মতো ধারণাগুলো একইভাবে প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে যা মানুষের নৈতিক আচরণকে পরিচালিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, প্রতীকবাদ আনুষ্ঠানিক আইনের অনেক আগেই বিদ্যমান ছিল।

লিঙ্গ, ক্ষমতা এবং প্রতীকবাদ

লালের প্রতীকী তাৎপর্য লিঙ্গীয় ভূমিকা এবং **সামাজিক স্তরবিন্যাসের** (Social hierarchies) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যদিও লাল বর্ণটি প্রায়ই নারীদেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার (প্রজনন, ঋতুস্রাব) প্রতিনিধিত্ব করে, তবে এর আচারিক নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই বিশেষজ্ঞ বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে থেকেছে।

অনেক সংস্কৃতিতে:

- নারীরা প্রজনন এবং বিবাহের আচারে লাল ব্যবহার করেন।
- আচারিক কর্তৃত্ব সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এটি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে প্রতীকগুলো **ক্ষমতার সম্পর্কের** (Power relations) মধ্যে নিহিত থাকে। ভারতীয় সমাজে, লাল একদিকে যেমন **মাঙ্গলিক বা শুভত্বের** (Auspiciousness) প্রতীক (বিবাহ), অন্যদিকে এটি ত্যাগেরও প্রতীক (দেবী সাধনা ও বলিদান)। এটি লালের দ্বৈত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাকেই ফুটিয়ে তোলে।

প্রতীক এবং সামাজিক সংহতি: ডারখাইমীয় দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতীকগুলো কেবল ব্যক্তিগত নির্মাণ নয়; এগুলো **যৌথ শক্তি** (Collective forces)। এমিল ডারখাইম জোর দিয়েছিলেন যে, আচার-অনুষ্ঠানগুলো সমাজের **যৌথ চেতনাকে** (Collective conscience)—অর্থাৎ সমাজের সাধারণ বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে।

ভারতে এর প্রতিফলন:

- দীপাবলির মতো উৎসব (অন্ধকারের ওপর আলোর জয়)।
- হোলি বা দোল উৎসব (লাল আবির, নবায়ন এবং **সামাজিক সমতা** (Equality))।
- জাতীয় প্রতীক যেমন—জাতীয় পতাকা (তিলক বা গেরুয়া সদৃশ রং) এবং **অশোক চক্র**।

এই প্রতীকগুলো ঐক্য, একাত্মতা এবং **আবেগীয় সংহতি** (Emotional integration) বৃদ্ধি করে। সুতরাং, লালের মতো প্রতীকগুলো কেবল নিষ্ক্রিয় বস্তু নয়—এগুলো সক্রিয়ভাবে সম্প্রদায়কে একত্রিত করে, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং **সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা** (Cultural continuity) বজায় রাখে।

অর্থনৈতিক মাত্রা: বাজারের আগের প্রতীক

- প্রতীকগুলো আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও রূপ দিয়েছিল। গেরুয়া মাটির (Ochre) দূরপাল্লার বাণিজ্য নির্দেশ করে যে, এর মূল্য কেবল বস্তুগত ছিল না, বরং ছিল **প্রতীকী মূল্য** (Symbolic value)।
- মার্সেল মাউস তাঁর 'উপহার বিনিময়' তত্ত্বে যুক্তি দিয়েছেন যে, বস্তু সামাজিক মূল্য বহন করে এবং **পারস্পরিক বিনিময়ের নেটওয়ার্ক** (Networks of reciprocity) তৈরি করে। একইভাবে ডেভিড গ্রেবার উল্লেখ করেছেন যে, আনুষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থার অনেক আগেই মূল্যের প্রতীকী ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন ভারতে:

- আচারগত উৎসর্গ এবং বলিদান ছিল বিনিময় প্রথার আদি রূপ।
- লাল বস্তুগুলো জীবন এবং **পবিত্র মূল্যের** (Sacred value) প্রতীক ছিল।

আজও অর্থনৈতিক আচরণ প্রতীকের দ্বারা প্রভাবিত:

- **ব্র্যান্ডিং** (Branding) এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ভোগ।
- উৎসব ও বিয়েতে উপহার আদান-প্রদান।

এইভাবে, প্রতীক অর্থনীতি এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সেতু বন্ধন করে, যা নির্ধারণ করে কীভাবে আমরা কোনো বস্তুর মূল্য অনুভব করি।

লালের বিশ্বজনীনতা

লালের প্রতীকী তাৎপর্য ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত:

- **চীন:** সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক।
- **মিশর:** জীবন এবং বিশৃঙ্খলার (Chaos) প্রতীক।
- **গ্রীক সাহিত্য:** আবেগীয় গভীরতা (যেমন হোমারের 'wine-dark sea')।
- **হিব্রু ঐতিহ্য:** মাটি (আদামা) এবং মানুষের (আদম) মধ্যে যোগসূত্র।

ভারতে লালের রূপ:

- **সিঁদুর ও কুমকুম:** বিবাহ এবং প্রজনন ক্ষমতার চিহ্ন।
- **উৎসবে লাল:** শক্তি এবং **নবায়নের** (Renewal) প্রতীক।
- **দেবী পূজায় লাল:** ক্ষমতা, তেজ এবং ত্যাগের প্রতিফলন।

এই বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করে যে, লাল বর্ণটি ধারাবাহিকভাবে মানুষের জীবনের রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।

দার্শনিক মাত্রা: লাল এবং মানবিক অভিজ্ঞতা

জোহান উলফগ্যাং ফন গ্যাটে লালের দার্শনিক গুরুত্ব অন্বেষণ করেছেন। তিনি লালকে আলো ও অন্ধকারের মাঝে অবস্থিত সবচেয়ে **তীব্র এবং তাৎক্ষণিক রং** (Intense and immediate colour) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

লাল হলো:

- বিমূর্ত ধারণার চেয়ে অনেক বেশি **আবেগপ্রবণ** (Emotional)।
- শারীরিক হওয়া সত্ত্বেও গভীর **প্রতীকী** (Symbolic)।

এটি ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপ, যা বস্তুগত জগতের সাথে **অধিবিদ্যক** (Metaphysical) জগতের সংযোগ ঘটায়।

আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা: পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতীক

সমসাময়িক যুগে প্রতীকের বিবর্তন ঘটছে:

- ডিজিটাল প্রতীক (মিম, হ্যাশট্যাগ) সামাজিক আলোচনাকে রূপ দিচ্ছে।
- প্রচলিত অর্থগুলোর নতুন ব্যাখ্যা তৈরি হচ্ছে।
- **পরিচয় রাজনীতি** (Identity politics) প্রায়শই প্রতীকী চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়।

ইউভাল নোয়াহ হারারি যুক্তি দেন যে, ধর্ম, জাতি বা অর্থের মতো **অংশীদারিত্বমূলক প্রতীকী ব্যবস্থার** (Shared symbolic systems) কারণেই বড় মাপের মানবিক সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রতীক বিভাজনও তৈরি করতে পারে, তাই নৈতিকভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে প্রতীক যেন বর্জনের বদলে **অন্তর্ভুক্তিকে** (Inclusion) উৎসাহিত করে।

উপসংহার

লালের গল্পটি আসলে মানুষের **চেতনারই** (Human consciousness) গল্প। প্রাগৈতিহাসিক সমাধি থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজের প্রাণবন্ত আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত—লাল কেবল মানুষের জীবনকে সঙ্গ দেয়নি, বরং তাকে ব্যাখ্যা করেছে। এটি জন্মকে আশায়, মৃত্যুকে ধারাবাহিকতায় এবং ত্যাগকে নবায়নে রূপান্তরিত করে।

প্রতীকগুলো সংস্কৃতির নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন নয়; তারা **বাস্তবতার সক্রিয় স্রষ্টা** (Active creators of reality)। এগুলো আমাদের বিশ্ব দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে এবং আমাদের নৈতিক পছন্দগুলোকে পরিচালিত করে। এদের অনুপস্থিতিতে সভ্যতা কেবল তার সংহতিই নয়, বরং তার **আত্মা** (Soul) হারাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, *'একটি দেশ কেবল একখণ্ড মাটি নয়; এটি মানুষের মনের প্রকাশ।'* আচার, আখ্যান এবং **যৌথ স্মৃতির** (Collective memory) মধ্যে নিহিত প্রতীকের মাধ্যমেই এই 'মন' প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাই লাল কেবল একটি রং নয়; এটি বস্তুগত ও অধিবিদ্যক, ব্যক্তিগত ও যৌথ এবং সসীম ও অসীমের মধ্যে এক **দার্শনিক সেতু** (Philosophical bridge)। যতদিন মানুষ তার অস্তিত্বের অর্থ খুঁজবে, ততদিন প্রতীকগুলো সভ্যতার **নীরব স্থপতি** (Silent architects) হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে গভীরতা ও মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকবে।

Q. "Symbols are the silent architects of civilization; they build what laws can only regulate."

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের সম্পর্কে

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের একটি আকস্মিক কম্পন, যা ভূ-ত্বকের ভেতরে **শক্তির মুক্তির** কারণে ঘটে এবং এর ফলে **সিসমিক তরঙ্গ** (seismic waves) সৃষ্টি হয়। এটি সাধারণত **ফল্ট লাইন** (fault lines) বা টেকটোনিক প্লেটের সীমানা বরাবর ঘটে থাকে।

- এটি **রিখটার স্কেল** (Richter Scale) (মাত্রা বা ম্যাগনিটিউড) এবং **মডিফাইড মারকালি ইনটেনসিটি** (MMI) স্কেল (তীব্রতা) দিয়ে পরিমাপ করা হয়।
- বেশিরভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগরীয় **রিম অফ ফায়ার** (Ring of Fire)-এর মতো প্লেট সীমানা বরাবর ঘটে।
- **ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চলের** কাছাকাছি অবস্থানের কারণে ভারত ভূমিকম্পের প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

ভূমিকম্পের কারণ

১. **প্রাকৃতিক কারণ**

পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার বা শিলামণ্ডল কয়েকটি **টেকটোনিক প্লেটে** বিভক্ত, যা ম্যান্টলের পরিচলন স্রোতের কারণে অনবরত নড়াচড়া করছে।

- **টেকটোনিক চলন**
  - **অভিসারী সীমানা** (Convergent Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় (যেমন: ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে), যা **হিমালয়** পর্বত তৈরি করেছে এবং উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে।
  - **প্রতিসারী সীমানা** (Divergent Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় (যেমন: মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা), যা ম্যাগমাকে উপরে উঠতে দেয় এবং কম্পন সৃষ্টি করে।
  - **রূপান্তর সীমানা** (Transform Boundaries): যখন প্লেটগুলো একে অপরের পাশ দিয়ে অনুভূমিকভাবে সরে যায় (যেমন: সান আন্দ্রেয়াস ফল্ট), ফলে ঘর্ষণ তৈরি হয় এবং হঠাৎ শক্তি মুক্তির মাধ্যমে ভূমিকম্প ঘটে।
- **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত:** ম্যাগমার প্রচণ্ড নড়াচড়া বা গ্যাসের বিস্ফোরণ স্থানীয় কিন্তু তীব্র সিসমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারে।
- **ফল্টিং এবং ফোল্ডিং (চ্যুতি ও ভাঁজ):** প্রচণ্ড চাপের মুখে শিলা একসময় ফেটে যায় (**চ্যুতি**) বা বেঁকে যায় (**ভাঁজ**)। যখন এটি সহ্যক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন **'ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিওরি'** অনুযায়ী হঠাৎ ফেটে গিয়ে সিসমিক শক্তি মুক্ত হয়।

২. **মনুষ্যসৃষ্ট কারণ**

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ ভূ-ত্বকের চাপের ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে:

- **জলাধার-প্ররোচিত ভূমিকম্প** (Reservoir-Induced Seismicity - RIS): বিশাল জলাধারের পানির ওজন (যেমন: মহারাষ্ট্রের **কয়না বাঁধ**) নিচের শিলাস্তরে চাপ সৃষ্টি করে এবং বিদ্যমান ফাটলগুলোকে পিচ্ছিল করে দেয়।
- **খনি খনন এবং পাথর উত্তোলন:** মাটির গভীরে খনি খননের ফলে 'রক বার্স্ট' বা খনির ছাদ ধসে পড়ে কম্পন সৃষ্টি হতে পারে।
- **পারমাণবিক বিস্ফোরণ:** ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, যা প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে।

ভূমিকম্পের প্রকারভেদ

(১) উৎপত্তির ভিত্তিতে

- **টেকটোনিক ভূমিকম্প:** প্লেট চলাচলের কারণে ঘটে (সবচেয়ে সাধারণ)।
- **আগ্নেয়গিরিজনিত ভূমিকম্প:** অগ্ন্যুৎপাতের সাথে সম্পর্কিত।
- **ধসজনিত (Collapse) ভূমিকম্প:** ভূগর্ভস্থ খনি ধসে পড়ার কারণে হয়।
- **বিস্ফোরণজনিত ভূমিকম্প:** পারমাণবিক বা রাসায়নিক বিস্ফোরণের কারণে ঘটে।

(২) গভীরতার ভিত্তিতে

প্রকার	গভীরতা	বৈশিষ্ট্য
অগভীর উৎস (Shallow Focus)	০ – ৭০ কিমি	**সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক।** শক্তিকে খুব কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, তাই তীব্রতা অনেক বেশি থাকে।
মধ্যবর্তী উৎস (Intermediate Focus)	৭০ – ৩০০ কিমি	মাঝারি প্রভাব; সাধারণত সাবডাকশন জোনে ঘটে।
গভীর উৎস (Deep Focus)	৩০০ – ৭০০ কিমি	একে **প্লুটোনিক** ভূমিকম্পও বলা হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে অনুভূত হলেও ভূপৃষ্ঠে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাব

১. ভৌত ও কাঠামোগত প্রভাব

- **ভবন ধসে পড়া:** এটি মৃত্যুর প্রধান কারণ।
  - *উদাহরণ:* **২০২৩ সালের তুরস্ক-সিরিয়া ভূমিকম্প**, যেখানে হাজার হাজার ভবন তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে ৫০,০০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।
- **অবকাঠামো ধ্বংস:** সেতু, বাঁধ এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি।
  - *উদাহরণ:* **১৯৯৩ সালের লাতুর ভূমিকম্প**, যা গ্রামীণ মহারাষ্ট্রের পাথুরে বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছিল।

২. ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত প্রভাব

- **ভূপৃষ্ঠে চ্যুতি:** পৃথিবীর উপরিভাগে দৃশ্যমান ফাটল বা স্থানচ্যুতি।
- **মাটির তরলীকরণ (Liquefaction):** নরম মাটি তরলের মতো আচরণ করে, যার ফলে বড় ভবনগুলো হেলে পড়ে।
  - *উদাহরণ:* **২০১১ সালের নিগাতা (জাপান) ভূমিকম্প**, যেখানে আস্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং অক্ষত অবস্থায় মাটিতে হেলে পড়েছিল।
- **ভূমিধস/তুষারধস:**
  - *উদাহরণ:* **২০১৫ সালের নেপাল ভূমিকম্প**, যা এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে বিশাল তুষারধস সৃষ্টি করেছিল এবং ল্যাংটাং গ্রামকে সমাহিত করেছিল।

৩. গৌণ বিপদ

- **সুনামি:** সমুদ্রের তলদেশের স্থানচ্যুতির কারণে সৃষ্ট বিশাল ঢেউ।
  - *উদাহরণ:* **২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় সুনামি**, যা ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জসহ ১৪টি দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।
- **আকস্মিক বন্যা:** ভূমিধসের ফলে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়, যা পরে ফেটে গিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে।
  - *উদাহরণ:* ভূমিকম্পের পর **সিকিম-হিমালয় অঞ্চলে** প্রায়ই এমন ঝুঁকি দেখা যায়।

- **শহুরে অগ্নিকাণ্ড:** গ্যাস লাইন ফেটে যাওয়া বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগা।
    - *উদাহরণ:* **১৯২৩ সালের গ্রেট কান্টো ভূমিকম্প (জাপান)**, যেখানে কম্পনের চেয়ে আগুনেই বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

৪. **আর্থ-সামাজিক প্রভাব**

- **অর্থনৈতিক ক্ষতি:** পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় কোষাগারের ওপর বিশাল চাপ।
    - *উদাহরণ:* **২০০১ সালের ভুজ ভূমিকম্পে** আনুমানিক **৫ বিলিয়ন ডলার** ক্ষতি হয়েছিল এবং স্থানীয় শিল্পখাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।
- **জনস্বাস্থ্য সংকট:** ত্রাণ শিবিরে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক আঘাত (PTSD)।
- **যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা:** সমুদ্রতলের ক্যাবল এবং স্যাটেলাইটের ওপর আধুনিক নির্ভরশীলতা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে তোলে।

ভারতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি

ভারত **ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংযোগস্থলে** (convergent boundary) অবস্থিত, যার ফলে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্পের দিক থেকে অত্যন্ত সক্রিয়।

- ভারতের মোট ভূখণ্ডের প্রায় **৫৯% এলাকা** বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।
- **বিপজ্জনক জনসংখ্যা:** ভারতের প্রায় **৭৫% মানুষ** ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসবাস করেন।
- **"সিসমিক গ্যাপ" (Seismic Gap):** বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে **'মধ্য হিমালয় গ্যাপ'** নিয়ে চিন্তিত। হিমালয়ের এই অংশে গত ২০০ বছরে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি, তাই এখানে একটি **'মহা-ভূমিকম্প' (M > ৮.০)** হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিউরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) ঝুঁকির ভিত্তিতে ভারতকে **চারটি সিসমিক জোনে** (II–V) ভাগ করেছে:

- **জোন V (অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি):** হিমালয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ভারত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
- **জোন IV (উচ্চ ঝুঁকি):** দিল্লি, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড।
- **জোন III (মাঝারি ঝুঁকি):** মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশ।
- **জোন II (কম ঝুঁকি):** অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল উপদ্বীপীয় অঞ্চল।

ক্ষতি হ্রাসের কৌশল

১. **কাঠামোগত প্রশমন (ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান)**

- **সিসমিক রেট্রোফিটিং:** স্টিল ব্রেসিং, বেস আইসোলেশন বা জ্যাকেটেড কলাম ব্যবহারের মাধ্যমে পুরনো ও দুর্বল ভবনগুলোকে (বিশেষ করে হাসপাতাল ও স্কুল) শক্তিশালী করা।
- **বেস আইসোলেশন এবং ড্যাম্পার:** ভবনের ভিত্তিতে নমনীয় বিয়ারিং বা **"শক অ্যাবজর্বার"** ব্যবহার করা যাতে মাটির কম্পন ভবন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।
    - **উদাহরণ:** ২০০১ সালের ভূমিকম্পের পর **ভুজ জেলা হাসপাতাল** বেস আইসোলেশন প্রযুক্তি দিয়ে পুনর্নির্মিত হয়েছে।
- **বিল্ডিং কোডের কঠোর প্রয়োগ:** নতুন সমস্ত নির্মাণ যাতে **IS 1893: 2016** (সিসমিক ডিজাইন) এবং **IS 13920** (ডাক্টাইল ডিটেইলিং) মেনে চলে তা নিশ্চিত করা।
- **হালকা ওজনের উপকরণের ব্যবহার:** উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় (জোন V) ফাঁপা ইট বা বাঁশ-ভিত্তিক শক্তিশালী কাঠামো ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

২. অ-কাঠামোগত প্রশমন (নীতিগত সমাধান)

- **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন (Seismic Microzonation):** মাটির ধরন অনুযায়ী একটি শহরকে ছোট ছোট 'মাইক্রো-জোনে' ভাগ করা যাতে বোঝা যায় কোন এলাকায় কম্পন বেশি হবে (যেমন: দিল্লি ও বেঙ্গালুরু এটি সম্পন্ন করেছে)।
- **ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা:** কঠোর জোনিং আইনের মাধ্যমে 'ফল্ট লাইন' বা মাটির তরলীকরণ প্রবণ (liquefaction-prone) নদীর তীরে বহুতল ভবন নির্মাণ নিষিদ্ধ করা।
- **আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা (EWS):** এমন সেন্সর বসানো যা **P-তরঙ্গ** (দ্রুত কিন্তু কম ক্ষতিকর) শনাক্ত করে **S-তরঙ্গ** (ধ্বংসাত্মক) আসার ১০-৬০ সেকেন্ড আগে সতর্কতা দিতে পারে।
  - **উদাহরণ:** উত্তরাখণ্ডের Earthquake Early Warning (EEW) অ্যাপ।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি: "আপদা মিত্র"** (স্বেচ্ছাসেবক) প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নিয়মিত **মেগা মক ড্রিল** (যেমন: বার্ষিক 'অনুশীলন সহায়তা') আয়োজন করা।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈশ্বিক কাঠামো

- **NDMA নির্দেশিকা:** বহুতল ভবনের জন্য "নিরাপদ নির্মাণ পদ্ধতি" এবং "বাধ্যতামূলক প্রযুক্তিগত অডিট"-এর ওপর জোর দেওয়া।
- **CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure):** ভারতের নেতৃত্বে একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, যা বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মতো অবকাঠামোকে ভূমিকম্প সহনীয় করতে কাজ করে।
- **বিমা সুবিধা:** দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি আর্থিক চাপ কমাতে **"ক্যাটাস্ট্রফি ইন্স্যুরেন্স"** বা দুর্যোগ বিমাকে উৎসাহিত করা।

ভূমিকম্প মোকাবিলায় ভারতের প্রস্তুতি

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫:** ভারতের প্রস্তুতির মূল ভিত্তি, যা তিন স্তরের কাঠামো তৈরি করেছে: NDMA (জাতীয়), SDMA (রাজ্য) এবং DDMA (জেলা)।
- **NDMA নির্দেশিকা (২০২৬ আপডেট):** সর্বশেষ নির্দেশিকায় **"বিল্ড ব্যাক বেটার"** (আরও ভালো করে গড়ে তোলা) এবং সাধারণ ঝুঁকি মূল্যায়নের পরিবর্তে **প্রবাবিলিস্টিক সিসমিক হ্যাজার্ড অ্যাসেসমেন্ট (PSHA)** পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- **NDRF (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদানকারী বাহিনী):** ১৬টি ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ বাহিনী যারা ধসে পড়া কাঠামোয় অনুসন্ধান ও উদ্ধারে (CSSR) প্রশিক্ষিত।

২. প্রযুক্তিগত ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

- **জাতীয় সিসমোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক (NSN):** ২০২৬ সালের শুরুর দিকে এই নেটওয়ার্ক **১৬৯টি স্টেশনে** উন্নীত করা হয়েছে (যা ২০১৪ সালে ছিল ৮০টি)।
- **আগাম সতর্কতা (EEW) ব্যবস্থা:** উত্তরাখণ্ডে এটি বর্তমানে কার্যকর (ভারতে প্রথম)। হিমালয় অঞ্চল জুড়ে এটি সম্প্রসারণের কাজ চলছে।
- **সচেত (Sachet) পোর্টাল (NDMA):** একটি সর্বভারতীয় সমন্বিত সতর্কতা ব্যবস্থা যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় রিয়েল-টাইম সতর্কবার্তা পাঠায়।

৩. কাঠামোগত প্রস্তুতি

- **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন:** দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং গুয়াহাটির মতো শহরগুলোতে এটি সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে মাটির গঠন অনুযায়ী ঝুঁকির এলাকা (যেমন: দিল্লির যমুনা প্লাবনভূমি) চিহ্নিত করা সম্ভব।
- **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) ২০১৬:** ভূমিকম্প-সহনশীল নকশার জন্য বাধ্যতামূলক মানদণ্ড।

- **রেট্রোফিটিং:** জোন IV এবং V-এ হাসপাতাল, স্কুল এবং সেতুর মতো **"লাইফলাইন স্ট্রাকচার"** শক্তিশালী করার সরকারি উদ্যোগ।

৪. **জনসমষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি**

- **আপদা মিত্র প্রকল্প:** ১ লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবকদের **"ফার্স্ট রেসপন্ডার"** হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- **স্কুল সুরক্ষা কর্মসূচি:** স্কুলগুলোতে দুর্যোগকালীন জরুরি পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে NIDM দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি।
- **ঐতিহ্যগত জ্ঞান:** হিমাচলের **'কাঠ-কুনি'** এবং কাশ্মীরের **'ধাজ্জি-দেওয়ারি'**-র মতো ভূমিকম্প-সহনশীল ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকলাকে আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতিতে যুক্ত করা।

ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত ও ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ**

- **আইন প্রয়োগে ঘাটতি:** দিল্লি বা গুয়াহাটির মতো শহরে প্রায় ৮০% ভবন IS 1893 নিয়ম লঙ্ঘন করে তৈরি; বিশেষজ্ঞের তদারকি ছাড়াই প্রচুর "নন-ইঞ্জিনিয়ারড" ভবন নির্মিত হচ্ছে।
- **রেট্রোফিটিং সমস্যা:** ভারতের প্রায় ১২ কোটি ভবন শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চ খরচ, কারিগরি জটিলতা এবং ভবন খালি করার সমস্যার কারণে এটি থমকে আছে।
- **দক্ষতার অভাব:** ভূমিকম্প-সহনশীল নির্মাণে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজমিস্ত্রির তীব্র অভাব।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত চ্যালেঞ্জ**

- **২০২৬-এর "সিসমিক রোলব্যাক":** শিল্প খাতের চাপে IS 1893: 2025 কোডটি (যা 'জোন VI' চালুর প্রস্তাব করেছিল) সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
  - **কারণ:** নির্মাণ খরচ ২০-৫০% বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলো লোকসানের মুখে পড়ার ভয়।
- **কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আজও অনেক বেশি কেন্দ্র-নির্ভর; জেলা পর্যায়ের সংস্থাগুলোর (DDMAs) নিজস্ব বাজেট বা বিশেষজ্ঞ কর্মীর অভাব রয়েছে।
- **যোগাযোগের ঘাটতি:** পর্যবেক্ষণ স্টেশন বাড়লেও সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে রিয়েল-টাইম সতর্কবার্তার জন্য **"লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি"** নেই।

৩. **ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ**

- **হিমালয়ের ভঙ্গুরতা: 'সেন্ট্রাল হিমালয়ান গ্যাপ'**-এ টেকটোনিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে একটি বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকলেও অপরিকল্পিত নগরায়ন থেমে নেই।
- **মাটির বিস্তৃতি ও তরলীকরণ:** উত্তর ভারতের নরম পলিমাটি কম্পনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরেও মাটির ধস (liquefaction) ঘটাতে পারে।
- **গ্রামীণ-শহুরে ব্যবধান:** গ্রামীণ এলাকায় কাঁচা বাড়িগুলো দ্রুত ধসে পড়ে, অন্যদিকে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে অগ্নিকাণ্ডের মতো গৌণ বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **ঝুঁকি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা:** ২০২৬ সালের 'সিসমিক রোলব্যাক' পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য IS 1893:2025 মানদণ্ডগুলো ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে। প্রথমেই মেট্রো, পারমাণবিক কেন্দ্র এবং হাসপাতালের মতো **"লাইফলাইন অবকাঠামো"**-র জন্য 'ভূমিকম্প সহনশীলতা শংসাপত্র' বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

- **জাতীয় রেট্রোফিটিং মিশন:** দেশের ১২ কোটি বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে শক্তিশালী করতে একটি নিবেদিত মিশন চালু করা। এর আওতায় বাড়িওয়ালাদের **"রেজিলিয়েন্স লোন"** (সহনশীলতা ঋণ), কর ছাড় এবং **প্যারামেট্রিক ইন্স্যুরেন্স** প্রদান করতে হবে যাতে দুর্যোগের পরপরই দ্রুত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়।
- **প্রযুক্তিগত সংযোগ:** হিমালয় অঞ্চলের **আগাম সতর্কতা ব্যবস্থাকে (EEW)** আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে ভূমিকম্পের সময় গ্যাস গ্রিড এবং রেল নেটওয়ার্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে স্মার্ট সিটি মাস্টার প্ল্যানে **সিসমিক মাইক্রোজোনেশন**-কে যুক্ত করা।
- **বিকেন্দ্রীভূত দক্ষতা বৃদ্ধি: 'আপদা মিত্র'** কর্মসূচিকে প্রতিটি জেলায় সম্প্রসারিত করা। স্থানীয় রাজমিস্ত্রিদের **'ডাক্টাইল ডিটেইলিং'** এবং হিমাচলের **'কাঠ-কুনি'**-র মতো ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ শৈলীতে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যয়িত (Certify) করে কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করা।
- **DRI-কে মূলধারায় আনা: কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI)**-কে কাজে লাগিয়ে **ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন (NIP)**-কে দুর্যোগ-সহনীয় করে তোলা। "দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ" দেওয়ার মানসিকতা বদলে **"পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ঝুঁকি-ভিত্তিক উন্নয়ন"**-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

উপসংহার

"দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ" দেওয়ার প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে **"ঝুঁকি-ভিত্তিক উন্নয়ন"**-এর পথে চলা এখন সময়ের দাবি। **সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক**-এর সাথে অত্যাধুনিক **আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা** এবং CDRI-এর নেতৃত্বকে যুক্ত করতে পারলে ভারতের **৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক স্বপ্ন** ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার মুখেও সুরক্ষিত থাকবে।

Q. The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. Discuss various aspects.

1.3. ইতিহাস ও সংস্কৃতি

1.3.1. ভারতীয় জাতীয় পতাকা ও প্রতীক

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার অভিযোগ ওঠায় **ভারতের পতাকা বিধি (Flag Code of India), ২০০২** এবং **জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১**-এর দিকে নতুন করে নজর দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় প্রতীক সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

১. **জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১**

- **পরিধি:** জাতীয় পতাকা, সংবিধান এবং জাতীয় সঙ্গীতসহ দেশের জাতীয় প্রতীকগুলোর অবমাননা বা অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে।
- **প্রধান অপরাধ:** জনসমক্ষে বা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে পতাকা পোড়ানো, বিকৃত করা, মাড়ানো বা অন্য কোনোভাবে অসম্মান প্রদর্শন করা।
- **শাস্তি:** ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা, অথবা উভয়ই।

২. **ভারতের পতাকা বিধি, ২০০২**

- **মূল বিধান:**

- **সার্বজনীন অধিকার:** ২০০২ সাল থেকে বেসরকারি নাগরিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলো বছরের সব দিন (মর্যাদার সাথে) পতাকা উত্তোলন করতে পারে।
- **উপাদান:** হাতে কাটা, হাতে বোনা বা মেশিনে তৈরি পতাকা (তুলা, পলিয়েস্টার, উল, সিল্ক, খাদি) ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।
- **প্রদর্শনের নিয়ম:** পতাকাকে সবসময় সম্মানের স্থানে এবং স্পষ্টভাবে স্থাপন করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিবাদন জানাতে পতাকাটি কখনোই নিচু করা যাবে না।
- **২০২২ সালের সংশোধনী:** খোলা জায়গায় বা বাড়ির উপরে প্রদর্শিত হলে দিন এবং রাত—উভয় সময়েই পতাকা ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে (আগে এটি কেবল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিল)।

৩. **সাংবিধানিক বিধান**

- **ধারা ৫১এ(এ):** সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, **জাতীয় পতাকা** ও **জাতীয় সঙ্গীতকে** শ্রদ্ধা করা প্রতিটি নাগরিকের একটি **মৌলিক কর্তব্য**।
- **ধারা ১৯(১)(এ):** সুপ্রিম কোর্ট (**ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম নবীন জিন্দাল, ২০০৪**) রায় দিয়েছে যে, জাতীয় পতাকা ওড়ানো একজন নাগরিকের আনুগত্য এবং গর্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে একটি **মৌলিক অধিকার**।

৪. **প্রতীক ও নাম (অনুচিত ব্যবহার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫০**

- **পরিধি:** পূর্ব অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক বা পেশাদার উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকা, সরকারি সিলমোহর, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সরকারি সীল ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

ভারতীয় জাতীয় পতাকার বিবর্তন

- **১৯০৬/১৯০৭ (কলকাতা পতাকা):** শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং সুকুমার মিত্রের নকশা করা প্রাথমিক তেরঙা পতাকা (সবুজ, হলুদ, লাল)।
- **১৯০৭ (ভিকাজি কামা):** মাদাম কামা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিদেশের মাটিতে (স্টুটগার্ট, জার্মানি) ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
- **১৯১৭ (হোম রুল আন্দোলন):** অ্যানি বেসান্ত এবং তিলক পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ অনুভূমিক স্ট্রাইপ বিশিষ্ট একটি পতাকা ব্যবহার করেছিলেন।
- **১৯২১ (পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া):** তিনি একটি **চরকা** (সুতো কাটার চাকা) সহ একটি নকশা প্রস্তাব করেন, যা মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেছিলেন।
- **১৯৪৭ (চূড়ান্ত গ্রহণ):** গণপরিষদ গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ তেরঙা পতাকাকে গ্রহণ করে, যেখানে চরকার পরিবর্তে ২৪টি স্পোক বিশিষ্ট **অশোক চক্র** স্থান পায়।

প্রতীকীবাদ ও জাতীয় পরিচয়

১. **তেরঙা (তিরঙ্গা) – মূল তাৎপর্য**

- **গেরুয়া (কেশরী):** দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক।
- **সাদা:** ধর্মচক্রের সাথে শান্তি ও সত্যের প্রতীক।
- **সবুজ:** ভূমির উর্বরতা, বৃদ্ধি এবং শুভলক্ষণ নির্দেশ করে।
- **অশোক চক্র:** এটি "ধর্মের চাকা" বা "আইনের চাকা"।
  - **২৪টি স্পোক:** দিনের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক, যা গতিশীলতা ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে ("গতিই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু")।
  - **ঐতিহাসিক সংযোগ:** এটি মৌর্য সম্রাট অশোকের **সারনাথ সিংহ স্তম্ভ** থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. **আবেগীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ**

- **ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি:** স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতি, ধর্ম এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে এই পতাকা একটি সাধারণ পরিচয় হিসেবে কাজ করেছিল।
- **জাতীয় গর্ব:** এটি জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, পতাকা ওড়ানো হলো "আনুগত্য এবং গর্বের" প্রকাশ।
- **ত্যাগ:** পতাকাটি সেই শহীদদের আত্মত্যাগের এক নীরব স্মারক যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

৩. **জাতীয় পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা**

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা:** শুরুর দিকের সংস্করণগুলোতে ধর্মীয় ইঙ্গিত থাকলেও (হিন্দুদের জন্য লাল, মুসলিমদের জন্য সবুজ), ১৯৪৭ সালের চূড়ান্ত নকশাটি ধর্মনিরপেক্ষ মূলবোধের (সাহস, শান্তি এবং প্রবৃদ্ধি) দিকে অগ্রসর হয়েছে।
- **জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান:** * **জন গণ মন:** ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করায় এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় পরিচয়কে শক্তিশালী করে।
    - **বন্দে মাতরম:** এটি সমমর্যাদার সাথে "জাতীয় গান" হিসেবে রয়েছে, যা বিপ্লবী চেতনা এবং মাতৃভূমি হিসেবে ভারতের রূপক স্বরূপ।

৪. **সাংবিধানিক দেশপ্রেম**

- **প্রতীকের ঊর্ধ্বে:** জাতীয় পরিচয় কেবল প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সেই আদর্শগুলোর সাথে যুক্ত যার প্রতিনিধিত্ব এই পতাকা করে: **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব**।
- **কর্তব্যপরায়ণতা:** এই প্রতীকগুলোকে সম্মান করা একটি মৌলিক কর্তব্য (ধারা ৫১এ), যা ব্যক্তিগত পরিচয়কে সম্মিলিত জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত করে।

প্রতীকীবাদ ও জাতীয় পরিচয়

১. **তেরঙা (তিরঙ্গা) – মূল তাৎপর্য**

- **গেরুয়া (কেশরী):** দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক।
- **সাদা:** শান্তি ও সত্যের প্রতীক, যার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্মচক্র।
- **সবুজ:** ভূমির উর্বরতা, বৃদ্ধি এবং শুভলক্ষণ নির্দেশ করে।
- **অশোক চক্র:** এটি "ধর্মের চাকা" বা "আইনের চাকা"।
    - **২৪টি স্পোক:** দিনের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক, যা গতিশীলতা ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে ("গতিই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু")।
    - **ঐতিহাসিক সংযোগ:** এটি মৌর্য সম্রাট অশোকের **সারনাথ সিংহ স্তম্ভ** থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. **আবেগীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ**

- **ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি:** স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতি, ধর্ম এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে এই পতাকা একটি সাধারণ পরিচয় হিসেবে কাজ করেছিল।
- **জাতীয় গর্ব:** এটি জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০৪ সালের **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম নবীন জিন্দাল** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, পতাকা ওড়ানো হলো "আনুগত্য এবং গর্বের" প্রকাশ।
- **ত্যাগ:** পতাকাটি সেইসব শহীদদের আত্মত্যাগের এক নীরব স্মারক যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

৩. **জাতীয় পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা**

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা:** শুরুর দিকের সংস্করণগুলোতে ধর্মীয় ইঙ্গিত থাকলেও (হিন্দুদের জন্য লাল, মুসলিমদের জন্য সবুজ), ১৯৪৭ সালের চূড়ান্ত নকশাটি ধর্মনিরপেক্ষ মূলবোধের (সাহস, শান্তি এবং প্রবৃদ্ধি) দিকে অগ্রসর হয়েছে।

- **জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান:** ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করার কারণে **'জন গণ মন'** গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, **'বন্দে মাতরম'** গানটি বিপ্লবী চেতনা ও মাতৃভূমিকে মায়ের রূপে বন্দনার প্রতীক হিসেবে সমান মর্যাদার সাথে "জাতীয় গান" হিসেবে স্বীকৃত।

৪. **সাংবিধানিক দেশপ্রেম**

- **প্রতীকের ঊর্ধ্বে:** জাতীয় পরিচয় কেবল পতাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সেই আদর্শগুলোর সাথে যুক্ত যার প্রতিনিধিত্ব এই পতাকা করে: **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব**।
- **কর্তব্যপরায়ণতা:** এই প্রতীকগুলোকে সম্মান করা একটি **মৌলিক কর্তব্য** (ধারা ৫১এ), যা ব্যক্তিগত পরিচয়কে সম্মিলিত জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত করে।

জাতীয় সঙ্গীত বনাম জাতীয় গান: একটি তুলনা

বৈশিষ্ট্য	জাতীয় সঙ্গীত (জন গণ মন)	জাতীয় গান (বন্দে মাতরম)
রচয়িতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭০-এর দশক)
উৎস	মূলত বাংলা ভাষায় রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত।	'আনন্দমঠ' উপন্যাস (১৮৮২) থেকে নেওয়া।
গৃহীত হওয়া	২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০ (গণপরিষদ দ্বারা)।	২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০ (সমমর্যাদায়)।
প্রতীকীবাদ	ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্যের (ভৌগোলিক/সাংস্কৃতিক) প্রতীক।	উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রতিরোধ ও বিপ্লবী উদ্দীপনার প্রতীক।
ভাষা	সাধু ভাষা বা তৎসম প্রধান বাংলা।	সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ।
প্রথম গাওয়া হয়	১৯১১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে।	১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন)।
আইনি মর্যাদা	১৯৭১ সালের আইনের অধীনে সুরক্ষিত।	সমমর্যাদা সম্পন্ন হলেও এটি না গাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দণ্ডবিধি নেই।

'জন গণ মন' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল এর লিরিক্স বা কথাগুলো অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ধর্মনিরপেক্ষ, যা ভারতের বিশাল ভূগোল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করে।

মূল চ্যালেঞ্জ: জাতীয় প্রতীক এবং পরিচয়

- **বাধ্যতামূলক বনাম স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম:** দেশপ্রেম আবেগ থেকে আসবে নাকি রাষ্ট্র চাপিয়ে দেবে—সেই বিতর্ক। **বিজো ইমানুয়েল (১৯৮৬)** মামলা অনুযায়ী, অসম্মান না করে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।
- **অপব্যবহার ও বাণিজ্যিকীকরণ:** বিশেষ করে প্লাস্টিকের পতাকার যত্রতত্র ব্যবহার এবং ১৯৫০ সালের আইন অমান্য করে বাণিজ্যিক পোশাকে বা ব্র্যান্ডিংয়ে পতাকার অবৈধ ব্যবহার রোধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **অন্তর্ভুক্তিতা বনাম ধর্মীয় ভাবমূর্তি:** 'বন্দে মাতরম'-এর বিপ্লবী রূপক (ভারতকে দেবী হিসেবে কল্পনা করা) এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- **ভিন্নমত বনাম জাতীয় সম্মান:** রাজনৈতিক প্রতিবাদের অধিকার এবং ১৯৭১ সালের অবমাননা বিরোধী আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে প্রতিবাদ যেন ইচ্ছাকৃত অবমাননায় পরিণত না হয়।
- **সাংবিধানিক দেশপ্রেম:** কেবল আনুষ্ঠানিক আচার-সর্বস্ব দেশপ্রেম (পতাকা উত্তোলন/সঙ্গীত) থেকে সরে এসে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতার মতো মূল সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করা।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সাংবিধানিক দেশপ্রেমের প্রচার:** জোরপূর্বক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবোধভিত্তিক পরিচয় গড়ে তোলা।
- **সচেতনতা ও শিক্ষা:** ভয় দেখিয়ে নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে প্রতীকের মর্যাদা বোঝাতে স্কুলের পাঠ্যক্রমে **ভারতের পতাকা বিধি, ২০০২** অন্তর্ভুক্ত করা।
- **টেকসই প্রতীকীবাদ:** প্লাস্টিকের পতাকা নিষিদ্ধ করা এবং পরিবেশবান্ধব বা খাদি সামগ্রীর ব্যবহার উৎসাহিত করা যাতে উৎসবের পর প্রতীকের অমর্যাদা না হয়।
- **বিচারবিভাগীয় ধারাবাহিকতা:** বিজো ইমানুয়েল (১৯৮৬) মামলার নীতি বজায় রাখা—অর্থাৎ সম্মানজনক ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার রক্ষা করা এবং ইচ্ছাকৃত অবমাননাকে শাস্তি দেওয়া।
- **উদ্‌যাপনে অন্তর্ভুক্তিতা:** নিশ্চিত করা যেন জাতীয় প্রতীকগুলো ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার

ভারতকে প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদ থেকে **সাংবিধানিক দেশপ্রেমের** দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় প্রতীকের পবিত্রতা রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখাই হলো আধুনিক ভারতের লক্ষ্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্মানই ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

Q. Trace the evolution of the Indian national flag and examine its role as a symbol of unity during the freedom struggle.

1.3.2. মহাদ সত্যাগ্রহ

মহাদ সত্যাগ্রহ কী?

এটি ছিল একটি অহিংস সামাজিক আন্দোলন যা **১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ** মহারাষ্ট্রের **মহাদ** নামক স্থানে **ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের** নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল দলিত সম্প্রদায়ের (তৎকালীন 'অস্পৃশ্য') মানুষের জন্য **চবদার পুকুর** থেকে জল ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটি একটি পাবলিক রিসোর্স বা সরকারি সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রথাগতভাবে তাদের এটি ব্যবহারে বাধা দেওয়া হতো।

মহাদ সত্যাগ্রহের পটভূমি

- **এস.কে. বোলে প্রস্তাব (১৯২৩):** বম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল একটি প্রস্তাব পাস করে, যেখানে সরকারি অর্থে পরিচালিত সমস্ত জলাশয়, কুয়ো এবং স্কুলে 'অস্পৃশ্য'দের প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়।
- **স্থানীয় অবজ্ঞা:** আইন থাকা সত্ত্বেও এবং ১৯২৪ সালে মহাদ মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এটি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও সামাজিক বয়কটের পথ বেছে নেয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি: 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'**-র ব্যানারে আম্বেদকর এই স্থানীয় সমস্যাটিকে একটি জাতীয় নাগরিক অধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন।

মহাদ সত্যাগ্রহের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **প্রতীকী প্রতিবাদ (২০শে মার্চ, ১৯২৭)**

- **সরাসরি পদক্ষেপ:** ডঃ আম্বেদকর হাজার হাজার অনুসারীকে নিয়ে চবদার পুকুরের দিকে পদযাত্রা করেন। তিনি নিজে প্রথম জল পান করেন এবং এরপর তাঁর অনুসারীরাও তা অনুসরণ করেন।
- **কুসংস্কার ভাঙা:** এই কাজটির মাধ্যমে 'স্পর্শ করলে জল অপবিত্র হয়'—এই ভুল ধারণাটি ভেঙে দেওয়া হয়। এটি কেবল জল খাওয়ার লড়াই ছিল না, বরং এটি ছিল **নাগরিক সাম্য** প্রদর্শনের একটি লড়াই।

২. **"মনুস্মৃতি দহন" (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৭)**

- **দ্বিতীয় পর্যায়:** প্রথম প্রতিবাদের পর রক্ষণশীল গোষ্ঠী গরুর মূত্র ও গোবর দিয়ে পুকুরটি 'পবিত্র' করার অনুষ্ঠান করে। এর প্রতিবাদে দ্বিতীয় দফায় সত্যাগ্রহের আয়োজন করা হয়।
- **আমূল পরিবর্তন:** আম্বেদকর এবং তাঁর অনুসারীরা **মনুস্মৃতি** পুড়িয়ে ফেলেন, যা জাতিভেদ প্রথা ও বৈষম্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। এটি ছিল জাতিভিত্তিক ধর্মীয় শোষণের সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

৩. **নারীদের অংশগ্রহণ**

- **লিঙ্গ সমতা:** প্রথমবারের মতো এত বড় সামাজিক আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।
- **সামাজিক সংস্কার:** আম্বেদকর দলিত মহিলাদের তাঁদের পোশাক পরার ধরণ পরিবর্তনের (যেমন—অন্যান্য মহিলাদের মতো শাড়ি পরা) আহ্বান জানান, যাতে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 'দাসত্বের চিহ্ন' মুছে ফেলে তাঁরা **মর্যাদা** ফিরে পান।

৪. **অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি**

- **কঠোর শৃঙ্খলা:** প্রথম মিছিলের পর রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, আম্বেদকর নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা যাতে কোনোভাবেই হিংসার আশ্রয় না নেন।
- **সাংবিধানিক পদ্ধতি:** তিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন যে এই লড়াই কোনো আইন ভাঙার জন্য নয়, বরং সরকারি প্রস্তাব (বোলে প্রস্তাব) **আইনিভাবে প্রয়োগ** করার জন্য।

৫. **ধর্মনিরপেক্ষ ও অধিকার-ভিত্তিক**

- **ধর্মীয় আন্দোলন নয়:** মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের মতো এটি কেবল ধর্মীয় বিষয় ছিল না। মহাদ সত্যাগ্রহ ছিল **নাগরিক অধিকার** সংক্রান্ত। এটি জল ব্যবহারের মতো একটি প্রাকৃতিক ও মৌলিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।
- **"মানুষকি" (মানবতা):** এর মূল দর্শন ছিল জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের **মর্যাদা** প্রতিষ্ঠা করা।

৬. **আইনি জয় (১৯৩৭)**

- **আইনের শাসন:** এই সংগ্রাম কেবল পুকুরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা আদালতে পৌঁছায়। দীর্ঘ দশ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর ১৯৩৭ সালে **বম্বে হাইকোর্ট** রায় দেয় যে দলিতদের ওই জলাশয় ব্যবহারের আইনি অধিকার আছে। কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে কোনো 'প্রথা' বা 'রেওয়াজ' মানুষের **আইনি অধিকারকে** খর্ব করতে পারে না।

মহাদ সত্যাগ্রহের গুরুত্ব

১. **সংবিধানের "প্রথম মহড়া"**

- **করুণার বদলে অধিকার:** এটি দলিতদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। তাঁরা দয়া বা করুণা ভিক্ষার বদলে একজন সমান নাগরিক হিসেবে নিজেদের **মৌলিক অধিকার** দাবি করতে শেখেন।
- **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পথপ্রদর্শক:** মহাদ সত্যাগ্রহের দাবিগুলোই পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানের **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদ** (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ) এবং **১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ** (বৈষম্য বিরোধী আইন) তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

২. **গণ-আন্দোলনের সূচনা**

- **রাজনৈতিক সচেতনতা:** এটি ছিল প্রথমবার যখন 'নিপীড়িত শ্রেণি' এত বড় আকারে সংগঠিত হয়ে সরাসরি প্রতিবাদের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি:** এটি **বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা**-কে একটি শক্তিশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত করে, যা কেবল আবেদনের বদলে সরাসরি লড়াইয়ে বিশ্বাসী ছিল।

৩. **বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রতীকী পরিবর্তন**

- **বৈষম্য বর্জন:** ১৯২৭ সালে মনুস্মৃতি দহন ছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চরম বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ। এটি প্রমাণ করে যে নিপীড়িত সমাজ আর অসমতার কোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নেবে না।
- **অধিকারের ধর্মনিরপেক্ষীকরণ:** জলের মতো একটি সাধারণ পরিষেবার জন্য লড়াই করে আম্বেদকর বিষয়টিকে একটি **ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকার** ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন।

৪. **নারী ক্ষমতায়ন**

- **ঐতিহাসিক ভাষণ:** সত্যাগ্রহ চলাকালীন মহিলাদের উদ্দেশে দেওয়া আম্বেদকরের ভাষণটি **ভারতীয় নারীবাদের** ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তিনি তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে এবং দাসত্বের চিহ্ন ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তিনি জানতেন মহিলারাই সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারিগর।

তুলনা: মহাদ বনাম লবণ সত্যাগ্রহ

বৈশিষ্ট্য	মহাদ সত্যাগ্রহ (১৯২৭)	লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০)
প্রধান প্রতিপক্ষ	**অভ্যন্তরীণ:** "সামন্ততান্ত্রিক-জাতপাত" ভিত্তিক নিপীড়ন এবং উচ্চবর্ণের সামাজিক ব্যবস্থা।	**বাহ্যিক:** ব্রিটিশ রাজের "ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী" শোষণ।
মূল "সম্পদ"	**জল:** জন্মের (জাতপাত) ভিত্তিতে অস্বীকার করা একটি প্রাকৃতিক ও জীবনদায়ী সম্পদ।	**লবণ:** রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের আরোপিত করযুক্ত একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য (ঔপনিবেশিক আইন)।
মূল দর্শন	**মানুষকি (মানবতাবাদ):** মানুষের মর্যাদা এবং "সামাজিক নাগরিকত্ব" পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।	**স্বরাজ (স্বশাসন):** রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং "জাতীয় স্বাধীনতা"র ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
আইনি কারণ	স্থানীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠী কর্তৃক ১৯২৩ সালের **বোলে প্রস্তাব** অমান্য করা।	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ১৮৮২ সালের **লবণ আইন** অমান্য করা।
নারীদের অন্তর্ভুক্তি	**আমূল পরিবর্তনকারী:** মহিলাদের জাতিভিত্তিক দাসত্বের দৃশ্যমান চিহ্নগুলো ত্যাগ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল (আম্বেদকরের ১৯২৭ সালের ভাষণ)।	**ব্যাপক:** আইন অমান্য আন্দোলনের সামনের সারিতে মহিলারা যোগ দিয়েছিলেন।
প্রধান প্রতীকী কাজ	**চবদার পুকুর** থেকে জল পান করা এবং **মনুস্মৃতি** দহন করা।	ডান্ডি উপকূলে **লবণ** তৈরি করা।
সাংবিধানিক ঐতিহ্য	সংবিধানের **১৫, ১৭ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** সরাসরি পূর্বসূরী।	রাজনৈতিক অংশগ্রহণের **মৌলিক অধিকারের** ভিত্তি।

উপসংহার

মহাদ সত্যাগ্রহ আজও সংবিধানের **১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের** মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি একটি **"ডিজিটাল মহাদ"**-এ রূপান্তরিত হয়েছে, যা সমস্ত নাগরিকের জন্য **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (DPI) এবং তথ্যের মর্যাদা নিশ্চিত করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

Q. "While the Salt Satyagraha challenged the legitimacy of a foreign power, the Mahad Satyagraha challenged the moral authority of an unequal internal social order." In light of this statement, evaluate the significance of the Mahad Satyagraha (1927) in laying the ethical and legal foundations of the Indian Constitution.

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ

ভূমিকা

যদিও "হেট স্পিচ" বা বিদ্বেষমূলক ভাষণের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা ভারতীয় সংবিধান বা BNS (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা)-এ নেই, তবুও বিভিন্ন আইনি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা নিম্নলিখিত কাঠামো প্রদান করেছে:

- **ভারতের আইন কমিশন (২৬৭তম রিপোর্ট):** এটি এমন এক ধরনের ভাষণ যা প্রধানত জাতি, নৃগোষ্ঠী, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই জাতীয় বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে **বিদ্বেষ ছড়াতে বা সহিংসতায় উসকানি দিতে** ব্যবহৃত হয়।

হেট স্পিচ সংক্রান্ত আইনি ও সাংবিধানিক বিধানসমূহ

সাংবিধানিক কাঠামো

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ):** এটি সকল নাগরিককে **বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার** গ্যারান্টি দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(২):** এটি নির্দিষ্ট কারণে বাক-স্বাধীনতার ওপর **"যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ"** আরোপ করে, যেমন:
    - ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা।
    - রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।
    - জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা।
    - কোনো অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া।
- **প্রস্তাবনা (Preamble):** ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত **'ভ্রাতৃত্ব'** (Fraternity) এবং **'মর্যাদা'** (Dignity)-র আদর্শগুলি এমন ভাষণ বা বক্তব্য রোধ করার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে যা সাম্প্রদায়িক ফাটল সৃষ্টি করে।

বিধিবদ্ধ বিধান (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা - BNS, ২০২৩)

বিটিএনএস (BNS) প্রাক্তন আইপিসি (IPC)-র স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং বিদ্বেষমূলক অপরাধ মোকাবিলায় নির্দিষ্ট ধারা যুক্ত করেছে:

- **ধারা ১৯৬ (প্রাক্তন ১৫৩এ আইপিসি):** ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে **বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা** সৃষ্টি করলে শাস্তির বিধান।
- **ধারা ২৯৯ (প্রাক্তন ২৯৫এ আইপিসি):** ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে করা ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কাজের শাস্তি।
- **ধারা ৩৫৩ (নতুন):** "মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য" প্রচার বা প্রচারের লক্ষ্যবস্তু করা যা জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে।
- **ধারা ১০৩(২):** এটি বিশেষভাবে **মব লিঞ্চিং** বা গণপিটুনি (জাতি, বর্ণ বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হত্যা) মোকাবিলা করে।

অন্যান্য আইন

- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (RPA), ১৯৫১:** এর **ধারা ১২৩(৩এ) এবং ১২৫** নির্বাচনী লাভের জন্য ঘৃণা ছড়ানো নিষিদ্ধ করে এবং একে "দুর্নীতিমূলক কাজ" হিসেবে গণ্য করে।
- **SC/ST (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯:** জনসমক্ষে SC/ST সম্প্রদায়ের সদস্যদের অপমান বা হেয় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ নিষিদ্ধ করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়

- **শ্রেয়া সিংঘল বনাম ভারত সরকার (২০১৫):** আইটি আইনের ৬৬এ ধারা বাতিল করে আদালত। এটি **আলোচনা (Discussion), সমর্থন (Advocacy) এবং উসকানি (Incitement)**-র মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে এবং জানায় যে কেবল "উসকানি" দিলেই তা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।
- **তেহসিন পুনাওয়ালা বনাম ভারত সরকার (২০১৮):** বিদ্বেষমূলক ভাষণের কারণে সৃষ্ট গণপিটুনি এবং সহিংসতা মোকাবিলায় "প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক এবং শাস্তিমূলক" নির্দেশিকা জারি করে।
- **শাহীন আবদুল্লাহ বনাম ভারত সরকার (২০২২/২৩):** সুপ্রিম কোর্ট সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দিয়েছে যে হেট স্পিচের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই **স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Suo Motu) এফআইআর (FIR)** দায়ের করতে হবে।

হেট স্পিচ নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আইনি ও সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা**

- **নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাব:** সংবিধান বা বিটিএনএস (BNS) কোথাও "হেট স্পিচ"-এর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়নি। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে, যা কখনও অতি-সক্রিয়তা আবার কখনও নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেয়।
- **বাক-স্বাধীনতা বনাম উসকানি:** আইনের মাধ্যমে কেবল "উসকানি" রোধ করা যায়। কিন্তু সাধারণ আপত্তিকর বক্তব্য এবং সহিংসতায় উসকানির মধ্যে পার্থক্য করা একটি আইনি ধূসর অঞ্চল।

২. **ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত বাধা**

- **ভাইরাল গতি:** সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (যেমন X বা হোয়াটসঅ্যাপ) তথ্য যাচাই বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই বিদ্বেষমূলক ভাষণ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।
- **গোপনীয়তা ও এনক্রিপশন:** এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের কারণে বিদ্বেষমূলক বার্তার **"মূল উৎস"** খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **অ্যালগরিদমগত পক্ষপাত:** সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলি অনেক সময় বেশি 'এনগেজমেন্ট' পাওয়ার জন্য উসকানিমূলক পোস্টগুলিকে বেশি প্রচার করে।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রয়োগগত ঘাটতি**

- **নিম্ন দণ্ডাদেশের হার:** বিটিএনএস-এর ধারা ১৯৬ বা ২৯৯-এর অধীনে **"বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়"** প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। মামলা বছরের পর বছর চলায় আইনের ভয় কমে যায়।
- **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে অনেক সময় হেট স্পিচকে হাতিয়ার করা হয়, যার ফলে প্রভাবশালী বক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ চাপ অনুভব করে।

৪. **সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ**

- **চিলিং এফেক্ট (Chilling Effect):** অস্পষ্ট আইনের অপব্যবহার করে অনেক সময় সাংবাদিক বা সমাজকর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যা সুস্থ গণতন্ত্রের বাক-স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।
- **ঘৃণার স্বাভাবিকীকরণ:** যখন বিদ্বেষমূলক ভাষণ মূলধারার আলোচনায় জায়গা করে নেয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ কমে যায়।

নিচে আপনার প্রদান করা **'হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা'** সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আপনি এটি সরাসরি ওয়ার্ড ফাইলে (Word File) কপি করে নিতে পারেন।

হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

১. **আইনি ব্যবস্থা: আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করা**

- **সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা:** পুলিশের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার সুযোগ কমাতে **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা** (BNS)-এ "হেট স্পিচ"-এর একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা।
- **নতুন দণ্ডবিধি ধারা: বিশ্বনাথন কমিটির** সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ধারাগুলো যুক্ত করা:
  - **ধারা ১৫৩-সি (153C):** ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে "ঘৃণা ছড়ানো বা উসকানি দেওয়াকে" লক্ষ্যবস্তু করা।
  - **ধারা ৫০৫-এ (505A):** অবমাননাকর শব্দ বা প্রদর্শনের মাধ্যমে "ভয়, আতঙ্ক বা সহিংসতায় উসকানি" দেওয়াকে দণ্ডনীয় করা।
- **স্তরভিত্তিক শাস্তি:** সব অপরাধের জন্য একই সাজা না রেখে একটি স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা (যেমন: প্রথমবার আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য জরিমানা, কিন্তু গণহত্যার উসকানি দিলে ৫-১০ বছরের কারাদণ্ড)।

২. **প্রশাসনিক ও নির্বাহী ব্যবস্থা**

- **স্বতঃস্ফূর্ত** (Suo Motu) FIR: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ (**শাহীন আবদুল্লাহ মামলা**) কঠোরভাবে পালন করা, যেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই পুলিশকে অবিলম্বে মামলা নথিভুক্ত করতে হবে। দেরি হলে তাকে **'আদালত অবমাননা'** হিসেবে গণ্য করা।
- **জেলা নোডাল অফিসার: তেহসিন পুনাওয়ালা (২০১৮)** মামলার নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করা যারা বিদ্বেষমূলক ভাষণের কারণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করবেন।
- **২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট অপসারণ: আইটি নিয়ম** (IT Rules), ২০২৬-এর অধীনে, নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে "দ্রুত ছড়িয়ে পড়া" বিদ্বেষমূলক কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলা বাধ্যতামূলক করা।

৩. **বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা: কঠোরতা নিশ্চিত করা**

- **বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট:** হেট স্পিচ এবং মব লিঞ্চিং বা গণপিটুনির বিচার **৬ মাসের** মধ্যে শেষ করার জন্য বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা, যাতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিচারের গুরুত্ব হারিয়ে না যায়।
- **তিন-স্তরীয় পরীক্ষা** (Three-Part Test): কোনো বক্তব্যকে বিচার করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (**রাবাত প্ল্যান অফ অ্যাকশন**) গ্রহণ করা:
  1. **প্রেক্ষাপট** (Context)
  2. **বক্তার উদ্দেশ্য** (Speaker's intent)
  3. **ক্ষতির আসন্ন সম্ভাবনা** (Imminence of harm)
- **প্রতিকারমূলক বিচার** (Restorative Justice): অহিংস কিন্তু ক্ষতিকর বক্তব্যের ক্ষেত্রে আদালত জনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বা সমাজসেবামূলক কাজের নির্দেশ দিতে পারে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে।

৪. **সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা**

- **মিডিয়া লিটারেসি** (Media Literacy): শিক্ষার্থীদের ভুল তথ্য এবং মেরুকরণ করা বক্তব্য চিনতে সাহায্য করার জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে "ডিজিটাল নাগরিকত্ব" অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন: সচেতনতার **'কর্ণাটক মডেল'**)।

- **পাল্টা-বক্তব্য কৌশল (Counter-Speech Strategy):** চরমপন্থী মতাদর্শকে কেবল সেন্সরশিপ দিয়ে না রুখে, তার বদলে "ইতিবাচক বক্তব্য" এবং সামাজিক প্রচারণার মাধ্যমে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তিমিত করা।
- **সনাক্তকরণের জন্য AI:** আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে "পরিকল্পিত ঘৃণা" বা ষড়যন্ত্র শনাক্ত করতে **নিরাপদ ও বিশ্বস্ত AI** (ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬) ব্যবহার করা, যাতে মাঠ পর্যায়ে সহিংসতা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করা যায়।

উপসংহার

হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)** (বাক-স্বাধীনতা) এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত **'ভ্রাতৃত্ব'** (Fraternity)-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারতের সামাজিক কাঠামোকে ভবিষ্যতে সুরক্ষিত রাখতে **BNS-সম্মত আইনি স্বচ্ছতা, আইটি নিয়ম ২০২৬**-এর অধীনে এআই-চালিত নিয়ন্ত্রণ এবং একটি সচেতন ও ডিজিটাল-মনস্ক নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

Q. "বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা" বলতে আপনি কী বোঝেন? এটি কি হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণকেও অন্তর্ভুক্ত করে? ভারতের চলচ্চিত্রগুলো কেন মত প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যম থেকে কিছুটা আলাদা স্তরে অবস্থান করে? আলোচনা করুন।

2.1.2. এক দেশ এক নির্বাচন

ভূমিকা

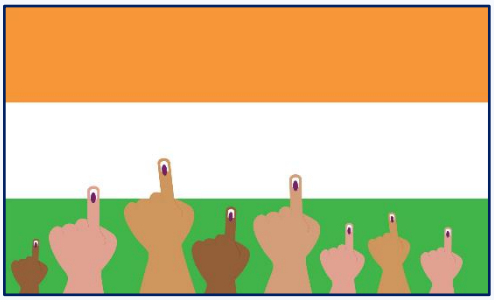

এক দেশ এক নির্বাচন ধারণাটি এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে **লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা** এবং **স্থানীয় সংস্থাগুলির** (পঞ্চায়েত ও পৌরসভা) নির্বাচন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একযোগে বা সমসাময়িকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- **স্বাভাবিক নিয়ম (১৯৫১-১৯৬৭):** স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক (১৯৫১-৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭) ভারতে একযোগে নির্বাচন হওয়াই ছিল সাধারণ দস্তুর।
- **বিঘ্ন ঘটা:** ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে বেশ কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা (যেমন- হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ) এবং ১৯৭০ সালে খোদ লোকসভা সময়ের আগে ভেঙে যাওয়ার ফলে এই চক্রটি ভেঙে যায়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন:**
  - **ল কমিশন (১৭০তম রিপোর্ট, ১৯৯৯):** স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পুনরায় একযোগে নির্বাচনের সুপারিশ করেছিল।
  - **নির্বাচন কমিশন (১৯৮৩):** নির্বাচনী চক্র ভেঙে যাওয়ার পর প্রথমবার এই ধারণাটি উত্থাপন করেছিল।
  - **নীতি আয়োগ (২০১৭):** দুই ধাপে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে একই সময়ের মধ্যে আনার পক্ষে একটি কার্যপত্র (Working paper) প্রকাশ করেছিল।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর গুরুত্ব

১. শাসনব্যবস্থা এবং নীতির ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করা

- **"নীতিগত পক্ষাঘাত" বা পলিসি প্যারালাইসিস দূর করা:** ঘনঘন **আদর্শ আচরণবিধি** (MCC) জারি হওয়ার ফলে নতুন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ থমকে যায়। 'এক দেশ এক নির্বাচন' নিরবচ্ছিন্ন শাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার নিশ্চিত করে।
- **কাজের ওপর গুরুত্ব:** এটি নেতৃত্বের মনোযোগ "সারাক্ষণ নির্বাচনী প্রচার" থেকে সরিয়ে প্রশাসনিক কাজের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জনমোহিনী রাজনীতির বদলে চার-পাঁচ বছর ধরে উন্নয়নের কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

২. **অর্থনৈতিক ও আর্থিক গুরুত্ব**

- **বিপুল খরচ সাশ্রয়:** এটি লজিস্টিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্বিগুণ খরচ কমিয়ে দেয়। একযোগে ভোট হলে ঘনঘন নির্বাচনের কারণে অপচয় হওয়া প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি অর্থ সাশ্রয় হবে।
- **জিডিপি (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়ক:** নির্বাচনী র‍্যালির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে (Supply-chain) বিঘ্ন ঘটা হ্রাস পায়। উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি (HLC) পরামর্শ দিয়েছে যে, এটি প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধিতে **১.৫ শতাংশ পয়েন্ট** পর্যন্ত অবদান রাখতে পারে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** বিকেন্দ্রীভূত এবং বিশাল নির্বাচনী ব্যয়ের ফলে বাজারে হঠাৎ যে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়, এটি তা নিয়ন্ত্রণ করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সাহায্য করে।

৩. **প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা দক্ষতা**

- **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) এবং সিভিল কর্মীদের (যেমন- শিক্ষক) বারবার তাদের মূল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নির্বাচনী কাজে লাগানো বন্ধ হবে। এতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সরকারি পরিষেবা আরও উন্নত হবে।
- **একক ভোটার তালিকা:** একটি সাধারণ ভোটার তালিকা এবং **একক ভোটার কার্ড** (Single EPIC)-এর মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজ হবে। এতে তথ্যের দ্বিরুক্তি বন্ধ হবে এবং নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রশাসনিক চাপ কমবে।

৪. **গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রভাব**

- **জনমোহিনী রাজনীতি রোধ:** এটি স্বল্পমেয়াদী "বিনামূল্যে উপহার" বা খয়রাতি দেওয়ার প্রবণতার বদলে অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং "কঠিন" সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেয়।
- **দুর্নীতি দমন:** ঘনঘন নির্বাচন না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সারাক্ষণ তহবিল সংগ্রহের চাপ কম থাকে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় **"কালো টাকা"**-র ভূমিকা কমিয়ে দিতে পারে।
- **ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি:** এটি **"ভোটার ক্লান্তি"** দূর করে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সুবিধা তৈরি করে, যারা একবার বাড়ি ফিরেই সরকারের বিভিন্ন স্তরের (কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয়) জন্য ভোট দিতে পারবেন।

এক দেশ এক নির্বাচন (ONOE)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সাংবিধানিক ও আইনি বাধা**

- **প্রধান সংশোধনী:** এর জন্য সংবিধানের **৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪ এবং ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** সংশোধন করা প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদগুলো লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোর মেয়াদ এবং তা ভেঙে দেওয়ার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে।
- **রাজ্যগুলোর অনুমোদন:** কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং স্থানীয় সরকার (৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনী) সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুচ্ছেদ ৩৬৮-এর অধীনে অন্তত **অর্ধেক রাজ্য বিধানসভার** সম্মতির প্রয়োজন।
- **মধ্যবর্তী সময়ে পতন:** যদি কোনো সরকার মেয়াদের মাঝপথে **ভেঙে যায়**, তবে একটি বড় সংকট তৈরি হবে। বর্তমান প্রস্তাবে "অবশিষ্টাংশ মেয়াদের" (শুধুমাত্র বাকি সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন) কথা বলা হয়েছে, যা ঘনঘন "অন্তর্বর্তী" নির্বাচনের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং ওনো (ONOE)-এর মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করতে পারে।

২. **ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি হুমকি**

- **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন খর্ব হওয়া:** রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের মেয়াদের সাথে তাল মেলাতে বাধ্য করা তাদের স্বাধীন সাংবিধানিক অস্তিত্বের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে (**এস.আর. বোম্মাই মামলা**)।
- **আঞ্চলিক দলগুলোর কোণঠাসা হওয়া:** একযোগে নির্বাচন হলে জাতীয় ইস্যুগুলো অনেক সময় স্থানীয় সমস্যাগুলোকে ছাপিয়ে যায়। IDFC **ইনস্টিটিউটের** একটি সমীক্ষা বলছে, একযোগে নির্বাচন হলে ভোটারদের কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলকে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা **৭৭%** থাকে।

৩. **লজিস্টিক এবং পরিচালনাগত জটিলতা**

- **EVM/VVPAT-এর অভাব:** নির্বাচন কমিশনের বর্তমানের তুলনায় প্রায় **দ্বিগুণ** ভোটদান যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। এতে বিশাল উৎপাদন খরচ এবং মেশিনগুলো রাখার জন্য গুদামজাতকরণের বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
- **নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন:** সারা দেশে একযোগে নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা (CAPF) নিশ্চিত করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার ওপর প্রভাব**

- **জনমতের সুযোগ কমে যাওয়া:** ধাপে ধাপে নির্বাচনগুলো একটি "মধ্যবর্তী পর্যালোচনা" হিসেবে কাজ করে, যা সরকারকে দায়বদ্ধ রাখে। ওনো (ONOE) চালু হলে সরকার হয়তো **"পাঁচ বছরে মাত্র একবার"** দায়বদ্ধ থাকবে।
- **ভোটারদের বিভ্রান্তি:** একই দিনে একাধিক ভোট দেওয়ার সময় ভোটাররা জাতীয় ইস্যু (যেমন- বিদেশ নীতি) এবং স্থানীয় ইস্যু (যেমন- জল/রাস্তা)-র মধ্যে পার্থক্য করতে সমস্যায় পড়তে পারেন।

৫. **রাজনৈতিক বিরোধিতা**

- **ঐকমত্যের অভাব:** অনেক আঞ্চলিক ও বিরোধী দল ওনো (ONOE)-কে একটি "এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র" বা "রাষ্ট্রপতি শাসিত" ব্যবস্থার দিকে পদক্ষেপ হিসেবে মনে করে। এর ফলে রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ এবং এই সংস্কার নিয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা দিচ্ছে।

উচ্চ-পর্যায়ের (কোবিন্দ) কমিটির সুপারিশ

রাম নাথ কোবিন্দ-এর সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি (২০২৪) একটি **পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির** সুপারিশ করেছে:

- **ধাপ ১:** লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন একযোগে করা। এর জন্য রাজ্যগুলোর অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
- **ধাপ ২:** সাধারণ নির্বাচনের **১০০ দিনের** মধ্যে স্থানীয় সংস্থার (পঞ্চায়েত/পৌরসভা) নির্বাচন করা। এর জন্য অন্তত অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
- **একক ভোটার তালিকা:** তিনটি স্তরের জন্যই একটি সাধারণ ভোটার তালিকা এবং একটি পরিচয়পত্র (EPIC) তৈরি করা।
- **অবশিষ্টাংশ মেয়াদ (Unexpired Term):** ত্রিশঙ্কু সংসদ বা অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নতুন কক্ষটি কেবল ৫ বছরের চক্রের **বাকি সময়ের** জন্যই কাজ করবে।

বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ব্যবস্থা

- **দক্ষিণ আফ্রিকা:** প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।
- **সুইডেন:** জাতীয় সংসদ (Riksdag), আঞ্চলিক কাউন্সিল এবং স্থানীয় কাউন্সিলের নির্বাচন একই দিনে (সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় রবিবার) হয়।
- **জার্মানি:** এখানে **"গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব"** (Constructive Vote of No-Confidence) ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ, বিকল্প কোনো সরকার প্রস্তুত না থাকা পর্যন্ত বর্তমান সরকারকে সরানো যায় না। এটি মেয়াদের পূর্ণতা নিশ্চিত করে।
- **ইন্দোনেশিয়া:** ইন্দোনেশিয়া দেখিয়েছে যে একযোগে বিশাল ভোটদান লজিস্টিক্যালি সম্ভব, কিন্তু এটি প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য (অতীতে কর্মীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল)।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন (দুই ধাপের পদ্ধতি)**

- **প্রথম পর্যায়:** লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে করা।
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** সাধারণ নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনগুলোকেও এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা।

২. **সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো**

- **নির্ধারিত তারিখ:** রাষ্ট্রপতি একটি "নির্ধারিত তারিখ" (যেমন- ২০২৯ সাল) ঘোষণা করবেন যেখান থেকে এই সমন্বয় শুরু হবে। ঐ তারিখের পর শেষ হওয়া বিধানসভাগুলোর মেয়াদ লোকসভার সাথে মিলিয়ে সমন্বয় করা হবে।
- **প্রয়োজনীয় সংশোধনী: ৮৩ এবং ১৭২ নম্বর অনুচ্ছেদে** প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে "অবশিষ্টাংশ মেয়াদ" সংজ্ঞায়িত করা, যাতে মাঝপথে সরকার ভেঙে গেলেও চক্রটি বজায় থাকে।

৩. **স্থিতিশীলতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা**

- **ত্রিশঙ্কু সংসদ সামলানো:** অনাস্থা প্রস্তাব বা ত্রিশঙ্কু সংসদের ক্ষেত্রে নতুন নির্বাচন কেবল ৫ বছরের চক্রের **বাকি সময়ের** জন্য হবে, পূর্ণ ৫ বছরের জন্য নয়।
- **জার্মান মডেলের প্রয়োগ:** জার্মান মডেলটি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে বিকল্প সরকার গঠন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সরকারকে অপসারণ করা যায় না।

৪. **লজিস্টিক প্রস্তুতি**

- **সরঞ্জাম বৃদ্ধি:** নির্বাচন কমিশনকে বিপুল পরিমাণ **EVM এবং VVPAT** সংগ্রহের পরিকল্পনা করতে হবে এবং দেশজুড়ে একক উইন্ডোতে নির্বাচনের জন্য বিশেষ গুদাম ও নিরাপত্তা প্রোটোকল তৈরি করতে হবে।

৫. **রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকমত্য গঠন**

- **দ্বিপাক্ষিক আলোচনা:** যেহেতু এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে, তাই একটি **যৌথ সংসদীয় কমিটি (JPC)** গঠন করে আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করা উচিত যাতে তাদের ভয় দূর করা যায়।
- **জনসচেতনতা:** ভোটারদের এর সুবিধা (সাশ্রয়, নিরবচ্ছিন্ন শাসন) এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত করতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাতে হবে।

উপসংহার

যদিও **এক দেশ এক নির্বাচন** প্রশাসনিক এবং আর্থিক দক্ষতার একটি দিকরেখা প্রদান করে, এর সাফল্য নির্ভর করে শাসনের স্থিতিশীলতা এবং **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** ও **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

Q. Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation-one election" principle.

2.1.3. রাজ্যপাল, সাংবিধানিক সীমারেখা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রীয় শিষ্টাচারের অবক্ষয়

ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোয় রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। আশা করা হয় যে, এই পদটি একটি নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংবিধান রক্ষা করবে এবং নির্বাচিত সরকারকে সহায়তা প্রদান করবে। একইসাথে, এটি কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে ভারতের এককেন্দ্রিক প্রবণতাসম্পন্ন (Unitary bias) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করবে।

যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যপালের কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিধি এবং সাংবিধানিক কর্তৃত্বের সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই বিতর্কগুলি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিধান এবং বিচারবিভাগীয় নীতিগুলির ব্যাখ্যার দিকে নজর আকর্ষণ করেছে:

- **অনুচ্ছেদ ১৭৬:** রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ।

- **অনুচ্ছেদ ২০০:** বিলের ওপর সম্মতি প্রদান, ফেরত পাঠানো বা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতা।
- **'বিবেচিত সম্মতি' (Deemed Assent) তত্ত্ব:** রাজ্যপালের কাজে বিলম্বের সমস্যা সমাধানের জন্য বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই ধারণাটি গড়ে উঠেছে।
- **অনুচ্ছেদ ১৬৪:** মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং মেয়াদের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের কর্তৃত্ব।
- **সাংবিধানিক নীতি:** রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে **'পাঞ্জাব রাজ্য বনাম পাঞ্জাবের রাজ্যপাল (২০২৩)'** মামলায় স্পষ্ট করা নীতিসমূহ।

রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা: তত্ত্ব বনাম বাস্তবতা

সংবিধানের **১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে রাজ্যপাল পদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি রাজ্যের একজন করে রাজ্যপাল থাকবেন। **১৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী পদে বহাল থাকেন।

যদিও **১৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে রাজ্যের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত থাকে, তবে সাধারণত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সাহায্য ও পরামর্শ অনুযায়ী (Aid and Advice) এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সাংবিধানিক তত্ত্বে, রাজ্যপাল মূলত তিনটি প্রধান ভূমিকা পালন করেন:

১. রাজ্যের শাসনবিভাগের সাংবিধানিক প্রধান।

২. কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংযোগকারী সেতু।

৩. রাজ্যের অভ্যন্তরে সাংবিধানিক পদ্ধতির অভিভাবক।

আদর্শগত প্রত্যাশা হলো—রাজ্যপাল একজন নির্দলীয় সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন এবং শাসনব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৭৬: বিশেষ ভাষণ এবং রাজ্যপালের ম্যান্ডেট

ভারতের সংবিধানের **১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় ভাষণ দেবেন:

- প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পর বিধানসভার **প্রথম অধিবেশনের সূচনায়**।
- প্রতি বছর আইনসভার **প্রথম অধিবেশনের শুরুতে**।

সাংবিধানিক গুরুত্ব:

রাজ্যপালের এই ভাষণ নির্বাচিত সরকারের **নীতিগত কাঠামো** (Policy Framework) এবং **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি** (Legislative Agenda) রূপরেখা তুলে ধরে। এরপর একটি **ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব** (Motion of Thanks) আনা হয়, যা আইনসভাকে সরকারের নীতিগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেয়। বাস্তবে, এই ভাষণটি **মন্ত্রিপরিষদ** (Council of Ministers) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, যা এই নীতিকেই প্রতিফলিত করে যে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

সাংবিধানিক প্রভাব:

যখন রাজ্যপাল ভাষণ দিতে অস্বীকার করেন বা সরকারের প্রস্তুত করা খসড়ায় **মৌলিক পরিবর্তন** (Substantial Alterations) ঘটান, তখন তা সাংবিধানিক উদ্বেগের সৃষ্টি করে কারণ:

- এই ভাষণটি নির্বাচিত সরকারের **নীতিগত বিবৃতি** (Policy Statement), এটি রাজ্যপালের ব্যক্তিগত মতামত নয়।
- ভাষণ প্রদানে অস্বীকৃতি বা পরিবর্তন **দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার** (Responsible Government) নীতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
- এটি প্রতিষ্ঠিত **সংসদীয় রীতি** (Parliamentary Conventions) ব্যাহত করতে পারে।

তাই, আইনসভার কার্যপ্রক্রিয়ার **প্রথাগত অখণ্ডতা** (Procedural Integrity) বজায় রাখার জন্য ১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে চলা অপরিহার্য।

আইন প্রণয়নে অচলাবস্থা

সাংবিধানিক বিধান:

ভারতের সংবিধানের **২০০ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে, রাজ্য আইনসভায় পাস হওয়া কোনো বিল যখন রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়, তখন তিনি:

- বিলে **সম্মতি প্রদান** (Assent) করতে পারেন।
- সম্মতি **স্থগিত** (Withhold) রাখতে পারেন।
- বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় **ফেরত পাঠাতে** (Return) পারেন (যদি এটি অর্থবিল না হয়)।
- রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি **সংরক্ষণ** (Reserve) করতে পারেন।

বিল ফেরত পাঠানো:

যদি রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো বিল ফেরত পাঠান, তবে আইনসভা সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়াই বিলটি পুনরায় পাস করতে পারে। একবার বিলটি **পুনরায় পাস** (Re-passed) হয়ে গেলে, রাজ্যপাল সাধারণত তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন, যদি না বিলটি সংবিধানের ২০১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

আইন প্রণয়নে বিলম্বের সমস্যা:

যদিও ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদে রাজ্যপালের কাছে থাকা বিকল্পগুলোর উল্লেখ আছে, তবে এই বিকল্পগুলো প্রয়োগ করার জন্য কোনো **নির্দিষ্ট সময়সীমা** (Time Limit) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। সংবিধানের এই **নীরবতার** (Constitutional Silence) সুযোগে অনেক সময় বিলের সম্মতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়।

এই ধরনের বিলম্ব কার্যকরভাবে **আইনসভার উদ্দেশ্যকে** (Legislative Intent) বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে রাজ্যপাল এবং নির্বাচিত সরকারের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

'বিবেচিত সম্মতি' বা ডিমড অ্যাসেন্ট (Doctrine of Deemed Assent)

সংবিধানের **২০০ নম্বর অনুচ্ছেদে** কোনো স্পষ্ট সময়সীমা না থাকায় আদালত **'বিবেচিত সম্মতি'** (Deemed Assent) তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

ধারণাগত ভিত্তি:

'বিবেচিত সম্মতি' বলতে এমন একটি বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যাকে বোঝায়, যেখানে কোনো বিলকে **সম্মতিপ্রাপ্ত** হিসেবে গণ্য করা হতে পারে যদি রাজ্যপাল একটি **যুক্তিসঙ্গত সময়ের** (Reasonable Period) মধ্যে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন অথবা সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী কোনো আচরণ করেন।

যদিও সংবিধানে সরাসরি 'বিবেচিত সম্মতি'র কথা উল্লেখ নেই, তবে এই তত্ত্বটি নিম্নোক্ত বৃহত্তর সাংবিধানিক নীতিগুলো থেকে উদ্ভূত হয়েছে:

- **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা** (Democratic Accountability)
- **আইনের শাসন** (Rule of Law)
- **সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা** (Functional Efficiency)

সাংবিধানিক যুক্তি:

বিচারবিভাগ জোর দিয়ে বলেছে যে, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাদের ক্ষমতা একটি যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় **অনির্দিষ্টকালের বিলম্ব** (Indefinite Delay) সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল চেতনার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ফলস্বরূপ, 'বিবেচিত সম্মতি'র এই তত্ত্বটি প্রশাসনিক বা নির্বাহী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে একটি **সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ** (Constitutional Safeguard) হিসেবে কাজ করে।

পাঞ্জাব মামলা (২০২৩) এবং বিচারবিভাগীয় স্পষ্টীকরণ

'পাঞ্জাব রাজ্য বনাম পাঞ্জাবের রাজ্যপাল (২০২৩)' মামলায় রাজ্যপালের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রেক্ষাপট:

পাঞ্জাব সরকার এবং রাজ্যপালের মধ্যে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান এবং বিভিন্ন বিলের অনুমোদন নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ:

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে:

- রাজ্যপাল অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে **স্থগিত বা বিলম্বিত** করতে পারেন না।
- রাজ্যপালকে সাধারণত মন্ত্রিপরিষদের **সাহায্য ও পরামর্শ** (Aid and Advice) অনুযায়ী কাজ করতে হবে।
- সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষগুলোর কাজ হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে **সহজতর করা** (Facilitate), তাতে বাধা সৃষ্টি করা নয়।

এই রায়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, রাজ্যপালের ভূমিকা মূলত **সাংবিধানিক ও পদ্ধতিগত** (Constitutional and Procedural), রাজনৈতিক নয়।

মন্ত্রীর গ্রেফতার এবং রাজ্যপালের কর্তৃত্ব

সাংবিধানিক বিধান:

ভারতের সংবিধানের **১৬৪ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, মন্ত্রীরা রাজ্যপালের **সন্তোষ** (Pleasure) অনুযায়ী পদে বহাল থাকেন। তবে, এই **'সন্তোষ তত্ত্ব'** (Pleasure Doctrine) সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কাজ করে, যেখানে মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

সাংবিধানিক অনুশীলন:

বাস্তবে, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী এই 'সন্তোষ তত্ত্ব' প্রয়োগ করেন। ফলস্বরূপ:

- মুখ্যমন্ত্রী সুপারিশ না করলে রাজ্যপাল **একতরফাভাবে** (Unilaterally) কোনো মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন না।
- কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে **গ্রেফতার বা ফৌজদারি কার্যক্রম** (Arrest or Criminal Proceedings) শুরু হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ বিলুপ্ত হয় না।

বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে, মন্ত্রীদের **রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা** (Political Accountability) মূলত নির্বাচিত সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে।

রাজ্যে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ

সাংবিধানিক বিধান:

ভারতের সংবিধানের **১৬৪(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, পদ গ্রহণের আগে একজন মন্ত্রীকে অবশ্যই রাজ্যপালের কাছে **পদ ও গোপনীয়তার শপথ** (Oath of Office and Secrecy) নিতে হয়।

সাংবিধানিক রীতি:

যদিও রাজ্যপাল শপথবাক্য পাঠ করান, কিন্তু মন্ত্রীদের নিয়োগ সম্পন্ন হয় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে। তাই, শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাজ্যপালের ভূমিকা মূলত **আনুষ্ঠানিক** (Formal)।

যদি কোনো আদালত মন্ত্রীর দণ্ডাদেশ বা কনভিকশন **স্থগিত** (Suspend) করে দেয়, তবে সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা সাধারণত মনে করেন যে, তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নেই—যদি না **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন** (Representation of the People Act) অনুযায়ী অযোগ্যতার কোনো শর্ত প্রযোজ্য হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রভাব: প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **স্পষ্ট সময়সীমার অভাব** (Absence of Clear Timelines): রাজ্যপাল আইনসভা পাসের বিলের ওপর কতদিনের মধ্যে পদক্ষেপ নেবেন, সংবিধানে তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, যা অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

২. **রাজ্যপাল পদের রাজনৈতিকীকরণ** (Politicisation): রাজ্যপাল নিয়োগের প্রক্রিয়াটি প্রায়ই রাজনৈতিক হয়, যা পদের **নিরপেক্ষতা ও নিস্পৃহতাকে** (Neutrality and Impartiality) প্রভাবিত করতে পারে।

৩. **বারংবার বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ** (Frequent Judicial Intervention): সাংবিধানিক অস্পষ্টতা দূর করতে ক্রমেই আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হচ্ছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাতের ইঙ্গিত দেয়।

৪. **আইন প্রণয়নে বিলম্ব** (Legislative Delays): রাজ্যপালের দীর্ঘসূত্রিতা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা মন্থর করে দিতে পারে।

৫. **কেন্দ্র-রাজ্য উত্তেজনা** (Centre–State Tensions): রাজ্যপাল এবং নির্বাচিত রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সংঘাতকে তীব্র করতে পারে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক অনিশ্চয়তা** (Institutional Uncertainty): এই ধরনের দ্বন্দ্ব শাসনে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগনের আস্থা দুর্বল করতে পারে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

১. **কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন** (Implement Commission Recommendations): **সরকারিয়া কমিশন** (Sarkaria Commission) সুপারিশ করেছিল যে, রাজ্যপাল হিসেবে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিত যারা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে এবং নিরপেক্ষ। এটি পদের **সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা** (Constitutional Impartiality) নিশ্চিত করবে।

২. **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার স্পষ্টীকরণ** (Clarify Discretionary Powers): **পুঞ্ছি কমিশনের** (Punchhi Commission) প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাত এড়াতে রাজ্যপালের **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার** (Discretionary Powers) বিষয়ে আরও স্পষ্ট সাংবিধানিক নির্দেশিকা তৈরি করা উচিত।

৩. **বিলে সম্মতির জন্য যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা নির্ধারণ** (Fix Reasonable Timelines): বিলের বিষয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট **সময়সীমা** (Timelines) নির্ধারণ করলে আইন প্রণয়নে বিলম্ব এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা রোধ করা সম্ভব হবে।

৪. **মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শের নীতি শক্তিশালী করা** (Strengthen Ministerial Advice): রাজ্যপাল যাতে সাধারণত **মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ** (Aid and Advice) অনুযায়ী কাজ করেন, তা নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিক রীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

৫. **অরাজনৈতিক নিয়োগ নিশ্চিত করা** (Ensure Non-Partisan Appointments): রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর **স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা** (Transparency and Neutrality) বজায় রাখলে জনগনের আস্থা বাড়বে এবং **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর** (Cooperative Federalism) আদর্শ সমুন্নত থাকবে।

উপসংহার

রাজ্যপালের কার্যকাল নিয়ে উদ্ভূত সাংবিধানিক বিতর্কগুলো **সাংবিধানিক কর্তৃত্ব** (Constitutional Authority) এবং **গণতান্ত্রিক শাসনের** (Democratic Governance) মধ্যেকার জটিল সমীকরণকে তুলে ধরে। ভবিষ্যতে **সাংবিধানিক রীতি** (Constitutional Conventions), বিচারবিভাগীয় স্পষ্টতা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। এটি নিশ্চিত করবে যে, রাজ্যপালের পদটি একটি **নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান** (Neutral Constitutional Institution) হিসেবে কাজ করছে, যা নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলোর **গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটকে** (Democratic Mandate) সম্মান জানিয়ে শাসনপ্রক্রিয়াকে সহজতর করবে।

Q. "রাজ্যপালের পদটি একটি নিরপেক্ষ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার জন্য উদ্দিষ্ট, তবুও সাম্প্রতিক বিতর্কগুলি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার' (Federal Etiquette) ক্ষুণ্ণ হওয়া নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সংবিধানের ১৭৬ ও ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে আলোচনা করুন।"

2.1.4. ভারতের কারাগারে মহামারীর প্রাদুর্ভাব: জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্থানাভাব

প্রেক্ষাপট

ভারতের কারাগার ব্যবস্থা বর্তমানে একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের সম্মুখীন। জলপাইগুড়িতে HSV **প্রাদুর্ভাব (২০২৫–২৬)** এই ব্যবস্থার গভীর কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে উন্মোচিত করেছে। দীর্ঘস্থায়ী **অতিরিক্ত ভিড়** (Overcrowding), নিম্নমানের স্যানিটেশন এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা কারাগারগুলোকে যক্ষ্মা (TB), এইচআইভি (HIV) এবং কোভিডের মতো রোগের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ফলে, কারাগারের স্বাস্থ্য এখন জনস্বাস্থ্য, শাসনব্যবস্থা এবং **মানবাধিকারের** (Human Rights) মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূমিকা

- একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কারাগার কেবল শাস্তিমূলক স্থান নয়, বরং এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে রাষ্ট্রকে বন্দিদের মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হয়। **সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21) অনুযায়ী, বন্দিদের স্বাস্থ্য এবং মানবিক আচরণের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
- তবে সাংবিধানিক আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। ভারতের কারাগারগুলো মূলত স্থানাভাব, সেকেলে অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসেবার **পদ্ধতিগত অবহেলার** (Systemic neglect) শিকার।

কেন কারাগারের স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক উদ্বেগ

১. **জনস্বাস্থ্যের বাহ্যিক প্রভাব** (Public Health Externalities)

- **রোগের উচ্চ সংক্রমণ:** অতিরিক্ত ভিড় এবং অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের কারণে কারাগারগুলো **'রোগবিস্তারকারী কেন্দ্রে'** (Epidemiological amplifiers) পরিণত হয়। এখানে সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় যক্ষ্মা হওয়ার হার প্রায় ৫ গুণ বেশি।
- **সমাজে ছড়িয়ে পড়া:** কারাকর্মী, দর্শনার্থী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের মাধ্যমে সংক্রমণ কারাগারের দেয়াল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যা একে একটি বৃহত্তর **জনস্বাস্থ্য সংকটে** পরিণত করে।

২. **মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা**

- **মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন:** পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করা ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং **সাংবিধানিক নৈতিকতাকে** (Constitutional morality) ক্ষুণ্ণ করে।
- **রাষ্ট্রের ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা:** বিচারবিভাগীয় রায় অনুযায়ী, কারাবাস মানেই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া নয়। বন্দিদের মানবিক পরিবেশ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি আবশ্যিক দায়িত্ব।

৩. **ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার সূচক**

- **বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন বন্দি (Undertrials):** মোট বন্দির ৭৫–৮০% বিচারাধীন হওয়া তদন্ত, প্রসিকিউশন এবং বিচার প্রক্রিয়ার অদক্ষতাকে নির্দেশ করে।
- **কাঠামোগত ত্রুটি:** অতিরিক্ত ভিড় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার গভীর ত্রুটিগুলোকে প্রতিফলিত করে, যার জন্য ব্যাপক **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (Institutional reforms)** প্রয়োজন।

৪. **সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক**

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান:** কারাগারের অধিকাংশ বন্দি আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী থেকে আসে।
- **অসমতা বৃদ্ধি:** কারাগারের স্বাস্থ্যসেবার অবহেলা বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং বঞ্চনার চক্রকে স্থায়ী করে।

ভারতের কারাগার ইকোসিস্টেমের পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত অতিরিক্ত ভিড় (Structural Overcrowding):** ভারতের অনেক কারাগারে ধারণক্ষমতার ১৫০% বেশি বন্দি থাকে। যেমন- কান্দি সাব-জেলে এটি ৪০০% ছাড়িয়ে গেছে। তিহার বা আর্থার রোড জেলও এর ব্যতিক্রম নয়।

- **প্রভাব:** ভিড়ের কারণে মৌলিক পরিচ্ছন্নতা এবং **শারীরিক দূরত্ব (Physical distancing)** বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **বিচারাধীন বন্দির উচ্চ হার:** বিচার বিলম্ব এবং জামিনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক বাধার কারণে কারাগারে বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা অত্যধিক।

- **প্রভাব:** কারাগারগুলো সংশোধন কেন্দ্রের বদলে 'আটক কেন্দ্রে' পরিণত হয়েছে, যা **'দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ'**—এই নীতিকে ক্ষুণ্ন করে।

৩. **অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো:** কারাগারের স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসাকর্মীদের **৪৩% শূন্যপদ** রয়েছে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের চরম অভাব লক্ষ্য করা যায়।

- **প্রভাব:** সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অভাবে সাধারণ রোগও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

৪. **উচ্চ রোগব্যাধি (High Disease Burden):** HSV, TB এবং HIV-এর বারবার প্রাদুর্ভাব ব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংক্রামক ব্যাধি ছড়াতে সাহায্য করে।

৫. **শাসনব্যবস্থা ও নীতির অভাব: মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল (২০১৬)**-এর অসম বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব একটি বড় শাসনতান্ত্রিক ঘাটতি।

৬. **মানসিক স্বাস্থ্যের অবহেলা:** মনোবিজ্ঞানী এবং কাউন্সেলরদের অভাব এবং কারাগারের পীড়াদায়ক পরিবেশ একটি **নীরব মানসিক স্বাস্থ্য সংকট** তৈরি করছে, যা পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।

এখানে প্রবন্ধের বাকি অংশের মার্জিত বাংলা অনুবাদ এবং বিশ্লেষণ দেওয়া হলো। UPSC-র জন্য প্রয়োজনীয় **কী-ওয়ার্ড (Key Words)** গুলো বোল্ড করে দেওয়া হয়েছে:

অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি

উন্নয়নশীল দেশসমূহ

- **ফিলিপাইন:** কুইজন সিটি জেল (Quezon City Jail) এর একটি প্রকট উদাহরণ, যা ধারণক্ষমতার **৫০০% এরও বেশি** বন্দি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।
- **ব্রাজিল:** দেশটির কারাগার ব্যবস্থা অতিরিক্ত ভিড়, সহিংসতা এবং **সংক্রামক ব্যাধির (Infectious diseases)** চক্রে আবদ্ধ।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা:** কারাগারগুলোতে এইচআইভি (HIV) এবং যক্ষ্মার (TB) উচ্চ প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, যা স্বাস্থ্যসেবার **পদ্ধতিগত অপর্যাপ্ততাকে (Systemic inadequacies)** প্রতিফলিত করে।

উন্নত দেশসমূহ (Developed Countries)

- **যুক্তরাষ্ট্র:** উন্নত অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও দেশটি **গণ-কারাবাস (Mass incarceration)** এবং রাইকার্স আইল্যান্ডের (Rikers Island) মতো সংশোধনাগারগুলোতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।
- **যুক্তরাজ্য:** এখানেও অতিরিক্ত ভিড় এবং কারাগারের পরিস্থিতির অবনতি ঘটার খবর পাওয়া গেছে।
- **ইউরোপীয় দেশ (ইতালি ও ফ্রান্স):** অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে **মানবিক মর্যাদার মানদণ্ড (Human dignity norms)** লঙ্ঘনের দায়ে এই দেশগুলো বিচার বিভাগীয় তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছে।

উত্তরণের পথ

১. **তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ (Immediate Interventions)**
   - কারাগারে প্রবেশের সময় বাধ্যতামূলক **স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Health screening)**।
   - সংক্রামক ব্যাধির জন্য পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা।
   - **আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন (Isolation and quarantine)** সুবিধার ব্যবস্থা করা।
   - জরুরি মহামারী মোকাবিলা প্রটোকল তৈরি।

২. **স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ**
   - চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্রুত নিয়োগ।
   - প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে কারাকর্মীদের **সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity-building)**।
   - **টেলিমেডিসিন (Telemedicine)** পরিষেবার প্রসার।
   - শক্তিশালী রোগ নজরদারি ব্যবস্থা (Disease surveillance) গড়ে তোলা।

৩. **অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ (Addressing Overcrowding)**
   - বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে বিচারাধীন মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি।
   - সামান্য অপরাধের ক্ষেত্রে **জামিন ব্যবস্থার উদারীকরণ (Liberalization of bail)**।
   - কারাবাসের বিকল্প হিসেবে **প্রবেশন (Probation)** এবং সমাজসেবার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ।
   - বিদেশি বন্দিদের দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।

৪. **কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার**
   - **কারাগার অবকাঠামো:** স্যানিটেশন, ভেন্টিলেশন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ আধুনিকীকরণ।
   - **ফৌজদারি বিচার সংস্কার:** কারাবাসের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করা।
   - **জনস্বাস্থ্য একীকরণ:** কারাগারের স্বাস্থ্যসেবাকে **জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (National Health Mission)** অন্তর্ভুক্ত করা এবং বন্দিদের ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড তৈরি।
   - **নীতি প্রয়োগ: মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল (Model Prison Manual)**-এর অভিন্ন ও কঠোর বাস্তবায়ন।

উপসংহার

ভারতের কারাগার সংকট আসলে **সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে শাস্তির সাথে মানবিক মর্যাদার সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গভীর কাঠামোগত এবং নৈতিক ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি **সংস্কারমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Rights-based approach)** প্রয়োজন। নেলসন ম্যান্ডেলার মতে, একটি সমাজ তার দুর্বলতম সদস্যদের সাথে কেমন আচরণ করে, তার মাধ্যমেই সেই সমাজের বিচার হয়। তাই কারাগারগুলোকে মানবিক করে তোলা একটি **সভ্যতাগত আবশ্যকতা (Civilizational imperative)**।

Q. Prison health is not merely a correctional issue but a critical governance and public health concern." Examine in the context of overcrowding and institutional deficiencies in India's prison system.

2.1.5. স্বেচ্ছামৃত্যু এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার

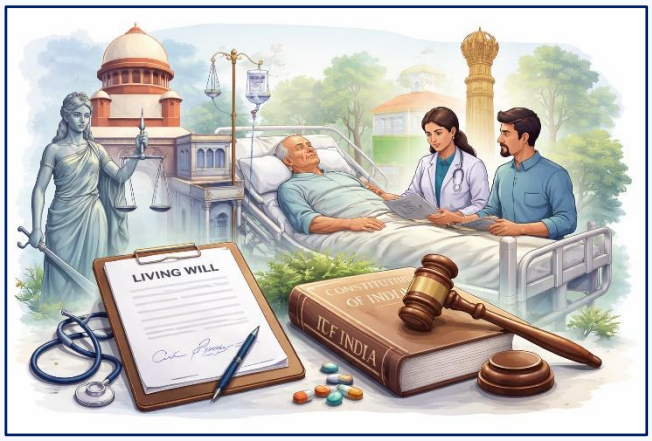

প্রেক্ষিত

একটি যুগান্তকারী ঘটনায়, **হরিশ রানা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০২৬)** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথমবারের মতো তার **প্যাসিভ ইউথানেসিয়া** (Passive Euthanasia) বা পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুর নির্দেশিকাগুলোর বাস্তব প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে।

স্বেচ্ছামৃত্যু (Euthanasia) সম্পর্কে কিছু তথ্য

গ্রীক শব্দ 'Eu' (ভালো) এবং 'Thanatos' (মৃত্যু) থেকে এই শব্দটি এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো **"ভালো মৃত্যু"** বা **"করুণা করে হত্যা"**। অসহ্য যন্ত্রণা এবং কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির জীবন শেষ করার প্রক্রিয়াকে এটি বোঝায়।

সম্মতির ওপর ভিত্তি করে এর শ্রেণিবিভাগ:

- **স্বেচ্ছাধীন** (Voluntary): যখন রোগী নিজে স্পষ্ট সম্মতি দেন।
- **অ-স্বেচ্ছাধীন** (Non-voluntary): যখন রোগী নিজে সম্মতি দিতে অক্ষম (যেমন- কোমায় থাকা অবস্থা) এবং পরিবার বা অভিভাবক সিদ্ধান্ত নেন।
- **ইচ্ছার বিরুদ্ধে** (Involuntary): রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন কেড়ে নেওয়া (এটি খুনের সমান এবং বিশ্বজুড়ে অবৈধ)।

সক্রিয় বনাম পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যু (Active vs. Passive Euthanasia)

বৈশিষ্ট্য	সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু (Active)	পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যু (Passive)
সংজ্ঞা	মৃত্যুর জন্য সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া।	জীবনদায়ী চিকিৎসা বা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া।
প্রকৃতি	সরাসরি হস্তক্ষেপ।	স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হতে দেওয়া।
ভারতে আইনি অবস্থা	**অবৈধ**।	**বৈধ** (সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশিকা মেনে)।
উদাহরণ	প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দেওয়া।	ভেন্টিলেটর বা ফিডিং টিউব সরিয়ে নেওয়া।
SC ২০২৬ স্পষ্টীকরণ	"স্বেচ্ছামৃত্যু" শব্দটি এখন শুধুমাত্র **সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যুর** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	একে এখন দাপ্তরিকভাবে **"চিকিৎসা প্রত্যাহার বা বন্ধ রাখা"** বলা হয়।

স্বেচ্ছামৃত্যু সংক্রান্ত আইনি ও সাংবিধানিক বিধান

- **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21): 'জীবনের অধিকার' একটি মৌলিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট এর ব্যাখ্যায় বলেছে, এর অর্থ হলো **"মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার"**, যার মধ্যে **"মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার"** অন্তর্ভুক্ত।
- **২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 226): হাইকোর্টের রিট জারির ক্ষমতা রয়েছে; অচেতন রোগীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদনের জন্য পরিবারগুলো সাধারণত এখানেই প্রথম দ্বারস্থ হয়।
- **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা** (BNS), **২০২৩**: সক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু **ধারা ১০০** (অপরাধমূলক নরহত্যা) বা **ধারা ১০১** (খুন) অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে বিচারবিভাগীয় বিবর্তন

আইনি যাত্রাটি **"জীবনের পবিত্রতা"** থেকে **"জীবনের মান"**-এর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে:

১. **মারুতি শ্রীপতি দুবল (১৯৮৭):** বোম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে "বেঁচে থাকার অধিকারের" মধ্যে "মরার অধিকারও" আছে (আত্মহত্যাকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছিল)।

২. **জ্ঞান কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৬):** সুপ্রিম কোর্ট আগের রায়টি বদলে দেয় এবং জানায় যে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ জীবনকে রক্ষা করার জন্য, শেষ করার জন্য নয়।

৩. **অরুনা শানবাগ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১):** প্রথমবারের মতো হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে **পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুর** (Passive Euthanasia) স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৪. **কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৮):** সুপ্রিম কোর্ট **মর্যাদার সাথে মৃত্যুকে** একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। এটি **"লিভিং উইল"** (Living Wills) বা অগ্রিম চিকিৎসা নির্দেশিকাকে বৈধতা দেয়।

৫. **হরিশ রানা মামলা (২০২৬):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে CANH (ক্লিনিক্যালি অ্যাসিস্টেড নিউট্রিশন অ্যান্ড হাইড্রেশন বা কৃত্রিমভাবে খাবার ও জল সরবরাহ) একটি চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হবে এবং এর কোনো সুফল না থাকলে তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

স্বেচ্ছামৃত্যুর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি

"প্রো-চয়েস" বা পছন্দের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি

- **মর্যাদার মৌলিক অধিকার: ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে, "বেঁচে থাকার অধিকার" কেবল পশুদের মতো বেঁচে থাকা নয়; বরং যখন জীবন অসহ্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন **মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকারও** এর অন্তর্ভুক্ত।
- **শারীরিক স্বায়ত্তশাসন:** নিজের শরীরের ওপর একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসার হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করার (যেমন: **লিভিং উইল**) পছন্দও অন্তর্ভুক্ত।
- **ব্যর্থ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি:** আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে মৃত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও শারীরিকভাবে "জীবিত" রাখতে পারে। স্বেচ্ছামৃত্যু এই **"অর্থহীন" যন্ত্রণার** অবসান ঘটায়।
- **অর্থনৈতিক ও সম্পদের যুক্তি:** ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে রোগীর তুলনায় হাসপাতালের বেড কম, সেখানে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন রোগীদের পেছনে আইসিইউ (ICU) সম্পদ ব্যয় না করে, তা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা রোগীদের জন্য ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।
- **নিষ্ঠুরতার বদলে মমতা:** কৃত্রিমভাবে টিউবের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় (Persistent Vegetative State) বাঁচিয়ে রাখাকে ইদানীং সুপ্রিম কোর্ট "সেবা"র বদলে **"নিষ্ঠুরতা"** হিসেবে দেখছে।

"প্রো-লাইফ" বা জীবনের পবিত্রতার পক্ষে যুক্তি

- **অপব্যবহারের ঝুঁকি** (Slippery Slope)**:** সম্পত্তির লোভে আত্মীয়দের দ্বারা বা প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের বোঝা মনে করে রাষ্ট্রের দ্বারা এই আইনের **অপব্যবহারের** গুরুতর আশঙ্কা থাকে।
- **জীবনের পবিত্রতা:** অনেক ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো বিশ্বাস করে যে জীবন একটি পবিত্র উপহার; এর সমাপ্তি হওয়া উচিত স্বাভাবিকভাবে। মানুষের **"ঈশ্বর হওয়ার চেষ্টা"** করা উচিত নয়।
- **চিকিৎসা নীতি:** এটি **হিপোক্রেটিক ওথ** বা চিকিৎসকদের শপথের ("প্রথমত, কোনো ক্ষতি করো না") বিরোধী। এটি ডাক্তার ও রোগীর মধ্যকার বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে।
- **প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অভাব:** সমালোচকদের মতে, উন্নতমানের ব্যথা উপশমকারী চিকিৎসার (Palliative Care) অভাবেই মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যু চায়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হলে মৃত্যুর ইচ্ছা কমে যায়।
- **সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা:** চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। আজকের "লাইফ-সাপোর্টে" থাকা রোগীর জন্য কাল হয়তো কোনো নতুন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হতে পারে। স্বেচ্ছামৃত্যু একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত।

ভবিষ্যৎ পথ

একটি মানবিক এবং দক্ষ পরিকাঠামো তৈরির জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো জরুরি:

- **একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন:** সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে একটি সংসদীয় আইন তৈরির অনুরোধ করেছে, যা বর্তমানের অন্তর্বর্তীকালীন বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকার বদলে একটি স্থায়ী স্বচ্ছতা আনবে।
- **প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সার্বজনীনকরণ:** মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার উন্নত প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটিকে **আয়ুষ্মান ভারত (PM-JAY)** প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **ABHA-এর মাধ্যমে ডিজিটালকরণ:** "লিভিং উইল" বা অগ্রিম নির্দেশিকাগুলোকে সরাসরি **আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ অ্যাকাউন্ট (ABHA)**-এর সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে জরুরি অবস্থায় ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- **চিকিৎসা প্রটোকল বা নিয়মাবলী নির্ধারণ:** হরিশ রানা মামলার প্রেক্ষিতে, কৃত্রিমভাবে খাবার ও জল সরবরাহ (CANH) বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার, যাতে ডাক্তারদের ওপর "অনাহারে রাখা" বা "হত্যার" অভিযোগ না আসে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** "লিভিং উইল" বিষয়টি এখনো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। জাতীয় স্তরে প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা সুস্থ অবস্থায় নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে পারেন।

উপসংহার

ভারতের আইনি দৃষ্টিভঙ্গি **"জীবনের পবিত্রতা"** থেকে **"জীবনের মান"**-এর দিকে সরে আসা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এখন প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় সহানুভূতিকে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা, যাতে মানুষের মর্যাদা রক্ষা পায়।

Q. "The recognition of the Right to Die with Dignity reflects the evolving interpretation of Article 21 of the Indian Constitution." Discuss in the light of recent Supreme Court judgments on euthanasia.

2.1.6. NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ: বিচার বিভাগীয় দায়বদ্ধতা ও বাক-স্বাধীনতার পরীক্ষা

ভূমিকা

যেকোনো গণতন্ত্রে বিচার বিভাগকে **স্বাধীনতা (Independence)** এবং **দায়বদ্ধতার (Accountability)** মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। ভারতে বিচার বিভাগ সাধারণত **'আদালত অবমাননা' (Contempt of Court)** ক্ষমতার মাধ্যমে তার মর্যাদা রক্ষা করে। তবে ম্যাক বুট (Max Boot)-এর মতো পণ্ডিতরা তাঁর *'Out of Order' (১৯৯৮)* গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিচার বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসচেতনতা থাকলেই কেবল বিচার ব্যবস্থায় প্রকৃত সংস্কার সম্ভব।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। বিচার বিভাগের এই **'সেন্সর' (Censor)** হিসেবে ভূমিকা পালন করা গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও **বাক-স্বাধীনতা (Freedom of Expression)** নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

পটভূমি: NCERT পাঠ্যবই বিতর্ক (The Controversy)

NCERT-এর অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে **"আমাদের সমাজে বিচার বিভাগের ভূমিকা"** শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বিচার বিভাগের শক্তি এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষিত করা।

ক. বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু (Key Content)

আদালত যে বিষয়গুলোর ওপর আপত্তি জানিয়েছে:

- **বিচারিক বিলম্ব (Judicial Delay):** তথ্য অনুসারে ২০২৫ সালের শেষে সুপ্রিম কোর্টে **৯২,০০০** এবং দেশজুড়ে মোট **৪.৭৬ কোটির** বেশি মামলা ঝুলে আছে। এখানে **"বিলম্বে বিচার মানেই বিচারহীনতা"** নীতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- **বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি (Judicial Corruption):** বইটিতে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে দুর্নীতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।
- **ব্যাঙ্গালোর বিচার বিভাগীয় আচরণবিধি (Bangalore Principles):** বিচারকদের সততা, নিরপেক্ষতা এবং চারিত্রিক গুণাবলি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উল্লেখ।
- **দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া (Accountability Mechanisms):** সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব **'ইন-হাউস প্রসিডিউর' (In-house Procedure)** এবং সংবিধানের **১২৪ ও ২১৭ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী বিচারকদের অপসারণের (Impeachment) পদ্ধতির আলোচনা।

খ. সুপ্রিম কোর্টের ত্রি-স্তরীয় রায় (The SC Ruling)

ভারতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. **পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা (Complete Blanket Ban):** পাঠ্যবইটির বিতরণ এবং শিক্ষাদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

২. **"অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য" (Underlying Agenda):** আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, এই বিষয়বস্তু বিচার বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটি একপেশে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা।

৩. **প্রশাসনিক শাস্তি (Administrative Punishment):** সংশ্লিষ্ট লেখক ও বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যতে যেকোনো সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট থেকে **অব্যাহতি (Disassociated)** বা কালো তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালতের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি

সমালোচিত হলেও, **প্রতিষ্ঠানিক সুরক্ষা (Institutional Preservation)** নিশ্চিত করতে আদালতের এই হস্তক্ষেপকে নিম্নোক্তভাবে সমর্থন করা হয়েছে:

- **জনআস্থা বজায় রাখা:** বিচারবিভাগের শক্তি জনবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে **নেতিবাচক ধারণা** তৈরি হলে দীর্ঘমেয়াদে **আইনের শাসনের (Rule of Law)** বৈধতা সংকটে পড়তে পারে।
- **ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা:** আদালতের মতে, পাঠ্যবইটি ছিল **একপেশে (Selective)**। এটি ই-কোর্ট (e-Courts), আইনি সহায়তা (Legal Aid) এবং ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিডের (NJDG) মতো **রূপান্তরমূলক সংস্কারগুলোকে** এড়িয়ে গেছে।
- **অনুচ্ছেদ ১২৯ (অবমাননার জন্য শাস্তি):** সুপ্রিম কোর্ট একটি **'কোর্ট অফ রেকর্ড' (Court of Record)** হিসেবে তার মর্যাদা ও কর্তৃত্ব রক্ষা করার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী।
- **ভুল তথ্য রোধ:** সমর্থকদের মতে, **শিক্ষায় স্বাধীনতা (Academic Freedom)** মানে এই নয় যে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে সংবিধানের তৃতীয় স্তম্ভের (বিচারবিভাগ) প্রতি অনাস্থা তৈরি করা যাবে।

পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ নিয়ে প্রধান উদ্বেগ

এই নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় সংবিধান এবং আইনি নীতির লঙ্ঘনের বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে:

- **বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘন:** সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(অ)** অনুযায়ী শিক্ষামূলক উপাদান প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত।
    - **অনুচ্ছেদ ১৯(২)** অনুযায়ী শুধুমাত্র রাষ্ট্রের তৈরি করা কোনো **আইনের** মাধ্যমেই এই অধিকার সংকুচিত করা সম্ভব।
    - **নরেশ শ্রীধর মিরাজকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৬৬)** মামলা অনুযায়ী, আদালতের কোনো আদেশ অনুচ্ছেদ ১৯(২)-এর অধীনে 'আইন' হিসেবে গণ্য হয় না।
- **আদালত অবমাননার শর্ত পূরণ না হওয়া: আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ (Section 2c)** অনুযায়ী, অপরাধমূলক অবমাননার জন্য আদালতের কর্তৃত্বকে কলঙ্কিত করা বা বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন।

- মামলার দীর্ঘসূত্রতা বা দুর্নীতির মতো সাধারণ ও তথ্যভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে আদালতের কোনো **ক্ষতি বা অসৎ উদ্দেশ্য** (Malicious Intent) প্রমাণিত হয়নি।

- **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার ও আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন:** লেখক ও কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতের প্রজেক্ট থেকে **বিচ্ছিন্ন** (Blacklisted) করার শাস্তিমূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
  - কোনো প্রকার **নোটিশ বা শুনানির সুযোগ** (Natural Justice/Audi Alteram Partem) ছাড়াই।
  - এটি সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৪ (সাম্য)** এবং **অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার)** লঙ্ঘন করে।
- **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার স্ববিরোধিতা ও প্রতিকারের অভাব:** আদালত হলো মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত রক্ষক। যখন আদালত নিজেই বাকস্বাধীনতা খর্ব করে:
  - নাগরিকদের কাছে কোনো **প্রতিকারের পথ** (Remedy) থাকে না, কারণ বিচারবিভাগের উপরে কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই।
  - এটি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে **অধিকারের রক্ষকই অধিকার হরণকারীর** ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব এবং বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা

১. ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব

- **জনআস্থার ক্ষয়** (Erosion of Public Trust): আলোচনার পথ রুদ্ধ করলে এমন বার্তা যায় যে বিচারবিভাগ **তদন্ত বা পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে**, যা এর নৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **মুক্তচিন্তা ও শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব** (Chilling Effect): লেখক, প্রকাশক এবং শিক্ষকরা যে কোনো সমালোচনামূলক বিষয় এড়িয়ে চলতে পারেন, যা তরুণ নাগরিকদের মধ্যে **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে** দুর্বল করে।
- **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণে ঝুঁকি** (Threat to Separation of Powers): যখন কোনো একটি বিভাগ নিজের সম্পর্কে বিতর্ক স্তব্ধ করে দেয়, তখন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের **জবাবদিহিতা** দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি:** শিক্ষার্থীরা ভারসাম্যপূর্ণ **নাগরিক শিক্ষা** (Civic Education) লাভের সুযোগ হারায়, যা সচেতন নাগরিকত্ব গঠনের পথে অন্তরায়।

বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতায় বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

উন্নত গণতন্ত্রগুলি গোপনীয়তার বদলে **উন্মুক্ততার** মাধ্যমে বিচারবিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করে:

- **কেনিয়ার মডেল (২০১১-২০১৩):** প্রধান বিচারপতি উইলি মুতুঙ্গা **জুডিশিয়াল ওমবাডসম্যান** (Judicial Ombudspersons) এবং পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন। সমস্যাগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করার ফলে জনআস্থা ২০০৯ সালের ২৭% থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে **৬১%** হয়েছিল।
- **আমেরিকা ও ব্রিটেন:** সেখানে সংবাদমাধ্যম এবং শিক্ষাবিদরা অবাধে বিচারবিভাগের কর্মক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেন। আদালত সমালোচনা নিষিদ্ধ করার বদলে **স্বচ্ছতা** (Transparency) বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেয়।

ভারতের নিজস্ব বিচারবিভাগীয় অবস্থান

ভারতীয় আদালত নিজেই অতীতে বিভিন্ন সমস্যা স্বীকার করেছে:

- **কে. বীরাস্বামী বনাম ভারত সরকার (১৯৯১):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা **দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের** অধীনে 'public servant' বা জনসেবক হিসেবে গণ্য হবেন।
- **সততার দাবি:** আদালত জোর দিয়ে বলেছিল যে বিচারকের সততার বিষয়ে সমাজের দাবি **অপেক্ষাতীত ও পরম** (Absolute)। এমনকি একজন অসৎ বিচারকও পুরো বিচারব্যবস্থার **অখণ্ডতাকে** (Integrity) বিপন্ন করতে পারেন।

- **স্বীকৃতি বনাম নিষেধাজ্ঞা:** সুপ্রিম কোর্ট নিজেই বারবার **'bad apples'** (অসৎ বিচারক), মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং **ইন-হাউস মেকানিজমের** প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সতর্ক করেছে; অথচ একই কথা বলা একটি বই নিষিদ্ধ করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কৌশলগত রোডম্যাপ

শাসনব্যবস্থায় দমনমূলক সংস্কৃতির বদলে **স্বচ্ছতা ও ক্ষমতায়ন** আনতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন:

ক. **দায়বদ্ধতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া** (Formalizing Accountability)

- **বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা:** জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (NJAC) পুনরুজ্জীবিত করা বা **জুডিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিল** পাস করা, যাতে অভিযোগগুলি একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।
- **যোগ্যতা-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন:** কলেজগুলির স্বাধীনতাকে NIRF র‍্যাঙ্কিং এবং NBA স্বীকৃতির সাথে যুক্ত করা। যেসব কলেজ গুণমান প্রমাণ করবে, তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে **একাডেমিক ও আর্থিক স্বাধীনতা** দেওয়া উচিত।

খ. **নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কাঠামোগত সমাধানে গুরুত্ব** (Structural Fixes)

- **শূন্যপদ পূরণ:** হাইকোর্টগুলিতে **৩০% শূন্যপদ** এবং কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা। পাঠ্যবইয়ে সমস্যার কথা সেন্সর করার চেয়ে **মামলার জট** (Pendency) কমানো অনেক বেশি কার্যকর।
- **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রক' থেকে **'একাডেমিক মেন্টর'** বা পরামর্শদাতার ভূমিকায় আসতে হবে।

গ. **প্রাতিষ্ঠানিক সংযম** (Institutional Restraint)

- **'শেষ অস্ত্র' নীতি:** আদালত অবমাননা বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা কেবল তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন তা **একান্ত অনিবার্য**।
- **স্ক্রুটিনি বা পর্যালোচনার নীতি: লর্ড অ্যাটকিন** (Lord Atkin)-এর মতানুসারে, প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো 'নিভৃত গুণ' (cloistered virtues) নয়। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য তাদের **জনসাধারণের পর্যালোচনার** মুখোমুখি হওয়ার মতো শক্তিশালী হতে হবে।

ঘ. **পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ** (NCERT Model)

- **সমস্যা-সমাধান ভিত্তিক শিক্ষাদান:** চ্যালেঞ্জগুলো গোপন না করে পাঠ্যবইয়ে সততার সাথে **কাঠামোগত বাধা** (যেমন: মামলার জট) এবং তার **আধুনিক সমাধান** (যেমন: এআই-চালিত কোর্ট, লোক আদালত) তুলে ধরতে হবে।

উপসংহার

এনসিইআরটি পাঠ্যবই নিষিদ্ধ করার বিষয়টি কেবল একটি বই নিয়ে নয়—এটি ২০২৬ সালে **ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি অগ্নিপরীক্ষা**। বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা অপরিহার্য হলেও, প্রকৃত মর্যাদা আসে **স্বচ্ছতা** (Transparency) থেকে, নীরবতা থেকে নয়। লেখক কালেশ্বরম রাজ এবং তুলসী কে. রাজের ভাষায়— **"পদ্ধতিগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ হলো সেগুলিকে স্বীকার করা।"**

একটি বিচারবিভাগ যা ক্রমাগত নিজেকে সংশোধন করে এবং নাগরিকদের নিজের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষিত করে, সেটিই আমাদের সংবিধানের **শক্তিশালী স্তম্ভ** হয়ে থাকবে। একমাত্র উন্মুক্ততা এবং দায়বদ্ধতার মাধ্যমেই জন আস্থা পুনরায় গড়ে তোলা সম্ভব এবং গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করা সম্ভব।

Q. "Suppressing criticism weakens institutions more than it protects them." Evaluate this statement in the context of the judiciary.

2.1.7. যখন প্রধান বিচারপতি সরে দাঁড়ান: বিচারিক প্রত্যাহার এবং স্বার্থের সংঘাত

ভূমিকা

ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ভিত্তি হলো এর **নিরপেক্ষতা** (Impartiality)। সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্ত ২০২৩ সালের 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি) আইন'-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

- **প্রেক্ষাপট:** এই নতুন আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **পদক্ষেপ:** প্রধান বিচারপতি একে একটি সম্ভাব্য **স্বার্থের সংঘাত** (Conflict of Interest) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই মামলাটি এমন একটি বেঞ্চ শুনবে যেখানে ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতি হওয়ার লাইনে থাকা কোনো বিচারক থাকবেন না।
- **গুরুত্ব:** এই ঘটনাটি **বিচারিক নৈতিকতা** (Judicial Ethics), **প্রয়োজনীয়তার নীতি** (Doctrine of Necessity) এবং ভারতে বিচারিক প্রত্যাহারের জন্য একটি স্পষ্ট আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

বিচারিক প্রত্যাহার কী এবং এর আইনি ভিত্তি

বিচারিক প্রত্যাহার (Judicial Recusal) বলতে বোঝায় যখন একজন বিচারক কোনো মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন যাতে পক্ষপাতিত্বের কোনো সম্ভাবনা না থাকে। এটি প্রাকৃতিক ন্যায়ের একটি প্রাচীন নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি: Nemo judex in causa sua — অর্থাৎ, *"কেউ নিজের মামলায় নিজে বিচারক হতে পারবেন না।"*

ভারতীয় আদালতগুলো সময়ের সাথে সাথে কিছু নমনীয় নিয়ম তৈরি করেছে:

- **আর্থিক স্বার্থ** (Pecuniary Interest): *মানক লাল বনাম ড. প্রেম চাঁদ (১৯৫৭)* মামলায় আদালত জানিয়েছিল যে, বিচারকের যদি মামলায় সামান্যতম আর্থিক স্বার্থও থাকে, তবে তিনি বিচার করতে পারবেন না (Automatic Disqualification)।
- **পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা** (Apprehension of Bias): *রঞ্জিত ঠাকুর বনাম ভারত সরকার (১৯৮৭)* মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বাস্তবসম্মত পরীক্ষা নির্ধারণ করে। এতে বলা হয়, যদি একজন সাধারণ মানুষের মনে **পক্ষপাতিত্বের প্রকৃত সম্ভাবনা** (Real likelihood of bias) বা **যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা** তৈরি হয়, তবেই বিচারক সরে দাঁড়াবেন। সামান্য বা কাল্পনিক ভয় প্রত্যাহারের জন্য যথেষ্ট নয়।

মূল বিষয় (Key Point): প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে বিচারকের নিজস্ব **বিবেকের** (Conscience) ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো আইনজীবী বা পক্ষ বিচারককে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারে না। ভারতে এখনো এমন কোনো নির্দিষ্ট **আইন** (Statute) নেই যা প্রত্যাহারের নিয়মগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে।

বৈশ্বিক তুলনা: এর বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্রে Section 455 of Title 28 নামক একটি আইন রয়েছে। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি বিচারকের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো **যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন** (Reasonably questioned) ওঠে, তবে তাকে অবশ্যই নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ নজির এবং প্রয়োজনীয়তার নীতি

বিচারিক প্রত্যাহারের নৈতিকতা এবং **প্রয়োজনীয়তার নীতি** (Doctrine of Necessity)-র মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এই নীতি অনুযায়ী, যদি কোনো বিকল্প আদালত বা বিচারমঞ্চ না থাকে, তবে সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও একজন বিচারককে মামলাটি শুনতে হবে।

১. **এনজেএসি (NJAC) মামলা (২০১৫):** সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হলো *সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত সরকার (২০১৫)* মামলা, যেখানে ২০১৪ সালের **জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (NJAC)** আইনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

- **ঘটনা:** পাঁচ সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মামলাটি শুনেছিল। আইনজীবীরা **বিচারপতি জে.এস. খেহরকে (Justice J.S. Khehar)** সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তিনি ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতি হবেন এবং কোলিজিয়াম ব্যবস্থা বা NJAC—কোনটি চালু থাকবে, তাতে তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ছিল।
- **প্রত্যাখ্যান:** বিচারপতি খেহর সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন এবং দুটি শক্তিশালী কারণ নির্দেশ করেন:
  - **যৌথ স্বার্থ:** বেঞ্চের প্রতিটি বিচারক একই সম্ভাব্য সংঘাতের সম্মুখীন ছিলেন কারণ মামলাটিতে আবেদনকারীরা জিতলে তারা সবাই **কোলিজিয়ামের (Collegium)** অংশ হতেন।
  - **প্রয়োজনীয়তার নীতি:** তিনি এই নীতিটি প্রয়োগ করেন। এই নীতি বলে যে, যখন সমক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো আদালত থাকে না, তখন বিচারকদের মামলাটি শুনতেই হবে—এমনকি সেখানে প্রযুক্তিগত কোনো সংঘাত থাকলেও। অন্যথায়, ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হবে।
- **সিদ্ধান্ত:** তিনি যোগ করেন যে, সরে দাঁড়ানো একটি **"ভুল নজির" (Wrong Precedent)** স্থাপন করবে। অন্যদিকে, **বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ (Justice Kurian Joseph)** তার পৃথক রায়ে বলেন যে, যখন একজন বিচারক নিজেকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাকে তার সাংবিধানিক শপথের অধীনে **স্বচ্ছতার (Transparency)** স্বার্থে কারণগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

বর্তমান প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান নির্বাচন কমিশনার (CEC) নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতির সরে দাঁড়ানো বেশ কিছু ব্যবহারিক এবং সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলেছে:

- **সবার জন্য প্রযোজ্য সংঘাত (Common Conflict):** 'সেকেন্ড জাজেস কেস' (Second Judges Case) দ্বারা নির্ধারিত **জ্যেষ্ঠতার নিয়ম (Seniority Rule)** অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি বিচারকই একদিন প্রধান বিচারপতি হতে পারেন। সুতরাং এই সংঘাত কোনো একজন বিচারকের ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ।
- **প্রধান বিচারপতির আগাম নির্দেশনা (Pre-emptive Direction):** ভবিষ্যৎ বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি হওয়ার লাইনে থাকা বিচারকদের বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে সিজেআই (CJI) এমন বিচারকদের পক্ষপাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যারা এখনও মামলাটি শোনেননি। প্রত্যাহার আসলে একজন বিচারকের **ব্যক্তিগত বিবেকের (Individual Conscience)** বিষয় হওয়া উচিত, **মাস্টার অফ দ্য রোস্টার (Master of the Roster)**-এর নির্দেশ নয়।
- **অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ:** পদত্যাগ, মৃত্যু বা অসুস্থতার কারণে জ্যেষ্ঠতার তালিকা পরিবর্তিত হতে পারে। আজ যাকে "তালিকার বাইরে" বলা হচ্ছে, তিনি কালই প্রধান বিচারপতি হতে পারেন।
- **মাস্টার অফ দ্য রোস্টার ক্ষমতা:** নিজেকে প্রত্যাহার করার পরেও, প্রধান বিচারপতিই ঠিক করেন কোন বেঞ্চ মামলাটি শুনবে। এটি সেই একই **স্বার্থের সংঘাতের (Conflict-of-interest)** সন্দেহ তৈরি করে যা দূর করার জন্য এই প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
- **সুনির্দিষ্ট আইনের অভাব:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতে প্রত্যাহারের কোনো **সংবিধিবদ্ধ নিয়ম (Statutory Law)** বা আইন নেই। সবকিছুই বিচারকের ব্যক্তিগত বোধের ওপর নির্ভর করে।

অতীতের কিছু উদাহরণ

- **প্রত্যাহার করা হয়েছে:** ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত মামলা থেকে **বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জী** এবং **বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস** সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

- **প্রত্যাহার প্রত্যাখ্যান:** ২০২৩ সালে সঞ্জীব ভাট মামলায় **বিচারপতি এম.আর. শাহ** সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে শুধুমাত্র জনগণের দাবি প্রত্যাহারের জন্য যথেষ্ট নয়। **বিচারপতি অরুণ মিশ্রও** তার নিজের দেওয়া রায়ের রিভিউ করার সময় সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছিলেন।
- **অস্পষ্ট আশঙ্কা খারিজ:** *পাঞ্জাব রাজ্য বনাম দেবেন্দর পাল সিং ভুল্লার (২০১১)* মামলায় আদালত রায় দেয় যে, শুধুমাত্র সন্দেহ বা **আবেগপ্রবণ অবিশ্বাস** (Emotional Distrust) প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে না।

বিচারবিভাগ ও জনআস্থার ওপর প্রভাব

বিচারিক প্রত্যাহার (Recusal) যেভাবে পরিচালিত হয়, তার সরাসরি প্রভাব একটি গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের ওপর পড়ে:

- **প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের অবক্ষয়** (Erosion of Institutional Authority): বারবার বা ব্যাখ্যাহীন প্রত্যাহার জনমনে এমন ধারণা তৈরি করতে পারে যে, বিচারবিভাগ **"রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল"** (Politically Sensitive) মামলাগুলো এড়িয়ে যেতে চাইছে।
- **বেঞ্চ হান্টিং** (Bench Hunting): স্পষ্ট নিয়ম না থাকলে, আইনজীবীরা নির্দিষ্ট বিচারকদের ওপর সরে দাঁড়ানোর চাপ দিতে পারেন, যাতে তারা নিজেদের অনুকূলে কোনো বেঞ্চ পেতে পারেন। একে **"ফোরাম শপিং"** (Forum Shopping) বলা হয়।
- **স্বচ্ছতার ঘাটতি** (Transparency Deficit): যখন বিচারকের মৌখিক মন্তব্য পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু লিখিত আদেশে তা উল্লেখ থাকে না, তখন সরকারি নথিতে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। এটি বিচার প্রক্রিয়ার **স্বচ্ছতাকে** (Transparency) ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

দেশ	মেকানিজম বা পদ্ধতি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	Section 455 of Title 28 অনুযায়ী একটি সংবিধিবদ্ধ মানদণ্ড রয়েছে, যেখানে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিচারককে অবশ্যই নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়।
যুক্তরাজ্য	এখানে "Fair-Minded and Informed Observer" (সুচিন্তিত ও সচেতন পর্যবেক্ষক) পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়; যদি এমন কোনো পর্যবেক্ষক পক্ষপাতের সম্ভাবনা দেখেন, তবে প্রত্যাহার বাধ্যতামূলক।
জার্মানি	পক্ষগুলোর **"পক্ষপাতিত্বের ভয়"** (Fear of bias)-এর ভিত্তিতে বিচারককে চ্যালেঞ্জ করার আইনি অধিকার রয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তটি একা ওই বিচারক নন, বরং বেঞ্চের বাকিরা নেন।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: বিচারিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

বিচারিক প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াকে **'ব্যক্তিগত পছন্দ'** থেকে **'প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতায়'** রূপান্তর করতে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি অত্যন্ত জরুরি:

- **১. সুনির্দিষ্ট আইন বা নির্দেশিকা প্রণয়ন** (Codification of Rules): ভারতের উচিত একটি নির্দিষ্ট **সংবিধিবদ্ধ আইন** (Statutory Law) অথবা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে একটি **বাধ্যতামূলক আচরণবিধি** (Binding Code of Conduct) তৈরি করা। যেখানে আর্থিক স্বার্থ, পারিবারিক সম্পর্ক বা পূর্ববর্তী পেশাগত সংশ্লিষ্টতার মতো **বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি** (Objective Grounds) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
- **২. কারণ দর্শানো বাধ্যতামূলক করা** (Mandatory Reasoned Orders): বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফের মতানুসারে, একজন বিচারক কেন সরে দাঁড়াচ্ছেন (বা কেন সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করছেন), তার একটি **সংক্ষিপ্ত লিখিত কারণ** (Written Reasons) থাকা উচিত। এটি বিচারব্যবস্থায় **স্বচ্ছতা** (Transparency) নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি **নজির** (Precedent) তৈরি করবে।

- **৩. আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য পৃথক ব্যবস্থা (Protocol for Challenges):** পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট বিচারক নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটি **অভ্যন্তরীণ কমিটি (Internal Committee)** বা অন্য জ্যেষ্ঠ বিচারকদের মাধ্যমে সেই আবেদনটি নিষ্পত্তি করা উচিত। এটি **'Nemo judex in causa sua'** (কেউ নিজের মামলায় বিচারক হতে পারবেন না) নীতিটিকে আরও শক্তিশালী করবে।
- **৪. আগাম ঘোষণা বা ডিসক্লোজার নর্মস (Proactive Disclosure Norms):** মামলা শুরুর আগেই বিচারকদের উচিত তাদের কোনো সম্ভাব্য স্বার্থ (আর্থিক বা ব্যক্তিগত) থাকলে তা **স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ (Proactive Disclosure)** করা। এতে মাঝপথে মামলা থমকে যাওয়ার ভয় থাকে না এবং আদালতের **মর্যাদা (Integrity)** বৃদ্ধি পায়।
- **৫. মাস্টার অফ দ্য রোস্টার ক্ষমতার নিরপেক্ষতা (Neutrality in Roster Power):** যখন খোদ প্রধান বিচারপতি (CJI) কোনো মামলা থেকে সরে দাঁড়ান, তখন নতুন বেঞ্চ গঠনের দায়িত্ব পরবর্তী **জ্যেষ্ঠতম অ-সংঘাতপূর্ণ বিচারকের (Senior-most Non-conflicted Judge)** হাতে থাকা উচিত অথবা একটি **স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড সিস্টেম** ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

"ন্যায়বিচার কেবল করলেই হবে না, তা যেন সঠিক মনে হয়" (Justice must not only be done but also be seen to be done)—এই নীতিটিই বিচারবিভাগের বৈধতার ভিত্তি। যদিও সাম্প্রতিক প্রত্যাহারগুলো উচ্চমানের **ব্যক্তিগত নৈতিকতা** প্রদর্শন করে, তবুও তা একটি **কাঠামোগত শূন্যতাকে** স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সুপ্রিম কোর্টের **অখণ্ডতা** রক্ষা করতে এবং ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত বিবেকের উর্ধ্বে উঠে একটি **নীতিভিত্তিক ও স্বচ্ছ কাঠামো** গ্রহণ করা অপরিহার্য।

Q. "Judicial recusal in India is guided more by personal discretion than institutional rules." Critically examine.

2.1.8. স্বাধীনতা থেকে বাধ্যবাধকতা? বাধ্যতামূলক ভোটদান নিয়ে বিতর্ক।

ভূমিকা

২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠেয় **বিধানসভা নির্বাচন** এবং **ভারতের সুপ্রিম কোর্টের** কিছু পর্যবেক্ষণ 'বাধ্যতামূলক ভোটদান' (Compulsory Voting) নিয়ে বিতর্ককে পুনরায় উস্কে দিয়েছে। যদিও ভোটারদের কম উপস্থিতি একটি উদ্বেগের বিষয়, তবে মূল প্রশ্ন হলো—বাধ্যতামূলক ভোটদান কি সাংবিধানিক দিক থেকে বৈধ এবং ব্যবহারিকভাবে সম্ভব?

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারত **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে** স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকে মূল্য দেয়। এখানেই মূল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে—অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নাকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা?

ভারতে ভোটদানের সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

১. **সাংবিধানিক ভিত্তি**

- **অনুচ্ছেদ ৩২৬:** এটি **সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের** ব্যবস্থা করে, যা নিশ্চিত করে যে ১৮ বছরের উপরে প্রতিটি নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে।
- এটি ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।
- তবে, এই অধিকার কিছু **শর্তসাপেক্ষ** (যেমন—বিকৃত মস্তিষ্ক, অপরাধ বা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা)।

২. **সংবিধিবদ্ধ বিধান (Statutory Provisions)**

- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ (ধারা ১৯):** ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে ১৮+ বছর বয়সী এবং একটি নির্বাচনী এলাকার সাধারণ বাসিন্দা হতে হবে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ (ধারা ৬২):** যারা ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত, তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করে।

৩. **ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রকৃতি**

- সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে, **ভোট দেওয়ার অধিকার একটি সংবিধিবদ্ধ (Statutory) অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়।**
- তবে, ভোটদানের কিছু উপাদান—যেমন প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার অধিকার এবং **নোটা (NOTA)**-এর অধিকার—**অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)** এর অধীনে **প্রকাশের স্বাধীনতার** সাথে যুক্ত।

মূল তথ্য

- **ক্রমবর্ধমান কিন্তু অসম্পূর্ণ অংশগ্রহণ:** ভোটার উপস্থিতি ২০০৯ সালে **৫৮.২%** থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে **৬৭.৪%** হয়েছে, তবুও এখনও **৩০%** এর বেশি ভোটার ভোটদান থেকে বিরত থাকেন।
- **রাজ্য বনাম জাতীয় পার্থক্য:** লোকসভার তুলনায় বিধানসভা নির্বাচনে উপস্থিতি বেশি হয় (**৭০-৮০%**), তবে **শহরাঞ্চল** পিছিয়ে আছে (**৫০-৬০%**)।
- **সামাজিক ধরন:** গ্রামীণ উপস্থিতি (**৬৫-৮০%**) শহরের তুলনায় বেশি, যা শহরের মানুষের উদাসীনতা বনাম গ্রামীণ সচেতনতাকে তুলে ধরে।
- **অন্তর্ভুক্তির ধারা:** বর্তমানে নারীদের উপস্থিতির হার পুরুষদের সমান বা তার চেয়েও বেশি, কিন্তু **তরুণদের অংশগ্রহণ** এখনও অসংলগ্ন।

বাধ্যতামূলক ভোটদানের ধারণা এবং বৈশ্বিক অনুশীলন

বাধ্যতামূলক ভোটদান বলতে যোগ্য নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার একটি আইনি বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়, যা প্রায়শই জরিমানার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়।

- **অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং পেরুর** মতো দেশে বাধ্যতামূলক ভোটদান চালু আছে।
- **কার্যকর করার পদ্ধতিসমূহ:**
  - আর্থিক জরিমানা (অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল)
  - সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা (পেরু)
- এই দেশগুলোতে সাধারণত ভোটার উপস্থিতির হার অনেক বেশি থাকে।

বাধ্যতামূলক ভোটদানের পক্ষে যুক্তি

১. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

- এটি উচ্চ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করে, যা নির্বাচিত সরকারের বৈধতাকে শক্তিশালী করে।
- **ল কমিশন (২৫৫তম প্রতিবেদন, ২০১৫)** উল্লেখ করেছে যে, যেসব দেশে বাধ্যতামূলক ভোটদান আছে, সেখানে উপস্থিতির হার **~৭% বৃদ্ধি** পেয়েছে।

২. **নির্বাচনী বিকৃতি কমানো**

- এটি এমন পরিস্থিতি রোধ করে যেখানে প্রার্থীরা মোট ভোটের খুব কম শতাংশ পেয়েই জিতে যান। এটি আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক ফলাফল নিশ্চিত করে।

৩. **নাগরিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি**

- ভোটদানকে কর প্রদানের মতোই একটি **নাগরিক কর্তব্য** হিসেবে দেখা হয়। এটি রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করে।

বাধ্যতামূলক ভোটদানের বিপক্ষে যুক্তি

১. **মৌলিক স্বাধীনতার লঙ্ঘন**

- বাধ্যতামূলক ভোটদান **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)** এর অধীনে প্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে পারে। ভোট দেওয়ার অধিকারের মধ্যে **ভোট না দেওয়ার অধিকারও** অন্তর্ভুক্ত।

২. **ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ** ভারতের বিশাল আকার এবং বৈচিত্র্য গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে:

- **জনসংখ্যার বিশালত্ব:** ৯০ কোটিরও বেশি ভোটার।
- **প্রশাসনিক বোঝা:** আইন মেনে চলা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা অবাস্তব।
- **কার্যকর করার সমস্যা:** যারা ভোট দেননি তাদের চিহ্নিত করা এবং জরিমানা করা অত্যন্ত জটিল কাজ।

৩. **কঠোর এবং অসম জরিমানা** জরিমানা বা পরিষেবা অস্বীকার করা নিম্নোক্তদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে:

- **দরিদ্র ও প্রান্তিক সম্প্রদায়**
- **পরিযায়ী শ্রমিক**
- এটি একটি **জবরদস্তিমূলক গণতন্ত্রের** দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

৪. **তথ্যহীন ভোটদানের ঝুঁকি** জোরপূর্বক অংশগ্রহণের ফলে হতে পারে:

- এলোমেলো বা অসচেতনভাবে ভোটদান।
- অবৈধ ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি। এটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানকে কমিয়ে দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত

১. **দিনেশ গোস্বামী কমিটি (১৯৯০)**

- বাধ্যতামূলক ভোটদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। পরিবর্তে **ভোটার সচেতনতা এবং সুযোগ-সুবিধা** বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে।

২. **ভারতের ল কমিশন (২৫৫তম প্রতিবেদন, ২০১৫)**

- এটি স্বীকার করেছে যে বাধ্যতামূলক ভোটদানের দেশে উপস্থিতি বেশি থাকে। তবে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে:
  - এটি ভারতে **সম্ভব বা কাম্য কোনটিই নয়।**
  - গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য জোরজবরদস্তি উপযুক্ত নয়।

বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

গণতন্ত্র কেবল অংশগ্রহণের ওপর নয়, বরং **স্বেচ্ছায় ও সচেতন অংশগ্রহণের** ওপর টিকে থাকে। বাধ্যতামূলক ভোটদান ফোকাসটিকে **'স্বাধীনতা' থেকে 'বাধ্যবাধকতা'র** দিকে সরিয়ে দেয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিপক্কতা নিহিত থাকে:

- সচেতনতা বৃদ্ধিতে
- স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততায়
- প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থায়

ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শ **পছন্দ (Choice)** করার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, **জবরদস্তি (Coercion)** নয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: জোরজবরদস্তি ছাড়াই ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি

ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে হবে নাগরিকদের **সক্ষম এবং উৎসাহিত** করার ওপর ভিত্তি করে, জোরজবরদস্তির ওপর নয়। মূল গুরুত্ব দিতে হবে **আচরণগত পরিবর্তন**, **প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা** এবং **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের** ওপর, যাতে ভোটদান একটি সচেতন নাগরিক পছন্দে পরিণত হয়।

১. **ভোটার সচেতনতা শক্তিশালী করা**
   - SVEEP (সুইপ) কর্মসূচির পরিধি বাড়ানো এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ইনফ্লুয়েন্সার ও কমিউনিটি আউটরিচ ব্যবহার করা।
   - দীর্ঘমেয়াদী অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে **শহরের উদাসীনতা** এবং **প্রথমবার ভোটদানকারীদের** লক্ষ্য করে বিশেষ প্রচারণা চালানো।

২. **পরিযায়ী ও শহরের ভোটারদের সুবিধা প্রদান**
   - ভোটের দিন **বেতনসহ ছুটি** নিশ্চিত করা।
   - বিশেষ **পরিবহন ব্যবস্থা** (বাস/ট্রেন) প্রদান করা।
   - নমনীয় বা **মাল্টি-লোকেশন ভোটার রেজিস্ট্রেশন** ব্যবস্থার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

৩. **প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার**
   - সুরক্ষিত **রিমোট ভোটিং** (দূরবর্তী ভোটদান) সিস্টেম তৈরি করা।
   - নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক ঐকমত্য বজায় রেখে **ব্লকচেইন-ভিত্তিক ভোটিং** ব্যবস্থার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা।

৪. **সহজলভ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি**
   - **ভোট কেন্দ্রের** সংখ্যা এবং সেখানে পৌঁছানোর সুবিধা বাড়ানো।
   - **পোস্টাল ব্যালটের** পরিধি বাড়ানো এবং যোগ্য গোষ্ঠীগুলোর জন্য **আগাম ভোটদানের (Early Voting)** ব্যবস্থা চালু করা।

৫. **ইতিবাচক উৎসাহ প্রদান**
   - জরিমানার পরিবর্তে **স্বীকৃতি, নাগরিক পুরস্কার এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা** ব্যবহার করা।
   - ভোটদানকে একটি **জাতীয় কর্তব্য এবং নাগরিক গর্ব** হিসেবে প্রচার করা।

৬. **নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর আস্থা বৃদ্ধি**
   - নির্বাচনী অনিয়ম এবং ভুল তথ্য (Misinformation) মোকাবিলা করা।
   - EVM-VVPAT ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

উপসংহার

বাধ্যতামূলক ভোটদান হয়তো ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে পারে, কিন্তু দিনেশ গোস্বামী কমিটি এবং ল কমিশনের মতে এটি ভারতে মারাত্মক **সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং নৈতিক চ্যালেঞ্জ** তৈরি করবে। মূল সমস্যাটি প্রয়োগ বা বলপ্রয়োগ নয়, বরং নাগরিকদের **অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা**। গণতন্ত্রের বৈধতা আসে মুক্ত, সচেতন এবং স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ থেকে, নিছক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নয়। তাই ভারতকে **জোরজবরদস্তি থেকে বিশ্বাসের (Compulsion to Conviction)** দিকে এগিয়ে যেতে হবে—সচেতনতা, সহজলভ্যতা এবং আস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে।

Q. Critically evaluate the feasibility and desirability of introducing compulsory voting in India in light of constitutional provisions and expert committee recommendations.

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতি

ভূমিকা

জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, প্রবাসী ভারতীয় এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে ভারতের বিদেশ নীতিতে **পশ্চিম এশিয়া** (মধ্যপ্রাচ্য) অন্যতম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ভারত পশ্চিম এশিয়াকে তার **"সম্প্রসারিত প্রতিবেশী"** (Extended Neighbourhood) হিসেবে বিবেচনা করে। ভারত এখন এই অঞ্চলে কেবল নিষ্ক্রিয় কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়, বরং অত্যন্ত **সক্রিয় কৌশলগত সম্পৃক্ততার** দিকে এগিয়ে গেছে।

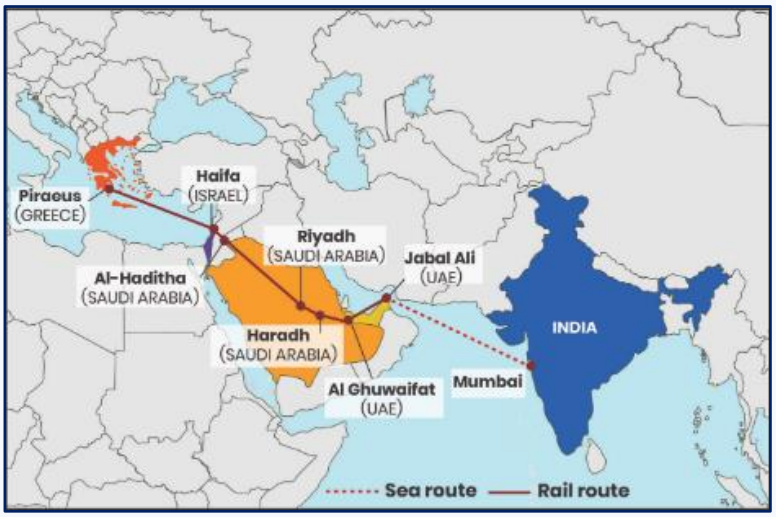

পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে

পশ্চিম এশিয়া বলতে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মাঝে অবস্থিত অঞ্চলটিকে বোঝায়, যাকে প্রায়ই **মধ্যপ্রাচ্য** বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে **আরব বিশ্ব**, **ইসরায়েল**, **ইরান** এবং **তুরস্কের** মতো দেশগুলো।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির মূল উপাদানসমূহ

১. **"ডি-হাইফেনেশন" (De-Hyphenation) কৌশল**

ভারত সফলভাবে প্রথাগত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সাথে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আলাদা করতে পেরেছে। ভারত একদিকে **ইসরায়েলের** সাথে **"বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব"** (প্রতিরক্ষা ও উচ্চ-প্রযুক্তির দিকে নজর দিয়ে) বজায় রাখছে, আবার একই সাথে কৌশলগত সংযোগের জন্য **ইরানের অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পরিষদের** সাথেও যোগাযোগ রাখছে। এটি ভারতকে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পক্ষ না নিয়ে নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তা ২.০: রূপান্তর এবং বাফারিং**

বর্তমানে ভারতের অপরিশোধিত তেলের প্রায় **৫৫%** উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এলেও, ভারতের পরিকল্পনা এখন আধুনিক হয়েছে:

- **কৌশলগত মজুদ (Strategic Reserves):** হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতার মতো সংকট মোকাবিলায় ভারত তার **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) দ্রুত সম্প্রসারণ করছে যাতে অন্তত ৯০ দিনের জরুরি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।
- **সবুজ শক্তি (Green Energy):** জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এবং সৌদি আরবের সাথে **গ্রিন হাইড্রোজেন** এবং সৌর শক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে।

৩. **সামুদ্রিক পথে "নিট নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)**

২০২৬ সালের সংঘাত যখন হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগরের বাণিজ্য পথকে হুমকির মুখে ফেলেছে, তখন ভারত **'অপারেশন সংকল্প'** (Operation Sankalp) শুরু করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনী এখন এই অঞ্চলে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে কাজ করছে এবং বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে নিয়মিত পাহারা দিচ্ছে যাতে জলদস্যু বা অন্য কোনো হামলা থেকে বাণিজ্য পথ রক্ষা করা যায়।

৪. **সংযোগ: "দুই-প্রবেশদ্বার" পদ্ধতি**

প্রথাগত রুটের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত দুটি আলাদা করিডোর বা পথ তৈরির চেষ্টা করছে:

- **IMEC (ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর):** উপসাগরীয় দেশ (UAE/সৌদি) এবং ইসরায়েলকে ব্যবহার করে ইউরোপের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- **INSTC এবং চাবাহার:** ইরানের **চাবাহার বন্দরকে** মধ্য এশিয়া এবং রাশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে পাকিস্তানের ওপর নির্ভর না করেই স্থলপথে বাণিজ্য বজায় রাখা যায়।

৫. প্রবাসী কল্যাণ ও "রেমিট্যান্স কূটনীতি"

উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসকারী **৯০ লক্ষের বেশি ভারতীয়র** নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে:

- **সংকট মোকাবিলা:** জরুরি ভিত্তিতে নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা রাখা (যেমন ২০২৬ সালের মন্ত্রিপরিষদ কমিটি)।
- **অর্থনৈতিক সুরক্ষা:** ভারতীয় কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সাথে **মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ** চুক্তি স্বাক্ষর করা।

৬. বহুপাক্ষিক এবং "মিনি-ল্যাটারাল" অংশগ্রহণ

ভারত আঞ্চলিক কাঠামোতে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে বিভিন্ন নতুন জোট ব্যবহার করছে:

- **I2U2 (ভারত, ইসরায়েল, UAE, USA):** খাদ্য নিরাপত্তা, পানি এবং মহাকাশ গবেষণার মতো যৌথ প্রকল্পগুলোতে নজর দেওয়া।
- **BRICS+ অংশগ্রহণ:** ব্রিকস-এ সৌদি আরব, ইরান এবং আমিরাতের অন্তর্ভুক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী আর্থিক কাঠামো এবং **"রুপি-বাণিজ্য"** (Rupee-Trade) চালুর চেষ্টা করা।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির সুবিধাসমূহ

১. জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতা ও দামের স্থায়িত্ব

সৌদি আরব এবং আমিরাতের মতো বড় উৎপাদকদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে ভারত **অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি ব্যবহারের** সুবিধা পায়। এই অংশীদারিত্ব ভারতের অভ্যন্তরে **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR)** তৈরিতেও সাহায্য করে, যার কিছু অংশ উপসাগরীয় বিনিয়োগ থেকে আসে।

২. কৌশলগত "সেতুবন্ধন" ক্ষমতা

ভারত বিশ্বের সেই অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যারা একই সাথে **ইসরায়েল, ইরান এবং আরব দেশগুলোর** সাথে কথা বলতে পারে। এই **"কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন"** ভারতকে সাহায্য করে:

- আঞ্চলিক সংকটে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে।
- কোনো গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে।
- ইসরায়েলের সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বজায় রেখেও ইরানের **চাবাহার বন্দরের** মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে।

৩. অর্থনৈতিক লাভ: রেমিট্যান্স এবং বিনিয়োগ

- **রেমিট্যান্স:** প্রবাসী ভারতীয়রা প্রতি বছর প্রায় **১২০ বিলিয়ন ডলার** দেশে পাঠান (২০২৫-২৬ এর হিসেব অনুযায়ী), যা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটাতে বড় ভূমিকা রাখে।
- **বিনিয়োগ:** সংযুক্ত আরব আমিরাতের ADIA এবং সৌদি আরবের PIF-এর মতো বড় বড় তহবিল এখন ভারতের অবকাঠামো, সবুজ শক্তি এবং ডিজিটাল স্টার্টআপগুলোতে বিশাল বিনিয়োগ করছে।

৪. **চীনের "স্ট্রিং অফ পার্লস" মোকাবিলা**

সক্রিয় পশ্চিম এশিয়া নীতি এই অঞ্চলকে চীনের একক প্রভাবে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। IMEC-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর একটি স্বচ্ছ এবং ঋণমুক্ত বিকল্প তৈরি করছে, যা ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে ভারসাম্য বজায় রাখে।

৫. **উন্নত সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

অপারেশন সংকল্প এবং যৌথ নৌ-মহড়ার মাধ্যমে ভারত ওমানের **ডুকম (Duqm)** এর মতো জায়গায় লজিস্টিক সুবিধা পেয়েছে। এটি উত্তর আরব সাগরে জলদস্যু বা ড্রোন হামলা থেকে বাণিজ্য পথ রক্ষা করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

৬. **খাদ্য ও প্রযুক্তি নিরাপত্তা**

I2U2 গ্রুপের মাধ্যমে ভারত নিচের সুবিধাগুলো পাচ্ছে:

- **ইসরায়েলি প্রযুক্তি:** শুষ্ক জমিতে চাষাবাদ এবং পানি পুনর্ব্যবহারের জন্য।
- **সংযুক্ত আরব আমিরাতের মূলধন:** ভারতে **'ফুড পার্ক'** বা খাদ্য উদ্যান তৈরির জন্য।
- **ফলাফল:** এটি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং একই সাথে ভারতীয় কৃষকদের আয় ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতির চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"চোকপয়েন্ট" বা কৌশলগত পথের পক্ষাঘাত:** ভারতের মোট আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের **৪০-৫০%** এবং এলপিজি (LPG)-এর প্রায় **৯০% হরমুজ প্রণালীর** মধ্য দিয়ে আসে। বর্তমান নৌ-অবরোধ এবং ইরান কর্তৃক এই জলপথ বন্ধের হুমকির ফলে ভারত এক অস্তিত্ব রক্ষা করার মতো জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছে।

২. **সংকটের মুখে সংযোগ ব্যবস্থা (IMEC বনাম বাস্তবতা):** ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) মধ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে **ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর (IMEC)** বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। IMEC-এর এই ব্যর্থতা ভারতকে পুনরায় **সুয়েজ খাল** (যেখানে হুথি হামলার ভয় রয়েছে) অথবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল **কেপ অফ গুড হোপ** রুটের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করছে।

৩. **প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে সংকট (The Diaspora Dilemma):** উপসাগরীয় দেশগুলোতে প্রায় **১০ মিলিয়ন (১ কোটি)** ভারতীয় বসবাস করেন, যার ফলে যেকোনো বড় আঞ্চলিক যুদ্ধ ভারতের জন্য একটি লজিস্টিক দুঃস্বপ্ন।

- **উদ্ধার অভিযান:** ২০২৬ সালের মার্চের শুরুতে ৫২,০০০-এর বেশি ভারতীয়কে সরিয়ে নেওয়া হলেও, একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু হলে তা সামলাতে **'অপারেশন রাহাত'**-এর চেয়েও বড় কোনো অভিযানের প্রয়োজন হবে।
- **অর্থনৈতিক ধাক্কা:** উপসাগরীয় দেশগুলোতে উৎপাদন কমলে বছরে **১২০ বিলিয়ন ডলারের** বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

৪. **আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থিক চাপ:** ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেলে **১০০-১২০ ডলারে** পৌঁছানোর ফলে ভারতে "কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন" বা উৎপাদন ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে।

- **সার সংকট:** ভারত তার ইউরিয়া এবং NPK সারের ৪০% উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করে। এই সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় সরকারের ভর্তুকির বোঝা বাড়ছে এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে।
- **টাকার মানের ওপর চাপ:** আমদানি বিল বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় রুপির মান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে (উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে প্রতি ডলারের বিপরীতে টাকার মান **৯২-৯৫ টাকা** হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে)।

৫. **চীনের "মধ্যস্থতা" কূটনীতি:** চীন বর্তমানে নিজেকে এই অঞ্চলের প্রধান "শান্তি স্থাপনকারী" হিসেবে তুলে ধরছে (যেমন: সৌদি-ইরান চুক্তি)। একই সাথে বেইজিং তার **'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)** প্রকল্পের মাধ্যমে গোয়াদর এবং জেবেল আলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে।

৬. **ডি-হাইফেনেশন (De-hyphenation) বা ভারসাম্য রক্ষার চাপ: ইসরায়েলের** সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি বজায় রাখা এবং একই সাথে (চাবাহার বন্দরের স্বার্থে) **ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিলের** সাথে সুসম্পর্ক রাখা ক্রমাগত কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারত তার এই "কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন" বা নিরপেক্ষ অবস্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ সমালোচনা এবং আমেরিকা-নেতৃত্বাধীন দেশগুলোর চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) শক্তিশালী করা:** ভারতকে তার SPR প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে যাতে অন্তত **৯০ দিনের জ্বালানি মজুদ** নিশ্চিত করা যায়। এই রিজার্ভগুলোতে সৌদি আরামকো এবং আমিরাতের আদনক (ADNOC)-এর মতো কোম্পানিকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার সাথে যুক্ত থাকে।

২. **বিকল্প সংযোগ ব্যবস্থা সচল করা:** IMEC স্থবির হয়ে পড়ায় ভারতকে **চাবাহার বন্দরের** মাধ্যমে **ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর (INSTC)**-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই "মধ্য করিডোর" শক্তিশালী করলে তা লোহিত সাগরের সংকটের বিপরীতে একটি ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সাথে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য নিশ্চিত করবে।

৩. **"রুপি-ট্রেড" বা টাকায় বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করা:** ডলারের ওপর চাপ (₹৯২-৯৫/$) এবং সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় ভারতকে **লোকাল কারেন্সি সেটেলমেন্ট (LCS)** বা স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন ব্যবস্থা আরও প্রাতিষ্ঠানিক করতে হবে।

৪. **জ্বালানি ২.০ (গ্রিন হাইড্রোজেন) দিকে রূপান্তর:** ভারতকে তেলের "ক্রেতা" থেকে সরে এসে **গ্রিন হাইড্রোজেনের "অংশীদার"** হতে হবে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সস্তা সৌর শক্তি ব্যবহার করে যৌথভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকাঠামো তৈরি করলে ভারত তার "নেট-জিরো" লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে এবং আমদানির আর্থিক চাপও কমবে।

৫. **বহুপাক্ষিক "নিরাপত্তা কাঠামো":** I2U2 এবং BRICS+ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভারত উত্তর আরব সাগরে একটি "কোড অফ কন্ডাক্ট" বা আচরণবিধির প্রস্তাব দিতে পারে। এটি ভারতকে এই অঞ্চলের প্রধান নিরাপত্তা প্রদানকারী এবং আমেরিকা-ইসরায়েল অক্ষ ও ইরানের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

উপসংহার

ভারতকে একটি সাধারণ "ক্রেতা-বিক্রেতা" সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে **"কৌশলগত অংশীদার" (Strategic Stakeholder)** হতে হবে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি ও সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য IMEC এবং **গ্রিন হাইড্রোজেন** প্রকল্পগুলোকে হাতিয়ার করে এই অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করতে হবে।

Q. The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian Countries.

2.2.2. ভারতের প্রতিবেশী নীতি

ধারণা এবং মূল দর্শন

'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি (NFP) হলো ভারতের বিদেশ নীতির প্রধান ভিত্তি। ভারতের সমৃদ্ধি তার প্রতিবেশীদের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এই বিশ্বাস থেকেই এই নীতির জন্ম।

- **নীতিসমূহ (৫-এস কাঠামো): সম্মান** (Respect), **সংবাদ** (Dialogue), **শান্তি** (Peace), **সমৃদ্ধি** (Prosperity), এবং **সংস্কৃতি** (Culture)।

- **দৃষ্টিভঙ্গি:** এটি "দাদাগিরি" বা বড় ভাইয়ের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে একটি **পারস্পরিক সহযোগিতামূলক**, **পরামর্শমূলক** এবং **ফলাফল-মুখী** অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে (যা গুজরাল ডকট্রিন দ্বারা অনুপ্রাণিত)।
- **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** সার্ক (SAARC)-এর স্থবিরতার বিকল্প হিসেবে **বিবিআইএন** (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল) এবং **বিমসটেক** (BIMSTEC)-এর মতো উপ-আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেশীর পরিধি

১. **নিকটতম প্রতিবেশী**

- **স্থলপথের প্রতিবেশী:** আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার।
- **জলপথের প্রতিবেশী:** শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ।

২. **বর্ধিত প্রতিবেশী**

- **অ্যাক্ট ইস্ট লিঙ্ক:** থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন (বিমসটেক এবং আসিয়ান-এর মাধ্যমে)।
- **মধ্য এশিয়ার সাথে সংযোগ:** কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান।
- **পশ্চিম এশিয়া/মধ্যপ্রাচ্য:** সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), সৌদি আরব, ওমান, কাতার এবং ইরান (জ্বালানি নিরাপত্তা এবং IMEC করিডোরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)।

৩. **কৌশলগত ক্ষেত্র (IOR এবং SAGAR)**

এটি মূলত **ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (IOR)** দ্বীপ রাষ্ট্র এবং উপকূলীয় দেশগুলোর ওপর নজর দেয়, যেখানে ভারত একজন **"নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)** হিসেবে কাজ করে।

- **দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ:** মরিশাস, সেশেলস, কমোরোস, মাদাগাস্কার এবং রিইউনিয়ন আইল্যান্ড (ফরাসি অঞ্চল)।
- **উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ:** মোজাম্বিক, তানজানিয়া, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (পশ্চিম ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল)।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

- **আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা:** অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **আফগানিস্তান, পাকিস্তান** এবং **মিয়ানমার** থেকে আসা আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্রবাদের বিস্তার রোধ করা।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** আঞ্চলিক নেতৃত্ব বজায় রাখতে **শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ** এবং **নেপালে** চীনের "স্ট্রিং অফ পার্লস" এবং বিআরআই (BRI) প্রকল্পের প্রভাব মোকাবিলা করা।
- **অর্থনৈতিক একীকরণ:** যৌথ সমৃদ্ধির জন্য **বাংলাদেশ, ভুটান** এবং **নেপালে** বিবিআইএন (BBIN) এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে ভৌত ও ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানো।
- **নিরাপত্তা প্রদানকারী: সাগর (SAGAR)** ভিশনের অধীনে **মরিশাস, সেশেলস** এবং **মালদ্বীপে** সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় (HADR) নেতৃত্ব দেওয়া।
- **সাংস্কৃতিক নরম শক্তি (Soft Power): নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ** এবং **শ্রীলঙ্কার** সাথে অভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাগত ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে আস্থার সংকট দূর করা।

'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. **সংযোগ: ভৌত এবং ডিজিটাল**

- **অবকাঠামো:** উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য **কালাদান প্রকল্প** (মিয়ানমার) এবং **আগরতলা-আখাউড়া রেল** সংযোগের (বাংলাদেশ) মতো "মাল্টিমোডাল ট্রানজিট"-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

- **ডিজিটাল:** একটি আঞ্চলিক ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তুলতে **ভুটান, নেপাল** এবং **শ্রীলঙ্কার** মতো দেশে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি যেমন UPI এবং RuPay কার্ড চালু করা।

২. **অর্থনৈতিক একীকরণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা**

- **বাণিজ্যিক সুবিধা:** ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের জন্য ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা দেওয়া (যা **গুজরাল ডকট্রিন**-এর অধীনে একতরফা সুবিধা হিসেবে পরিচিত)।
- **জ্বালানি গ্রিড:** একটি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাজার তৈরির লক্ষ্যে **ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ** ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের (২০২৪-২০২৬) মতো ঐতিহাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩. **কৌশলগত এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

- **নিরাপত্তা প্রদানকারী: সাগর (SAGAR)** ভিশনের আওতায় সামুদ্রিক পাহারা এবং জলদস্যুতা বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া।
- **কৌশলগত ভারসাম্য:** দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং **মালদ্বীপ** ও **শ্রীলঙ্কার** সাথে মুদ্রা বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে চীনের বিআরআই (BRI) প্রভাব মোকাবিলা করা।

৪. **মানবিক এবং সংকটে প্রথম সাড়াদানকারী**

- **দুর্যোগ মোকাবিলা:** যেকোনো সংকটে সবার আগে এগিয়ে আসা, যেমন **নেপালের ভূমিকম্প** বা **শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটে** ৪ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান।
- **স্বাস্থ্য কূটনীতি:** মহামারীর সময় **ভ্যাকসিন মৈত্রী** (Vaccine Maitri)-র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।

৫. **সাংস্কৃতিক সংযোগ**

- **অভিন্ন ঐতিহ্য:** প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে **বৌদ্ধ সার্কিট** (নেপাল/ভুটান) এবং **রামায়ণ সার্কিট** (শ্রীলঙ্কা) প্রচার করা।
- **জনগণের সাথে যোগাযোগ:** দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্র ও পেশাজীবীদের জন্য আইটেক (ITEC) প্রোগ্রাম এবং বৃত্তির সুবিধা বাড়ানো।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

আঞ্চলিক কূটনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে:

- **রাজনৈতিক পরিবর্তন: বাংলাদেশ** এবং **নেপালে** সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর ভারত "প্যালেস ডিপ্লোম্যাসি" (নির্দিষ্ট নেতাদের ওপর নির্ভরশীলতা) থেকে সরে এসে **"পিপল ডিপ্লোম্যাসি"** বা জনগণের সাথে সংযোগের নীতি গ্রহণ করছে। এর ফলে নতুন যুব আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ বাড়ছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব:** আজকের সম্পাদকীয়গুলোতে উঠে এসেছে যে, পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ভারতকে তার সামুদ্রিক অঞ্চল সুরক্ষিত করতে বাধ্য করছে। এর লক্ষ্য হলো জ্বালানি করিডোর এবং IMEC (ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর) রক্ষা করা।
- **জলবায়ু ও স্বাস্থ্য কূটনীতি:** যৌথ দুর্যোগ ত্রাণ (HADR) এবং ডিজিটাল গভর্ন্যান্স টুলস (ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম) শেয়ার করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা তৈরির একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **জ্বালানি অনিরাপত্তা: হরমুজ প্রণালী** (যা আজ মূলত বন্ধ) এলাকায় অস্থিরতার কারণে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল **১০০ ডলার** ছাড়িয়ে গেছে। এটি ভারত এবং তার প্রতিবেশী (বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা) দেশগুলোর অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে, যারা এখন জ্বালানি সহায়তার জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।

- **প্রবাসী ভারতীয়দের ঝুঁকি:** উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসরত প্রায় **২.৫ কোটি দক্ষিণ এশীয়** (যার মধ্যে ১ কোটি ভারতীয়) এই যুদ্ধের কারণে সরাসরি হুমকির মুখে। সম্প্রতি **আবুধাবিতে** ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু এবং উদ্ধার অভিযানগুলো এই বিশাল মানবিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তার পরীক্ষা:** ভারত মহাসাগরে (যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজিরাহ-র কাছে) বাণিজ্যিক জাহাজে ক্রমবর্ধমান হামলা ভারতের **"নিরাপত্তা প্রদানকারী" (Net Security Provider)** ইমেজকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ পাহারার কাজে (অপারেশন সংকল্প) বড় সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে।
- **কূটনৈতিক ভারসাম্য (আস্থার অভাব):** পশ্চিম এশিয়া ইস্যুতে **বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা** অনেক বেশি সরব অবস্থান নিয়েছে। ভারতের অবস্থান পশ্চিমী বা ইসরায়েলঘেঁষা বলে মনে হওয়ায় প্রতিবেশীদের কাছে ভারতের "গ্রহণযোগ্যতা" কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়ছে।
- **যোগাযোগে বাধা:** পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের ফলে IMEC করিডোরের কাজ থমকে গেছে। এর ফলে ভারত এখন ইরান ও চাবাহারের মাধ্যমে INSTC রুটে জোর দিতে বাধ্য হচ্ছে, যা নিজেও বিভিন্ন হামলার কারণে জটিল অবস্থায় রয়েছে।
- **চীনের প্রভাব:** ভারত যখন পশ্চিম এশিয়ার সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত, তখন **চীন** দ্রুত এবং রাজনৈতিক শর্তহীন অবকাঠামো অর্থায়নের প্রস্তাব দিচ্ছে। এটি জ্বালানি সংকটে ভোগা প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।
- **আফগানিস্তান-পাকিস্তান মৌলবাদ:** আজ **আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলার** (কাবুলের হাসপাতালে) খবর এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান উগ্রবাদ এবং সীমান্ত যুদ্ধের সংকেত দিচ্ছে, যা ভারতের পশ্চিম সীমান্তকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথচলা

- **"জনগণের কূটনীতিতে" গুরুত্ব:** নির্দিষ্ট নেতার ওপর নির্ভর না করে যুব আন্দোলন এবং সুশীল সমাজের সাথে যুক্ত হওয়া (যেমনটা সাম্প্রতিক **বাংলাদেশ ও নেপালের** ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে)।
- **বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার:** চীনের বিআরআই (BRI)-এর গতির সাথে তাল মেলাতে ভারতের বিদ্যমান প্রজেক্টগুলো (যেমন কালাদান, আগরতলা-আখাউড়া রেল) দ্রুত সম্পন্ন করা।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI) রপ্তানি:** পুরো প্রতিবেশী অঞ্চলে ভারতের ডিজিটাল ব্যবস্থা (UPI, RuPay, ONDC) ছড়িয়ে দেওয়া যাতে ভারত-কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে ওঠে।
- **ত্রাণ সহায়তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ:** পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধ বা জলবায়ু সংকটের ফলে তৈরি হওয়া সমস্যা সমাধানে একটি স্থায়ী **"আঞ্চলিক দুর্যোগ ও স্বাস্থ্য টাস্ক ফোর্স"** গঠন করা।
- **অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিদেশ নীতি আলাদা করা:** ভারতের অভ্যন্তরীণ বিতর্কগুলো (যেমন নাগরিকত্ব বা পরিযান ইস্যু) যেন **বাংলাদেশের** মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- **সামুদ্রিক যৌথ নিরাপত্তা:** আরব সাগরে নতুন হুমকি মোকাবিলায় **কলোম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ** এবং **সাগর (SAGAR)** ভিশনকে আরও শক্তিশালী করা।

উপসংহার

ভারতকে অবশ্যই একটি **"কৌশলগত নোঙর" (Strategic Anchor)** হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ডিজিটাল অবকাঠামো এবং একতরফা সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ উপ-মহাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যা বৈশ্বিক আঘাত সহ্য করতে পারবে এবং ভারতকে একজন প্রকৃত **নিরাপত্তা প্রদানকারী** হিসেবে তুলে ধরবে।

Q. "India's Neighbourhood First Policy is increasingly being tested by evolving regional and global challenges." Examine in the context of recent geopolitical developments.

2.2.3. হরমোজ প্রণালী (STRAIT OF HORMUZ) সংকট

ভূমিকা

সহজ কথায়, **হরমোজ প্রণালী** হলো একটি সরু সামুদ্রিক পথ যা বিশ্বের মোট বাণিজ্য হওয়া তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বহন করে। সাম্প্রতিক **মার্কিন-ইসরায়েল** সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় **ইরান** এই পথ দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল **১১০ ডলার** ছাড়িয়ে গেছে এবং ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্ব জ্বালানি প্রবাহে হরমোজ প্রণালীর গুরুত্ব

হরমোজ প্রণালী হলো ইরান (উত্তরে) এবং ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (দক্ষিণে) মধ্যে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ জলপথ। এটি **পারস্য উপসাগরকে** (সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত ও ইরানের মতো তেল উৎপাদনকারী দেশ) **ওমান উপসাগর** এবং **আরব সাগরের** সাথে যুক্ত করে।

মূল তথ্যসমূহ:

- **ভৌগোলিক অবস্থান:** এর সংকীর্ণতম অংশ মাত্র **২১–৩৩ কিমি** চওড়া।
- **পরিবহন ক্ষমতা:** প্রতিদিন প্রায় **২০–২১ মিলিয়ন ব্যারেল** অপরিশোধিত তেল এখান দিয়ে যায় (বিশ্বের সামুদ্রিক তেল বাণিজ্যের প্রায় ২০-২৫%)।
- **এলএনজি (LNG):** বিশ্বের মোট এলএনজি সরবরাহের প্রায় **২০%** এই পথেই পরিবাহিত হয়।
- **এশিয়ার উপর নির্ভরতা:** এখান দিয়ে যাওয়া তেলের **৮০–৯০%** যায় চীন, **ভারত**, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- **বিকল্প ব্যবস্থা:** সৌদি আরবের ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনের মতো বিকল্পগুলো বড়জোর ৩.৫–৭ মিলিয়ন ব্যারেল বহন করতে পারে, যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: এটি একটি বৈশ্বিক **"চোকপয়েন্ট"** (Chokepoint)। এখানে সামান্য বাধা সৃষ্টি হলেও বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ঘাটতি, আতঙ্ক এবং তেলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই পথ বন্ধ হওয়ায় শত শত ট্যাঙ্কার আটকে আছে এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর রপ্তানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্বের জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের সমীকরণ

বিশ্বের মোট জ্বালানির অর্ধেকেরও বেশি (IEA ২০২৪-এর তথ্য অনুযায়ী) আসে **খনিজ তেল** এবং **প্রাকৃতিক গ্যাস** থেকে। বাকি অংশ আসে কয়লা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং পারমাণবিক উৎস থেকে।

প্রধান ব্যবহারসমূহ:

- **পরিবহন জ্বালানি:** গাড়ি, ট্রাক, উড়োজাহাজ ও জাহাজের জ্বালানি হিসেবে।
- **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য।
- **রান্নার গ্যাস (LPG):** গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে।
- **শিল্পের কাঁচামাল:** প্লাস্টিক, রাসায়নিক এবং সার কারখানার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে।

উৎপাদন ও ব্যবহারের ধরন

- **প্রধান উৎপাদক:** মূলত **পশ্চিম এশিয়ার** পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ঘনীভূত; বিশেষ করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক এবং কুয়েত। এরা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তেল ও গ্যাস রপ্তানিকারক।

- **প্রধান ভোক্তা:** পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিসমূহ, বিশেষ করে **চীন, ভারত ও জাপান**।
- **সীমিত অভ্যন্তরীণ মজুদ:** এই এশীয় দেশগুলোর নিজস্ব তেলের মজুদ খুবই সামান্য (যদিও চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে)।

আমদানির ওপর ব্যাপক নির্ভরতা

- **নির্ভরশীলতা:** চীন, ভারত এবং জাপান তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে আমদানিকৃত খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর **প্রবলভাবে নির্ভরশীল**।
- **হরমোজ প্রণালীর গুরুত্ব:** এই আমদানির একটি বিশাল অংশ পারস্য উপসাগর থেকে **হরমোজ প্রণালীর** মধ্য দিয়ে আসে। ফলে এই **'চোকপয়েন্ট'**টি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারকথা: পশ্চিম এশিয়ায় বিপুল **উৎপাদন** এবং এশিয়ায় বিশাল **চাহিদা**—এই দুইয়ের মধ্যে এক স্পষ্ট অসামঞ্জস্য রয়েছে। যা হরমোজ প্রণালীর নিরাপদ চলাচলের ওপর বিশ্বকে চরমভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে।

বিশ্ব তৈল বাজারের প্রধান পক্ষসমূহ

বিশ্বের খনিজ তেলের মজুদ এবং উৎপাদনের সিংহভাগ কেবল কয়েকটি অঞ্চল ও দেশের নিয়ন্ত্রণে:

১. OPEC **(অর্গানাইজেশন অফ দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ)**

- **ভূমিকা:** বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে **উৎপাদন মাত্রা** সমন্বয় করে।
- **সদস্য:** ১২-১৩টি প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ নিয়ে গঠিত।
- **নেতৃত্ব:** সৌদি আরব (প্রধান নেতা), সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি।
- **ক্ষমতা:** ওপেক দেশগুলোর কাছে বিশ্বের **৭০%-এর বেশি** তেলের মজুদ রয়েছে। তারা উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিম এশিয়া (পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ)

- **প্রধান উৎপাদক:** সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), ইরান, ইরাক এবং কুয়েত।
- **গুরুত্ব:** এই অঞ্চলটি বিশ্ব তেলের মজুদের একটি বিশাল অংশ ধারণ করে এবং **হরমোজ প্রণালীর** মাধ্যমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে।
- **প্রভাব:** এখানকার অধিকাংশ দেশ OPEC-এর সদস্য, যা বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে তাদের শক্তিশালী ভূমিকা দেয়।

২. **অন্যান্য কৌশলগত পক্ষ**

- **ভেনেজুয়েলা ও ইরান:** এই দুই দেশের কাছে সম্মিলিতভাবে বিশ্বের বিশাল পরিমাণ মজুদ (**~৩৯%**) রয়েছে।
- **ভেনেজুয়েলা:** এককভাবে বিশ্বের প্রায় **১৭%** তেলের মজুদ এই দেশটির কাছে।
- **সীমাবদ্ধতা:** বিশাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও **নিষেধাজ্ঞা** (Sanctions) এবং **অবকাঠামোগত দুর্বলতার** কারণে বর্তমানে তাদের উৎপাদন সীমিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে পরিবর্তিত ক্ষমতা সমীকরণ

১. **জ্বালানি ভূ-রাজনীতিতে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ভূমিকা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানির একাধারে **প্রধান উৎপাদক এবং ভোক্তা**:

- মার্কিন অর্থনীতি উচ্চ-জ্বালানি নির্ভর (পরিবহন, শিল্প), ফলে তাদের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার ভারতের তুলনায় প্রায় **১০ গুণ** বেশি।

- **ঐতিহাসিক পরিবর্তন:** ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম এশিয়ার তেলের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন/ইউরোপীয় কোম্পানি থেকে স্থানীয় **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে** চলে যায়। ১৯৭০-এর দশকে OPEC তেলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে।
- **মার্কিন কৌশল:**
  1. **অভ্যন্তরীণ উৎপাদন:** ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে **শেল অয়েল** (Shale Oil) এবং **ফ্র্যাকিং** (Fracking) প্রযুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক হয়ে ওঠে।
  2. **সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** জ্বালানি রুট এবং উপসাগরীয় তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমেরিকা বিভিন্ন সময় উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০), ইরাক যুদ্ধ (২০০৩), এবং বর্তমানের ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে জড়িয়েছে।
- **ভবিষ্যৎ সমীকরণ:** ইরান ও ভেনেজুয়েলার কাছে বিশ্বের প্রায় **৩৯%** তেলের মজুদ থাকায় আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এই দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে হরমোজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় রাশিয়া বর্তমানে বৈশ্বিক বাজারে এক প্রধান স্থিতিশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২. সুবিধাজনক অবস্থানে রাশিয়ার উত্থান

- ২০২২ সালের ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।
- বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ার তেল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায়, রাশিয়ার তেল বিশ্বের জন্য **অপরিহার্য** হয়ে উঠেছে। পশ্চিম এশিয়ার বাইরে রাশিয়ার কাছেই সবচেয়ে বেশি রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত তেল রয়েছে।

ক. রুশ তেল এবং ভারতের ভূমিকা

- ভারত বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক এবং **তৃতীয় বৃহত্তম** ভোক্তা।
- বাজারে তেলের জোগান কমলে ভারতে জ্বালানি, পরিবহন এবং নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। তাই ভারতের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাজারে বড় প্রভাব ফেলে।

খ. ইউরোপের জ্বালানি সংকট

- নিজস্ব মজুদ কম থাকায় ইউরোপ শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্য ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ২০২২-এর নিষেধাজ্ঞার পর তারা পশ্চিম এশিয়ার দিকে ঝুঁকেছিল, যা এখন সংকটে।

গ. রাশিয়ার দিকে ভারতের ঝোঁক

- সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি নিশ্চিত করতে ভারত ডিসকাউন্টে রুশ তেল কেনা বাড়িয়েছে।
- **আমদানির হার:** ২০২১ সালে ভারতের মোট আমদানির মাত্র **২.৫%** ছিল রুশ তেল, যা ২০২৩ সালে বেড়ে প্রায় **৩৯%** হয় (২০২৫-এ যা প্রায় ৩৩%)।
- **পরিশোধন ও মুনাফা:** ভারত সস্তা রুশ তেল আমদানি করে তা পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজিতে রূপান্তর করছে। ভারতের বিশাল **রিফাইনিং ক্ষমতা** থাকায় তারা এই পরিশোধিত পণ্য রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে।

হরমোজ প্রণালী সংকটে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

- **নীরব সমর্থন:** প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেও, পশ্চিমা নেতারা ভারতের রুশ তেল কেনার বিষয়টিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কারণ ২০২২ সাল থেকে ভারতের এই পদক্ষেপ বিশ্ববাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে।
- **বর্তমান চাপ:** হরমোজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় এবং তেলের দাম **১১০ ডলার** ছাড়িয়ে যাওয়ায়, বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে আমেরিকা এখন জরুরিভিত্তিতে **রাশিয়ার আটকে থাকা তেলের** সরবরাহ বাড়ানোর পক্ষে মত দিচ্ছে।

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ভারতের বহুমুখী পদক্ষেপ

১. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (ECA), ১৯৫৫-এর অধীনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ

- সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে **অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫**-এর আওতায় **প্রাকৃতিক গ্যাস (সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০২৬** জারি করেছে।

- **অগ্রাধিকার ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা:**
  - **শীর্ষ অগ্রাধিকার:** রান্নার গ্যাস (PNG), পরিবহন (CNG) এবং LPG উৎপাদন।
  - **সরবরাহ হ্রাস:** সার কারখানা (প্রায় ৭০%) এবং অন্যান্য শিল্পখাত (প্রায় ৮০%)।
- **মজুদদারি রোধ:** আতঙ্কিত ক্রয় ও কালোবাজারি রুখতে দুটি LPG বুকিংয়ের মাঝে **২৫ দিনের ব্যবধান** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২. **জ্বালানি আমদানির বহুমুখীকরণ**

- ভারত হরমোজ প্রণালীর মতো ঝুঁকিপূর্ণ পথের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।
- **বিকল্প উৎস:** আলজেরিয়া, নরওয়ে, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি বাড়ানো হয়েছে।
- **নিরাপদ রুট:** সরবরাহ সচল রাখতে দীর্ঘ পথ হওয়া সত্ত্বেও **কেপ অফ গুড হোপ** (Cape of Good Hope) রুট ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. **রুশ তেলের ওপর বর্ধিত নির্ভরতা**

- পশ্চিম এশিয়া থেকে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ভারত **রাশিয়া** থেকে তেল আমদানি আরও বাড়িয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো সাময়িকভাবে **নিষেধাজ্ঞা শিথিল** করায় ভারতের পক্ষে এই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৪. **অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি**

- সরকার রিফাইনারিগুলোকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বিশেষ করে LPG বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে।
- **ফলাফল:** স্বল্পমেয়াদে LPG উৎপাদন প্রায় **১০% বৃদ্ধি** পেয়েছে।
- এই বাড়তি উৎপাদন মূলত সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

১. **ভারতের জন্য: জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ**

- **আমদানির বহুমুখীকরণ:** একক পথের ওপর নির্ভরতা কমাতে রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকা থেকে তেল আমদানির উৎস বাড়াতে হবে।
- **কৌশলগত তেল মজুদ (SPR):** বর্তমানে মাত্র ২ সপ্তাহের মজুদ সক্ষমতাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী **৯০ দিনে** উন্নীত করতে হবে।
- **সবুজ জ্বালানি:** জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে **সৌর, বায়ু শক্তি** এবং **বৈদ্যুতিক যানবাহনের** (EV) প্রসারে গতি আনতে হবে।
- **পরিশোধন সক্ষমতা:** বিভিন্ন ধরণের অপরিশোধিত তেল পরিশোধনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

২. **যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার জন্য: বৈশ্বিক সরবরাহ স্থিতিশীল করা**

- **যুক্তরাষ্ট্র:** হরমোজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পথগুলো সচল রাখতে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো এবং বৈশ্বিক সরবরাহ চাপ কমাতে অভ্যন্তরীণ **শেল অয়েল** উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- **রাশিয়া:** উদ্বৃত্ত উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারতসহ আমদানিকারক দেশগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে স্থিতিশীল তেল সরবরাহ করে বিশ্ববাজারে ভরসা জোগানো।

৩. **বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য: পদ্ধতিগত স্থিতিশীলতা**

- **বিকল্প পথ:** ঝুঁকিপূর্ণ 'চোকপয়েন্ট'-এর ওপর নির্ভরতা কমাতে পাইপলাইন এবং নতুন LNG **টার্মিনাল** তৈরিতে বিনিয়োগ করা।

- **আন্তর্জাতিক সমন্বয়:** তেলের দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা রোধে OPEC+-এর মতো মঞ্চে উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- **নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর:** IEA-র পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে এগিয়ে যাওয়া।
- **কূটনীতি:** স্থিতিশীল বাণিজ্যের স্বার্থে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া।

উপসংহার

হরমোজ প্রণালীর সংকট প্রমাণ করে যে **জ্বালানি নিরাপত্তা** এবং **ভূ-রাজনীতি** একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। একটিমাত্র জলপথ বন্ধ হওয়া বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। ভবিষ্যতে একটি স্থিতিশীল জ্বালানি ব্যবস্থার জন্য আমদানির বহুমুখীকরণ, অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কোনও বিকল্প নেই।

Q. Discuss how geopolitical conflicts in West Asia influence global energy flows and reshape power dynamics among major countries like the U.S., Russia, and India.

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

2.3.1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা

প্রেক্ষাপট

- দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত সংযুক্তি সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু একই সাথে এটি ডিজিটাল জগতে নারীদের জন্য ঝুঁকি ও অসুরক্ষাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
- **২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের** প্রাক্কালে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে নৈতিক AI এবং নারীদের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো এক জরুরি প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে।

AI এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি কীভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন করছে

১. **অর্থনৈতিক সুযোগের প্রসার:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নারীদের ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং এবং গৃহ-ভিত্তিক উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে। উদাহরণস্বরূপ, Meesho-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ছোট শহরের অনেক নারীকে অনলাইন রিসেলিংয়ের মাধ্যমে আয় করতে সক্ষম করে তুলেছে।

২. **শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নয়ন:** 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' এবং **'প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান'** (PMGDISHA)-এর অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং অনলাইন শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, যা বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের জন্য সহায়ক হয়েছে।

৩. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুদৃঢ়করণ: 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'**-র মতো প্রকল্পগুলি লক্ষ লক্ষ নারীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ও সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের (DBT) সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম করেছে।

৪. **স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন: 'ই-সঞ্জীবনী'** (eSanjeevani)-র মতো টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্মগুলি বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার নারীদের দূর থেকে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সাহায্য করছে।

৫. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নারীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে, জনমত গঠনে অংশ নিতে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে; যার প্রমাণ আমরা #MeToo-এর মতো প্রচারণার মাধ্যমে দেখেছি।

৬. **প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** AI গবেষণা এবং STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়লে তা প্রযুক্তিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নৈতিক করে তুলবে। এটি ডিজিটাল ব্যবস্থায় লিঙ্গ-ভিত্তিক সমস্যাগুলো সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

AI যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অনলাইন হয়রানি এবং ডিজিটাল নির্যাতনের বৃদ্ধি**

- ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নারীদের সাইবার বুলিং, ট্রোলিং, স্টকিং এবং **ডক্সিং** (সম্মতি ছাড়াই অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা)-এর সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে।
- UN Women এবং The Economist Intelligence Unit (2021)-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বজুড়ে ৩৮% নারী অনলাইন সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং ৮৫% নারী ডিজিটাল নির্যাতনের সাক্ষী হয়েছেন।
- ভারতে, **ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)** ২০২২ সালে ৬৫,০০০-এর বেশি সাইবার অপরাধের মামলা নথিভুক্ত করেছে, যা ডিজিটাল স্পেসে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

২. **ডিপফেক (Deepfake) এবং AI প্রযুক্তির অপব্যবহার**

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি **ডিপফেক** তৈরিতে সহায়তা করছে—যা মূলত এমনভাবে পরিবর্তিত ভিডিও, ছবি বা অডিও যা কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করে।
- Deeptrace-এর গবেষণা অনুযায়ী, অনলাইনে থাকা ডিপফেক ভিডিওগুলোর প্রায় ৯৬% হলো সম্মতিহীন পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট, যার মূল লক্ষ্যবস্তু নারী।
- Sensity AI-এর ২০২৩ সালের একটি বিশ্লেষণেও দেখা গেছে যে, ডিপফেক-ভিত্তিক যৌন শোষণের প্রাথমিক শিকার হলেন নারীরা।

৩. **ছদ্মনাম ব্যবহার এবং প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতার অভাব**

- অনলাইনে পরিচয় গোপন রাখা বা ছদ্মনাম ব্যবহার করার সুযোগ থাকায় সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিকারক কন্টেন্টগুলো প্ল্যাটফর্মগুলোতে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে মডারেশন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তার সাথে তাল মেলাতে পারে না।
- Information Technology Rules, 2021 থাকা সত্ত্বেও, এর প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াগুলো এখনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ফলে অবমাননাকর কন্টেন্টগুলো ইন্টারনেটে থেকেই যায়।

৪. **AI উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য**

- AI গবেষণা এবং এর নেতৃত্বদানকারী পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। UNDP এবং UNESCO-এর মতে, বিশ্বজুড়ে AI পেশাদারদের মাত্র ২২% নারী এবং ১৪%-এরও কম নারী উচ্চপদস্থ ভূমিকায় রয়েছেন।
- AI উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের অভাব অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত (Algorithmic bias) এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে।

৫. **ডিপফেক-এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধানের অভাব**

- ভারত Information Technology Act, 2000 এবং Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023-এর মতো আইনের মাধ্যমে অশ্লীলতা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো সাইবার অপরাধগুলো মোকাবিলা করে।
- তবে, বর্তমানে AI-চালিত ডিপফেক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই, যা AI-এর মাধ্যমে করা হয়রানি মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

৬. **ডিজিটাল সচেতনতা এবং শিক্ষার অভাব**

- অনেক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সাইবার নিরাপত্তা, AI-এর অপব্যবহার এবং অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।

- Internet and Mobile Association of India-এর তথ্য অনুযায়ী, **২০২৩** সালে **ভারতে ৮২০ মিলিয়নেরও** বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, কিন্তু ডিজিটাল সাক্ষরতার হার সর্বত্র সমান নয়।
- এর ফলে National Cyber Crime Reporting Portal-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে অভিযোগ জানানোর হার কমে যায় এবং অনলাইন শোষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- **মোবাইল ইন্টারনেট** ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতে **৪০% লিঙ্গবৈষম্য** রয়েছে—নারীদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস কম হওয়ায় তাদের নিরাপত্তা সচেতনতা এবং নিজেদের রক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও কম থাকে। (GSMA Mobile Gender Gap 2024)

ভারতে বিদ্যমান নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ

- IT Act, 2000 **(ধারা ৬৬-ই):** তথ্যপ্রযুক্তি **আইন, ২০০০-এর ৬৬-ই ধারা** অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলা, প্রকাশ করা বা আদান-প্রদান করা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শামিল। এর শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, কিংবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।
- IT Act, 2000 **(ধারা ৬৭-এ):** এই ধারায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যৌনতাপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রকাশ বা আদান-প্রদান করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদিও এটি ডিপফেক কন্টেন্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব, তবে এতে বিশেষভাবে AI-দ্বারা তৈরি মিডিয়া বা বিষয়বস্তুর উল্লেখ নেই।
- BNS, 2023: **'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩'** অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া কারও অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে দেওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এটি আগের IPC কাঠামোর তুলনায় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে, এই আইনেও AI-চালিত ডিপফেক মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা এখনও নেই।
- MeitY **ডিপফেক নির্দেশিকা, ২০২৩: ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক** (MeitY) অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে যে, কোনো রিপোর্ট করা ডিপফেক কন্টেন্ট নোটিশ পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে।

AI পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা (Best Practices)

- EU AI Act, 2024: এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বিশ্বের প্রথম ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আইন। এই আইনে সম্মতিহীন অন্তরঙ্গ ছবি (NCII) এবং ডিপফেক তৈরি করে এমন সিস্টেমগুলোকে 'অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি' (Unacceptable Risk) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোর ব্যবহারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
- AI **নৈতিকতা কাঠামো** (AI Ethics Framework): ২০২১ সালের **ইউনেস্কোর** (UNESCO) সুপারিশ অনুযায়ী, কোনো AI সিস্টেম চালু করার আগে তার **লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রভাব** (Gender Impact Assessment) মূল্যায়ন করা এবং AI উন্নয়নকারী দলে বৈচিত্র্য (নারীদের অংশগ্রহণ) নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- **দায়িত্বশীল AI-এর নীতিমালা:** অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার নীতিগুলো তুলে ধরেছে। ভারত এই নীতিগুলো সমর্থন করলেও দেশীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে এগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা এখনও বাকি।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৌশলগত নীতিগত পদক্ষেপ

AI উদ্ভাবনের সাথে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তার সমন্বয় ঘটাতে একটি **বহু-অংশীদারভিত্তিক কৌশল** (Multi-stakeholder strategy) প্রয়োজন, যা সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

১. **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা**

- **ডিপফেক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইন** (Dedicated Deepfake Legislation): ডিপফেক এবং সিন্থেটিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। এতে সম্মতিহীন **AI-জেনারেটেড অন্তরঙ্গ কন্টেন্ট** তৈরি, বিতরণ বা হোস্টিং করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং ভুক্তভোগীদের জোরালো সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

- **প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি (Enhanced Platform Accountability):** তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ৭৯ নম্বর ধারার মতো বিধানগুলো সংশোধন করতে হবে, যাতে প্ল্যাটফর্মগুলো **AI-ভিত্তিক শনাক্তকরণ (AI-based detection)** এবং ক্ষতিকারক কন্টেন্ট মডারেশনে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেয়। পদ্ধতিগত অবহেলার ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর কঠোর দায়বদ্ধতা আরোপ করতে হবে।
- **দ্রুতগামী সাইবার বিচার ব্যবস্থা (Fast-Track Cyber Justice):** সাইবার অপরাধের দ্রুত তদন্ত এবং ডিপফেক সংক্রান্ত মামলাগুলোর সময়মতো নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি রাজ্যে **বিশেষায়িত সাইবার ক্রাইম আদালত** এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **ডিজিটাল-ফরেনসিক ইউনিট** স্থাপন করতে হবে।

২. **AI উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

- **AI গবেষণায় নারীদের উৎসাহদান:** সরকারি সহায়তাপুষ্ট AI উদ্যোগগুলোতে (যেমন: IndiaAI Mission) বিশেষ ফেলোশিপ এবং গবেষণা প্রণোদনার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
- **STEM থেকে AI-তে রূপান্তর (STEM-to-AI Pipeline):** বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) এবং AI-সংক্রান্ত পেশায় নারীদের প্রবেশ সহজ করতে বৃত্তি, মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ বাড়াতে হবে।
- **প্রযুক্তি খাতে বৈচিত্র্য উৎসাহিত করা:** টেক কোম্পানিগুলোতে **লিঙ্গ বৈচিত্র্য অডিট (Gender diversity audits)** এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে যাতে **অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত (Algorithmic bias)** কমানো যায় এবং নৈতিক AI তৈরি করা সম্ভব হয়।

৩. **ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি**

- **ডিজিটাল নিরাপত্তা শিক্ষা:** প্রাথমিক সচেতনতা তৈরির জন্য NCERT কর্তৃক উন্নত স্কুল পাঠ্যক্রমে AI নীতিশাস্ত্র, ডিপফেক সচেতনতা এবং সাইবার নিরাপত্তা মডিউল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **রিপোর্টিং এবং সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় রেসপন্স মেকানিজম উন্নত করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে ডেডিকেটেড **হেল্পলাইন** এবং AI-জনিত হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য **র‍্যাপিড রেসপন্স টিম**।
- **তৃণমূল স্তরে ডিজিটাল সাক্ষরতা:** 'দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর অধীনে থাকা **স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর (SHGs)** মতো তৃণমূল প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করে ডিজিটাল সাক্ষরতা, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া এবং নারীদের জন্য সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সাথে আপস না করে প্রযুক্তির সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে হলে AI উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। **নৈতিক AI গভর্ন্যান্স**, কঠোর আইনি প্রয়োগ এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে **লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে** অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমেই ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে নারীদের সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।

2.3.2. সংঘাত ও অস্থিরতার মাঝে নারী অধিকার রক্ষা

প্রেক্ষাপট

- **আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)** পালন করার মাধ্যমে বর্তমানের ক্রমবর্ধমান অস্থির বৈশ্বিক পরিবেশে নারীদের অধিকার রক্ষার জরুরি প্রয়োজনীয়তা আবারও সামনে এসেছে।
- **২০২৬ সালের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য**— জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত **"অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ: সকল নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য"**, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে নারী ও কন্যাশিশুদের চরম নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকির বিষয়টির দিকে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে

- **উৎপত্তি:** বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দিবসের সূচনা হয়। তখন নারী শ্রমিকরা উন্নত কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক সমতার দাবি জানিয়েছিলেন।
- **বিস্তৃতি:** ধীরে ধীরে এটি লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার, শ্রম অধিকার এবং নারী ক্ষমতায়নের একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে রূপ নেয়।
- **জাতিসংঘের স্বীকৃতি:** জাতিসংঘ **১৯৭৭** সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয়, যা এই দিবসটিকে একটি বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা প্রদান করে।
- **সমসাময়িক গুরুত্ব:** বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বহুমুখী উদ্দেশ্যে পালন করা হয়:
  - **সাফল্যের স্বীকৃতি:** রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং সমাজ গঠনে নারীদের অবদানকে স্বীকার করা।
  - **নীতি নির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম:** সরকার এবং সুশীল সমাজ এই দিনে লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়গুলো তুলে ধরে।
  - **জবাবদিহিতার মাধ্যম:** লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচারের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক নারী অধিকার কাঠামোর বিবর্তন এবং সংঘাতকালীন সুরক্ষা

ক. সশস্ত্র সংঘাতে নারীদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো

১. **জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯)**

- সশস্ত্র সংঘাতে নারীদের **বিশেষ সুরক্ষা** প্রদান করে।
- **যৌন সহিংসতা**, অমানবিক আচরণ এবং অবমাননাকর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।
- নারী যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক নারীদের **মানবিক আচরণ** নিশ্চিত করা।

২. **নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (WPS) এজেন্ডা**

- এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের **রেজোলিউশন ১৩২৫ (২০০০)**-এর মাধ্যমে শুরু হয়।
- সংঘাতে নারীদের ওপর **অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব** স্বীকার করা হয়।
- এই রেজোলিউশনের চারটি মূল স্তম্ভ:
  - **অংশগ্রহণ:** শান্তি আলোচনা ও শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি।
  - **সুরক্ষা:** সহিংসতা ও শোষণ থেকে নারীদের রক্ষা করা।
  - **প্রতিরোধ:** সংঘাত প্রতিরোধের কৌশলে **লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি** যুক্ত করা।
  - **ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার:** যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. **পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজোলিউশনসমূহ**

- **রেজোলিউশন ১৮২০ (২০০৮):** যৌন সহিংসতাকে **যুদ্ধের কৌশল** হিসেবে স্বীকৃতি।
- **রেজোলিউশন ১৮৮৯ (২০০৯):** যুদ্ধোত্তর শান্তি বিনির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান।
- **রেজোলিউশন ২২৪২ (২০১৫):** সন্ত্রাসবাদ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণকে যুক্ত করা।
- **রেজোলিউশন ২৪৯৩ (২০১৯):** WPS এজেন্ডা বাস্তবায়নে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা।

খ. মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে লিঙ্গ সমতা

১. **CEDAW (১৯৭৯):** এটিকে নারীদের **আন্তর্জাতিক অধিকার বিল** বলা হয়। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে।

২. **বেইজিং ঘোষণা (১৯৯৫):** নারী ক্ষমতায়নের একটি ব্যাপক রূপরেখা। এটি **"নারী ও সশস্ত্র সংঘাত"**-কে একটি সংকটময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৩. **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-5):** এর লক্ষ্য হলো **লিঙ্গ সমতা অর্জন** এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন।

অধিকার, ন্যায়বিচার এবং পদক্ষেপ: বৈশ্বিক বাধ্যবাধকতা

২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য তিনটি আন্তঃসংযুক্ত স্তম্ভের ওপর জোর দেয়:

১. **নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ:** সশস্ত্র সংঘাত ও অস্থিরতার সময়ও নারীর অধিকার রক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:
- **লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV)** এবং হয়রানি থেকে মুক্তি।
- যৌন শোষণ, পাচার এবং **জবরদস্তিমূলক বাস্তুচ্যুতি** থেকে সুরক্ষা।
- খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো **মানবিক সহায়তায়** সমান অধিকার।
- **প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য** অধিকার রক্ষা।

২. **ভিকটিমদের জন্য ন্যায়বিচার (Justice for Victims):**
- সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার **তদন্ত ও বিচার (Prosecution)**।
- শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত নারীদের জন্য আইনি নিরাপত্তা।
- সারভাইভারদের জন্য **পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ**।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল** বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩. **অঙ্গীকারকে পদক্ষেপে রূপান্তর:**
- **লিঙ্গ-সাড়াদানকারী** ত্রাণ কর্মসূচি।
- শান্তি আলোচনা ও প্রশাসনে নারীদের **অর্থবহ অংশগ্রহণ**।
- শরণার্থী শিবিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী-কেন্দ্রিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত **আর্থিক বরাদ্দ**।

প্রতিশ্রুতি কিন্তু অগ্রগতি নেই: বাস্তবতার ব্যবধান

আন্তর্জাতিক নীতিমালা থাকলেও বর্তমান বৈশ্বিক প্রবণতায় "প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু অগ্রগতি নেই" এমন একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে।

উদ্বেগজনক বৈশ্বিক প্রবণতা (২০২৪–২০২৬):

- ১৯৪৬ সালের পর বিশ্বে বর্তমানে **সর্বোচ্চ সংখ্যক সশস্ত্র সংঘাত** চলছে।
- প্রায় **৬৭৬ মিলিয়ন নারী** সংঘাতপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি বসবাস করছেন।
- গত দুই বছরে নারী ও শিশুদের মৃত্যুহার চার গুণ বেড়েছে এবং **সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতা ৮৭% বৃদ্ধি** পেয়েছে।

নারীদের সুরক্ষা প্রদানে প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিক পতন ও দুর্বল আইন প্রয়োগ:** সশস্ত্র সংঘাতের সময় একটি দেশের বিচার বিভাগ, পুলিশ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এর ফলে নারীদের সুরক্ষায় নিয়োজিত আইনগুলো অকার্যকর হয়ে যায় এবং অপরাধীরা **বিচারহীনতা (Impunity)** ভোগ করে।
- **উদাহরণ:** সুদানের গৃহযুদ্ধের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ভেঙে পড়ায় যৌন সহিংসতার রিপোর্ট বাড়লেও ভুক্তভোগীরা কোনো আইনি প্রতিকার পায়নি।

২. **বদ্ধমূল পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক রীতিনীতি:** সংঘাতকালীন পরিস্থিতিতে সামাজিক অস্থিরতা প্রায়ই **পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে** আরও শক্তিশালী করে। এটি নারীদের চলাফেরা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে দেয়।
- **উদাহরণ:** আফগানিস্তানে **তালিবানের** পুনরুত্থানের পর নারীদের শিক্ষা এবং জনজীবনে অংশগ্রহণের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

৩. **লিঙ্গ-অসংবেদনশীল মানবিক সহায়তা:** অনেক সময় ত্রাণ ও সহায়তা কর্মসূচিগুলো নারী ও কন্যাশিশুদের বিশেষ প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করেই তৈরি করা হয়। ফলে তারা খাদ্য নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধির মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।
   - **উদাহরণ:** সিরীয় শরণার্থী শিবিরে পৃথক ও নিরাপদ শৌচাগারের অভাবে নারী ও মেয়েরা হয়রানির শিকার হয়েছে।

৪. **শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় নারীদের বর্জন:** বিশ্বজুড়ে শান্তি আলোচনা বা সংঘাত নিরসনের টেবিলে নারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র **৭% শান্তি আলোচনাকারী** এবং **১৪% মধ্যস্থতাকারী** হলেন নারী। নারীদের এই অনুপস্থিতি শান্তিচুক্তিতে লিঙ্গ-সমতার বিষয়টি উপেক্ষা করার ঝুঁকি বাড়ায়।

৫. **যৌন সহিংসতাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার:** আধুনিক অনেক যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে ভেঙে দিতে এবং কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করতে যৌন সহিংসতাকে একটি **পরিকল্পিত রণকৌশল** হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি সামাজিক কাঠামোকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
   - **উদাহরণ:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এই ধরনের সহিংসতার অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬. **ডিজিটাল সহিংসতা:** বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী অধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে **অনলাইন হয়রানি**, অপপ্রচার এবং ডিজিটাল হুমকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাদের জনজীবনে সক্রিয় থাকাকে কঠিন করে তোলে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি বাস্তব জীবনের শারীরিক লাঞ্ছনায় রূপ নেয়।

অধিকারের জন্য প্রয়োজন পদক্ষেপ: ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য—**"অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ"**—কে বাস্তবে রূপান্তর করতে বৈশ্বিক নীতি এবং স্থানীয় নিরাপত্তার মধ্যে ব্যবধান ঘোচাতে নিচের বহুমুখী কৌশলগুলো প্রয়োজন:

- **শান্তি বিনির্মাণে বাধ্যতামূলক কোটা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থায়ী শান্তিচুক্তি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ পরিচালিত এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল শান্তি আলোচনায় নারীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা স্বেচ্ছামূলক থেকে **বাধ্যতামূলক (ন্যূনতম ৩০%)** হিসেবে নির্ধারণ করা।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** সামরিক-কেন্দ্রিক ব্যয় থেকে সরে এসে মানব-কেন্দ্রিক বিনিয়োগে গুরুত্ব দেওয়া এবং ২০২৬ সালের মধ্যে মানবিক ও শান্তি বিনির্মাণ তহবিলের **১৫% লিঙ্গ সমতার জন্য** বরাদ্দ করার লক্ষ্য রাখা।
- **আইনি জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা:** বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে এবং লিঙ্গভিত্তিক অপরাধগুলোকে বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করতে **আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC)** সংঘাত-সম্পর্কিত যৌন সহিংসতার (CRSV) বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- **স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সরাসরি সহায়তা:** যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যর্থ হয়, তখন সম্মুখসারির সেবাদানকারী হিসেবে নিয়োজিত তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলোকে মানসিক ও জীবনরক্ষাকারী সহায়তা প্রদানের জন্য **অবাধ ও নমনীয় অর্থায়ন** প্রদান করা।
- **নারী অধিকার কর্মীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা:** নারী অধিকার কর্মীদের লিঙ্গভিত্তিক অপপ্রচার, রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত নজরদারি এবং অনলাইন হয়রানি থেকে রক্ষা করতে শক্তিশালী **সাইবার-সুরক্ষা কাঠামো** বাস্তবায়ন করা।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল করিডোরে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার:** বাস্তুচ্যুতির সময় মাতৃকালীন স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পাচার থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত **সুরক্ষিত উচ্ছেদ পথ (Evacuation routes)** প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার

সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নারীদের অধিকার রক্ষা করা কেবল একটি মানবিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি **টেকসই শান্তি ও ন্যায়বিচারের** একটি মূল শর্ত। তাই বৈশ্বিক অঙ্গীকারগুলোকে বাস্তব পদক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান অস্থির এই বিশ্বে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য নারীদের অধিকার, মর্যাদা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে একটি **যৌথ আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার** হিসেবে বজায় রাখতে হবে।

Q. লিঙ্গ সমতা কেবল একটি মানবাধিকারের বিষয় নয়, বরং এটি টেকসই শান্তির একটি পূর্বশর্ত। সমসাময়িক বৈশ্বিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।

2.3.4. কর্তব্যের দায়বদ্ধতা: টিকা জনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি

প্রসঙ্গ

- সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **'রচনা গাঙ্গু বনাম ভারত সরকার'** মামলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে একটি **'নো-ফল্ট কম্পেনসেশন স্কিম'** (ত্রুটি-হীন ক্ষতিপূরণ নীতি) তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এটি মূলত কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযানে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা **AEFI** (Adverse Events Following Immunisation) আক্রান্তদের জন্য।
- এই নির্দেশ ভারতের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে একটি বড় পরিবর্তন, যেখানে দায়বদ্ধতা প্রমাণের দায়ভার ভুক্তভোগীর ওপর না রেখে সরাসরি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আদালত স্পষ্ট করেছে যে, একটি **কল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State)** সরকার যখন টিকাকরণের মতো জনস্বাস্থ্য প্রচার চালায়, তখন তাকে অবশ্যই **'ডিউটি অফ কেয়ার' (Duty of Care)** বা যত্নের দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে হবে।

প্রেক্ষাপট: টিকা জনিত মামলা ও আইনি পরিস্থিতি

১. **সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদন**

- **মামলার কারণ:** মূলত ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে এই আবেদন করা হয়েছিল, যারা অভিযোগ করেছেন যে কোভিড-১৯ টিকা (যেমন কোভিশিল্ড বা কোভ্যাক্সিন) নেওয়ার পর তাদের আত্মীয়রা মারা গেছেন বা গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন।
- **মূল ঘটনা:** ২০২১ সালে ১৮ ও ২০ বছর বয়সী দুই তরুণীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'রচনা গাঙ্গু' মামলাটি শুরু হয়। তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে **VITT** (Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) নামক একটি বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে দায়ী করা হয়।
- **আবেদনকারীদের মূল দাবি:**
  - **অবহিত সম্মতির অভাব (Lack of Informed Consent):** সাধারণ মানুষকে টিকার বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে জানানো হয়নি।
  - **কার্যত বাধ্যতামূলক টিকাকরণ:** সরকারিভাবে টিকা নেওয়া 'ঐচ্ছিক' বলা হলেও, ভ্রমণ বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধের কারণে এটি বাস্তবে **বাধ্যতামূলক** হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
  - **ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি:** ভারতে কোনও নির্দিষ্ট জাতীয় টিকা ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি না থাকায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আইনি শূন্যতার মধ্যে পড়েছিল।

২. **সরকারের অবস্থান ও যুক্তি** কেন্দ্রীয় সরকার আদালতের কাছে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি পেশ করেছিল:

- **কঠোর নিরাপত্তা যাচাই:** ভারতে ব্যবহৃত প্রতিটি টিকা বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন পাওয়ার পরই ব্যবহৃত হয়েছে এবং দেশে একটি শক্তিশালী **AEFI মনিটরিং** ব্যবস্থা রয়েছে।
- **বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** রক্ত জমাট বাঁধার মতো সমস্যাগুলি অত্যন্ত বিরল ছিল (প্রতি ১ লক্ষ ডোজে প্রায় **০.০০১ শতাংশ**)।
- **বিকল্প আইনি পথ:** সরকার জানিয়েছিল যে, ক্ষতিগ্রস্তরা চাইলে দেওয়ানি আদালত বা উপভোক্তা আদালতে গিয়ে টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থার অবহেলা প্রমাণ করে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ মোড় (২০২৪): ২০২৪ সালে ব্রিটিশ আদালতে **অ্যাস্ট্রাজেনেকো (AstraZeneca)** স্বীকার করে যে তাদের টিকা (ভারতে যা কোভিশিল্ড নামে পরিচিত) খুব বিরল ক্ষেত্রে VITT ঘটাতে পারে। এই স্বীকৃতির ফলে ভারত সরকারের আগের অবস্থান (যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি কাকতালীয়) দুর্বল হয়ে পড়ে।

মূল সমস্যা ও নীতিগত চ্যালেঞ্জসমূহ

একটি নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ কাঠামোর অনুপস্থিতি বেশ কিছু পদ্ধতিগত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল:

- **প্রমাণের গুরুভার (Heavy Burden of Proof):** প্রচলিত 'দোষ-ভিত্তিক' (fault-based) ব্যবস্থায়, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ভুক্তভোগীকে প্রমাণ করতে হয় যে রাষ্ট্র বা টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা **গাফিলতি** করেছে। VITT-এর মতো জটিল চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করা অত্যন্ত কঠিন।
- **আইনি শূন্যতা (Legal Vacuum):** বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা সত্ত্বেও, টিকা-জনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ভারতে কোনও **আনুষ্ঠানিক পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা** ছিল না।
- **স্বেচ্ছামূলক বনাম বাধ্যতামূলক দ্বন্দ্ব (Voluntary vs Mandatory Paradox):** সরকারিভাবে টিকাকরণকে 'স্বেচ্ছামূলক' ঘোষণা করা হলেও, বিভিন্ন প্রশাসনিক নির্দেশিকা (যেমন: ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ) এটিকে কার্যত **বাধ্যতামূলক** করে তুলেছিল। এটি রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনি দায়বদ্ধতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তোলে।
- **সাম্যের অধিকার সংক্রান্ত উদ্বেগ:** ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিগত আইনি লড়াইয়ে বাধ্য করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মামলার ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। এটি সংবিধানের **১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ (আইনের চোখে সাম্য)** লঙ্ঘন করার সম্ভাবনা তৈরি করে, কারণ এতে শুধুমাত্র সম্পদশালীরাই আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা পায়।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ও আইনি দর্শন

সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে স্পষ্ট করেছে যে, টিকা-জনিত ক্ষতির বিচার কেবল একটি আইনি লড়াই নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়বদ্ধতার অংশ।

১. **আদালতের প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ**

- **ব্যক্তিগত মামলার অসারতা:** আদালত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিম্ন আদালতে আলাদাভাবে মামলা করার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে। বড় আকারের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি অনুপযুক্ত।
- **প্রমাণের জটিলতা:** টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা অবহেলা প্রমাণ করার জন্য অত্যন্ত জটিল বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল।
- **বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ রায়ের ঝুঁকি:** যদি প্রতিটি পরিবারকে আলাদাভাবে লড়তে হয়, তবে বিভিন্ন আদালত ভিন্ন ভিন্ন রায় দিতে পারে। এটি সংবিধানের **১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ (সাম্যের অধিকার)** লঙ্ঘন করে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া অনিশ্চিত করে তোলে।

২. **বিচারবিভাগীয় যুক্তি: "নো-ফল্ট" নীতি ও দায়বদ্ধতা**

আদালতের এই নির্দেশটি ভারতীয় আইনে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। এটি **"দোষ প্রমাণ" (Proving guilt)** থেকে **"কল্যাণ নিশ্চিতকরণ"** এর দিকে মনোযোগ সরিয়ে এনেছে।

ক. "নো-ফল্ট" লাইবিলিটি বা ত্রুটি-হীন দায়বদ্ধতার নীতি

- **সরাসরি ত্রাণ:** এখানে টিকা এবং ক্ষতির মধ্যে একটি **যুক্তিসঙ্গত সংযোগ (Plausible link)** থাকলেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীকে কোনও ভুল বা ত্রুটি প্রমাণ করতে হয় না।
- **ভারতীয় ও বৈশ্বিক নজির:**
  - **ভারত:** এই নীতিটি ইতোমধ্যে **মোটর যান আইন (Motor Vehicles Act)** এবং শিল্প দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

- **বিশ্ব:** অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের মতো দেশে এই ব্যবস্থা সফলভাবে চালু আছে।

- **সাম্যের অধিকার (Article 14):** শক্তিশালী রাষ্ট্র বা বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই অসম। এই নীতি সমাজের সবথেকে দুর্বল মানুষকেও ন্যায়ের সমান অধিকার দেয়।

খ. জীবন ও স্বাস্থ্যের অধিকার (Article 21)

আদালত **২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** পরিধি বিস্তৃত করে জানিয়েছে যে, "জীবনের অধিকার"-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো **"স্বাস্থ্যের অধিকার"**।

- **রাষ্ট্র যখন অভিভাবক (Parens Patriae):** রাষ্ট্র কেবল পরিষেবা প্রদানকারী নয়, বরং নাগরিকের জীবনের মর্যাদা রক্ষার অভিভাবক।

- **কর্তব্যের দায়বদ্ধতা (Duty of Care):** যখন রাষ্ট্র "জনস্বার্থের" জন্য কোনও চিকিৎসার সুপারিশ করে (যেমন হার্ড ইমিউনিটি), তখন এর বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতেই হবে।

৩. কল্যাণকামী রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক আদেশ

এই রায় ভারতকে একটি **কল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare State)** হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, যা **রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি (DPSP)** দ্বারা পরিচালিত।

- **অনুচ্ছেদ ৩৮:** জনকল্যাণে সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আদেশ দেয়।

- **অনুচ্ছেদ ৩৯(ই) এবং ৪৭:** জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রের **প্রাথমিক দায়িত্ব** হিসেবে গণ্য করে।

- **মূল দর্শন:** অধিকাংশ মানুষের সুরক্ষার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ক্ষতিকে রাষ্ট্র বিনা ক্ষতিপূরণে ফেলে রাখতে পারে না।

৪. পূর্ববর্তী আইনি নজিরসমূহ

- **জ্যাকব পুলিয়েল মামলা:** আদালত জরুরি ভিত্তিতে টিকার অনুমোদনকে বৈধতা দিলেও মনে করিয়ে দিয়েছে যে, অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী **শারীরিক স্বায়ত্তশাসন** বজায় রাখা জরুরি এবং কাউকে টিকায় বাধ্য করা যায় না।

- **গৌরব কুমার বানসাল মামলা (২০২১):** এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কোভিড-১৯-এ মৃতদের পরিবারের জন্য Ex-gratia বা অনুদানমূলক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছিল।

  - **NDMA কাঠামো:** এই রায়ের ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০২১-এ নির্দেশিকা জারি হয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (SDRF) থেকে মৃত প্রতি পরিবারকে **৫০,০০০ টাকা** দেওয়া হয়।

  - জেলা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন করা হয়েছিল যাতে মৃত্যু শংসাপত্র বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকলে তা দ্রুত সমাধান করা যায়।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাসমূহ

ভারতের এই পদক্ষেপ বৈশ্বিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

- **যুক্তরাষ্ট্র:** তাদের জাতীয় টিকা ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি (VICP) টিকার প্রতিটি ডোজের ওপর একটি সামান্য কর বসিয়ে তহবিল গঠন করে।

- **যুক্তরাজ্য:** গুরুতর অক্ষমতার ক্ষেত্রে 'ভ্যাকসিন ড্যামেজ পেমেন্ট স্কিম' (VDPS) থেকে এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়।

- **COVAX ব্যবস্থা:** ৯২টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ত্রুটি-হীন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: একটি শক্তিশালী নীতি নির্ধারণের কাঠামো

জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- **একটি নির্দিষ্ট তহবিল গঠন:** সরকারকে একটি স্থায়ী **'টিকা-জনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল'** গঠন করতে হবে। এটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) অথবা টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির ওপর সামান্য শুল্ক (Levy) আরোপের মাধ্যমে তৈরি করা যেতে পারে।
- **সরলীকৃত দাবি প্রক্রিয়া:** NDMA-এর মডেল অনুসরণ করে এই প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ **প্রশাসনিক এবং সময়সীমাবদ্ধ (Time-bound)** করতে হবে। এতে সাধারণ আদালত বা আইনি মারপ্যাঁচের জটিলতা এড়িয়ে দ্রুত ত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।
- **AEFI নজরদারিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য **জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত** রাখতে হবে। এটি ভবিষ্যতে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের জন্য **HPV টিকাকরণ** কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাধারণ মানুষের 'অবহিত সম্মতি' (Informed Consent) নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।
- **স্বতন্ত্র মেডিকেল বোর্ড:** যদিও বর্তমানে AEFI কমিটিগুলি তথ্য পর্যবেক্ষণ করে, তবুও ক্ষতিপূরণের জটিল দাবিগুলি নিরপেক্ষভাবে সমাধানের জন্য **স্বতন্ত্র মেডিকেল বোর্ড** ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশটি জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে সফলভাবে দূর করেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, রাষ্ট্র কোনো সুরক্ষা কবচ ছাড়া নাগরিকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে পারে না। **'নো-ফল্ট' কাঠামোতে** এই রূপান্তর নিশ্চিত করে যে, ভারতের **কল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare State)** হিসেবে পরিচয়টি অটুট রয়েছে। এটি পরিসংখ্যানগত তুচ্ছতার চেয়ে **মানবিক মর্যাদা (Human Dignity)** এবং সহমর্মী **'ডিউটি অফ কেয়ার' (Duty of Care)** বা যত্নের দায়বদ্ধতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

Q. গণ-টিকাকরণ কর্মসূচি সমষ্টিগত সুবিধা প্রদান করলেও ব্যক্তিবিশেষের ওপর বিরল ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একটি টিকা-জনিত ক্ষতিপূরণ কাঠামো কীভাবে জনসচেতনতা, সামাজিক বিশ্বাস এবং টিকার গ্রহণযোগ্যতাকে শক্তিশালী করতে পারে, তা মূল্যায়ন করুন।

2.3.5. ভারতে শৈশব স্থূলতার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

প্রাসঙ্গিকতা

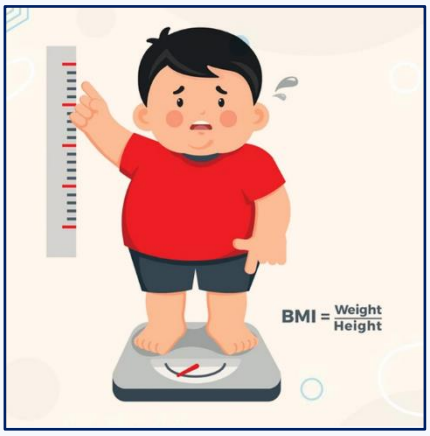

- **ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফেডারেশন (World Obesity Federation)** সম্প্রতি **'ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি অ্যাটলাস ২০২৬'** প্রকাশ করেছে, যা বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষ করে ভারতে শৈশব স্থূলতার দ্রুত বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেছে।
- 'ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি অ্যাটলাস ২০২৬'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, উচ্চ বডি মাস ইনডেক্স (BMI) সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যার বিচারে চীনের পরেই **ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে** রয়েছে।
- বর্তমানে লক্ষ লক্ষ শিশু এই সমস্যায় আক্রান্ত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। শৈশব স্থূলতা একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে অসংক্রামক ব্যাধি (NCDs), অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা এবং জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশের (Demographic Dividend) ওপর।

শৈশব স্থূলতা অনুধাবন

ক. স্থূলতার সংজ্ঞা (Definition of Obesity)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, স্থূলতা হলো একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং পুনরাবৃত্তিমূলক রোগ, যা অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত চর্বি জমার দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।

খ. পরিমাপ: বডি মাস ইনডেক্স (BMI)

- **BMI = ওজন (কেজি) / উচ্চতা^{2} (মিটার^2)**
- এটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওজন (Overweight) এবং স্থূলতা (Obesity) শ্রেণীবদ্ধ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ. শিশুদের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বৃদ্ধির মানদণ্ড (৫–১৯ বছর)

- **অতিরিক্ত ওজন (Overweight):** BMI যখন WHO নির্ধারিত মধ্যক (Median) থেকে ১ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বেশি হয়।
- **স্থূলতা (Obesity):** BMI যখন WHO নির্ধারিত মধ্যক থেকে ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বেশি হয়।
- **সারসংক্ষেপ:** শৈশব স্থূলতা বলতে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়াকে বোঝায়, যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।

ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি অ্যাটলাস ২০২৬: প্রধান তথ্যসমূহ

ক. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট প্রাদুর্ভাব: ৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার ১৯৭৫ সালের ৪% থেকে বেড়ে ২০২২ সালে প্রায় ২০%-এ দাঁড়িয়েছে।

- **আক্রান্ত অঞ্চল:** স্থূলতায় আক্রান্ত শিশুদের অধিকাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে বসবাস করে।
- **শীর্ষ দেশসমূহ:** মাত্র দশটি দেশেই উচ্চ BMI সম্পন্ন ২০০ মিলিয়নেরও বেশি শিশু রয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে চীন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- **দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব:** শৈশব স্থূলতা প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্ক বয়স পর্যন্ত বজায় থাকে, যা ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক ব্যাধির (NCDs) ঝুঁকি বাড়ায়।

খ. ভারতীয় প্রেক্ষাপট

ভারত বর্তমানে একটি দ্রুত পুষ্টিগত পরিবর্তনের (Nutritional Transition) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে পুষ্টিহীনতা এবং স্থূলতা—এই **দ্বিমুখী পুষ্টিজনিত সংকটের (Double Burden of Malnutrition)** সৃষ্টি হয়েছে।

১. বর্তমান পরিসংখ্যান (২০২৫)

- ৫–৯ বছর বয়সী **১৪.৯ মিলিয়ন** শিশু অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত।
- ১০–১৯ বছর বয়সী **২৬.৪ মিলিয়ন** কিশোর-কিশোরী অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত।
- সর্বমোট **৪১ মিলিয়ন** শিশুর BMI উচ্চ মাত্রায় রয়েছে।

২. স্বাস্থ্য নির্দেশক

- **৮.৩৯ মিলিয়ন** শিশুর BMI-জনিত কারণে লিভারের সমস্যা বা মেটাবলিক ডিসফাংশন-অ্যাসোসিয়েটেড স্টিয়াটোটিক লিভার ডিজিজ (MASLD) দেখা দিয়েছে।
- **২.৯৮ মিলিয়ন** শিশু উচ্চ BMI-সংক্রান্ত উচ্চরক্তচাপে (Hypertension) ভুগছে।

৩. ২০৪০ সালের পূর্বাভাস

- **২০ মিলিয়ন** শিশুর স্থূলতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- **৫৬ মিলিয়ন** শিশু অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন হতে পারে।
- **১২০ মিলিয়ন** স্কুলগামী শিশুর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:
  - উচ্চরক্তচাপ (Hypertension)
  - হৃদরোগ (Cardiovascular diseases)

- ডায়াবেটিস (Diabetes)

শিশু পুষ্টিতে বৈশ্বিক পরিবর্তন: শৈশব স্থূলতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

ইউনিসেফ (UNICEF)-এর ২০২৫ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে শিশুদের পুষ্টির ধরণ এক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো, স্থূলতায় (Obesity) আক্রান্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অনুপাত কম ওজনের (Underweight) শিশুদের ছাড়িয়ে গেছে।

ক. ভারতে অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব (NFHS-3 থেকে NFHS-5)

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (National Family Health Survey) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ (NFHS-3) থেকে ২০১৯-২১ (NFHS-5)-এর মধ্যে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার হার ক্রমাগত বেড়েছে:

- **পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু:** প্রাদুর্ভাব ১.৫% থেকে বেড়ে **৩.৪%** হয়েছে।
- **কিশোরী মেয়ে:** ২.৪% থেকে বেড়ে **৫.৪%** হয়েছে।
- **কিশোর ছেলে:** ১.৭% থেকে বেড়ে **৬.৬%** হয়েছে।
- **প্রাপ্তবয়স্ক নারী:** প্রাদুর্ভাব প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১২.৬% থেকে **২৪.০%** হয়েছে।
- **প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ:** ৯.৩% থেকে বেড়ে **২২.৯%** হয়েছে।

খ. ইউনিসেফ (UNICEF) প্রতিবেদনের প্রধান তথ্যসমূহ

- **৫-১৯ বছর বয়সী** শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্থূলতার হার (৯.৪%) বর্তমানে কম ওজনের হারের (৯.২%) চেয়ে কিছুটা বেশি, যা অপুষ্টির ধরণের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
- **২০০০ সাল থেকে**, এই বয়সী শিশুদের মধ্যে স্থূলতা তিনগুণ বেড়েছে (৩% থেকে ৯.৪%), যেখানে কম ওজনের হার ১৩% থেকে কমে ৯.২% হয়েছে।
- **বিশ্বব্যাপী**, ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৫% শিশু এবং ৫-১৯ বছর বয়সী ২০% শিশু ও কিশোর-কিশোরী অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত।
- অতিরিক্ত ওজনের প্রাদুর্ভাবের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে **নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে**, যা দ্রুত পুষ্টিগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে।
- সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া ব্যতীত বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে স্থূলতার হার কম ওজনের হারকে ছাড়িয়ে গেছে; তবে এই দুই অঞ্চলে এখনও কম ওজন বা পুষ্টিহীনতা একটি বড় সমস্যা।

শৈশব স্থূলতা বৃদ্ধির কারণসমূহ

- **অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে ঝোঁক:** শিশুরা ক্রমশ **অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার (Ultra-processed foods - UPFs)** গ্রহণ করছে যাতে প্রচুর পরিমাণে চিনি, লবণ, অস্বাস্থ্যকর চর্বি এবং রাসায়নিক উপাদান থাকে। এগুলোর ব্যাপক বিজ্ঞাপন শিশুদের খাদ্যাভ্যাসকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।
- **অর্থনৈতিক কারণ:** তাজা এবং পুষ্টিকর খাবারের তুলনায় অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রায়ই সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায়। ভুট্টা, সয়া এবং গমের মতো ফসলের জন্য দেওয়া কৃষি ভর্তুকি এবং প্রিজারভেটিভের ব্যবহার এই দামের পার্থক্যের জন্য দায়ী।
- **স্কুল টিফিন কর্মসূচিতে অস্বাস্থ্যকর খাবার:** ২০২৪ সালের একটি গ্লোবাল সার্ভে অনুযায়ী, বিশ্বের প্রতি চারটি স্কুল মিল প্রোগ্রামের মধ্যে একটিতে প্রক্রিয়াজাত মাংস দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে মিষ্টি, ভাজা খাবার এবং চিনিযুক্ত পানীয়ও দেওয়া হয়।
- **শারীরিক পরিশ্রমের অভাব:** নগরায়ণ, খেলার জায়গার অভাব, যানবাহনের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং স্ক্রিন টাইম (ফোন/টিভি) বৃদ্ধির ফলে শিশুদের শারীরিক কার্যকলাপ কমে গেছে, যা তাদের অলস জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- **জেনেটিক কারণ:** কিছু ক্ষেত্রে স্থূলতা বংশগত বা জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে, যা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে দ্রুত ওজন বৃদ্ধির দিকে ধাবিত করে।

- **দুর্বল নীতিগত পদক্ষেপ:** অনেক দেশেই এখনও কঠোর নিয়ন্ত্রনবিধি নেই। খুব কম দেশেই খাবারের প্যাকেটের সামনে পুষ্টির মান উল্লেখ করা (Front-of-pack labelling) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাবারকে উৎসাহিত করার জন্য ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থাও খুব সীমিত।

ক্রমবর্ধমান শৈশব স্থূলতার প্রভাব

শৈশব স্থূলতা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত জটিলতার সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়, যা শারীরিক, বিপাকীয় এবং মানসিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করে। এর প্রধান স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো হলো:

- **বিপাকীয় এবং হৃদরোগ সংক্রান্ত ব্যাধি (Metabolic and Cardiovascular Disorders):** শৈশব স্থূলতা টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), হাইপারগ্লাইসেমিয়া, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। শরীরের অতিরিক্ত চর্বি স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটায় এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি করে।
- **যকৃৎ বা লিভার সংক্রান্ত জটিলতা:** অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে **মেটাবলিক ডিসফাংশন-অ্যাসোসিয়েটেড স্টিয়াটোটিক লিভার ডিজিজ (MASLD)** হতে পারে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে যকৃতে অস্বাভাবিক চর্বি জমা হয়, যা চিকিৎসা না করলে লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।
- **পেশী ও হাড়ের সমস্যা (Musculoskeletal Problems):** অতিরিক্ত ওজন হাড় এবং জয়েন্টের ওপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে জয়েন্টের সমস্যা, কঙ্কালতন্ত্রের ধকল এবং চলাফেরার ক্ষমতা হ্রাস পায়, যা শারীরিক সক্রিয়তাকে আরও সীমিত করে দেয়।
- **মানসিক ও সামাজিক প্রভাব:** স্থূলতায় আক্রান্ত শিশুরা প্রায়শই হীনম্মন্যতা (Low self-esteem), উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং সামাজিক কলঙ্কের শিকার হয়। স্কুল বা সামাজিক পরিবেশে উপহাস (Bullying) ও বৈষম্যের ফলে এই সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়।
- **প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে স্থায়িত্ব:** শৈশব স্থূলতা প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্ক বয়স পর্যন্ত বজায় থাকে, যা সারাজীবনের জন্য অসংক্রামক ব্যাধি (NCDs) এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

সুস্থ পুষ্টি ও স্থূলতা রোধে প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **পোষণ অভিযান (POSHAN Abhiyaan):** উন্নত পুষ্টি পরিষেবা এবং সচেতনতার মাধ্যমে শিশু, কিশোরী এবং মায়েদের পুষ্টির মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
- **ইট রাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট (Eat Right India Movement):** ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার এবং স্কুলে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা হয়।
- **'আজ সে থোড়া কম' (Aaj Se Thoda Kam) প্রচারভিযান:** এটি একটি দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচি যা মানুষকে তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় চর্বি, চিনি এবং লবণের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমানোর জন্য উৎসাহিত করে।
- **রুকো (RUCO - Repurpose Used Cooking Oil) উদ্যোগ:** ব্যবহৃত রান্নার তেল সংগ্রহ করে তা বায়োডিজেল বা সাবানের মতো পণ্যে রূপান্তর করা নিশ্চিত করা হয়, যাতে এই তেল পুনরায় খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে না পারে।

বৈশ্বিক নীতিগত পদক্ষেপ

- **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনিসেফ (UNICEF)-এর রূপরেখা:** এই সংস্থাগুলো স্বাস্থ্যকর স্কুল পরিবেশ নিশ্চিত করা, চিনিযুক্ত পানীয়ের ওপর কর আরোপ, জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপনী নিয়ন্ত্রণ এবং শৈশব স্থূলতার প্রবণতা জাতীয়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুপারিশ করে।
- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ৩.৪:** এই লক্ষ্যমাত্রাটি অসংক্রামক ব্যাধি থেকে অকাল মৃত্যু হ্রাসের ওপর জোর দেয়, যেখানে শৈশব স্থূলতা মোকাবেলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

শৈশব স্থূলতা মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

- **স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রচার:** খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, ভাউচার, নগদ অর্থ স্থানান্তর এবং স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

- **নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা:** অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপনী প্রচারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা, খাবারের প্যাকেটের সামনে পুষ্টির মান উল্লেখ করা (Front-of-pack labelling) এবং অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করা।
- **সক্রিয় জীবনযাত্রায় উৎসাহিত করা:** 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' এবং 'খেলো ইন্ডিয়া'র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত শারীরিক কসরতে উৎসাহিত করা এবং খেলাধুলা ও ফিটনেসকে দৈনন্দিন রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করা।
- **শিশুদের জন্য শারীরিক অবকাঠামোর উন্নতি:** শিক্ষা অধিকার আইন (RTE)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে খেলার মাঠ এবং ক্রীড়া সুবিধার উপস্থিতি কঠোরভাবে নিশ্চিত করা। এছাড়া আবাসিক এলাকাগুলোতে পার্ক এবং উন্মুক্ত বিনোদনমূলক স্থান তৈরি করা যাতে শিশুরা বাইরে খেলাধুলার সুযোগ পায়।
- **চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি:** বর্তমানে 'সেমাগ্লুটাইড' (Semaglutide) এবং 'তিরজেপাটাইড' (Tirzepatide)-এর মতো নতুন স্থূলতা-বিরোধী ওষুধগুলো আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখাচ্ছে। যদিও উচ্চমূল্যের কারণে বর্তমানে এগুলোর ব্যবহার সীমিত, তবে ভবিষ্যতে সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক সংস্করণ পাওয়া গেলে চিকিৎসার সুযোগ আরও বাড়বে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** সুষম খাদ্য, অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড গ্রহণের ঝুঁকি এবং নিয়মিত ব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

উপসংহার

পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস, অলস জীবনযাত্রা এবং দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ভারতে শৈশব স্থূলতা আজ একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর পুষ্টি, নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ, কার্যকর আইনি নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতার মতো প্রতিরোধমূলক কৌশলের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা অপরিহার্য। এটি কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষাই করবে না, বরং ভারতের **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশকে** (Demographic Dividend) দীর্ঘস্থায়ী করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Q. ক্রমবর্ধমান শৈশব স্থূলতা খাদ্য ব্যবস্থা, নগরায়ন এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত গভীর কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে প্রতিফলিত করে। সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।

2.3.6. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা: কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের পথ

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায়শই উপেক্ষিত দিক হলো এর **নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামো**। এই নীতি আগামী **১৫ বছরের মধ্যে** পর্যায়ক্রমে অধিভুক্তি ব্যবস্থা (Affiliation system) বিলুপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর পরিবর্তে **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসন (Graded Autonomy)** প্রদান করে কলেজগুলোকে স্বাধীনভাবে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে, যাতে শিক্ষার গুণমান, নমনীয়তা এবং উদ্ভাবন বৃদ্ধি পায়।

প্রথাগত এই **মডেলটি একসময় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা দিলেও**, বর্তমানে এটি কলেজগুলোর প্রবৃদ্ধি এবং স্বকীয়তাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে **পদ্ধতিগত অদক্ষতা, প্রাচীন একাডেমিক কঠোরতা** এবং **প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের** ভারে জর্জরিত।

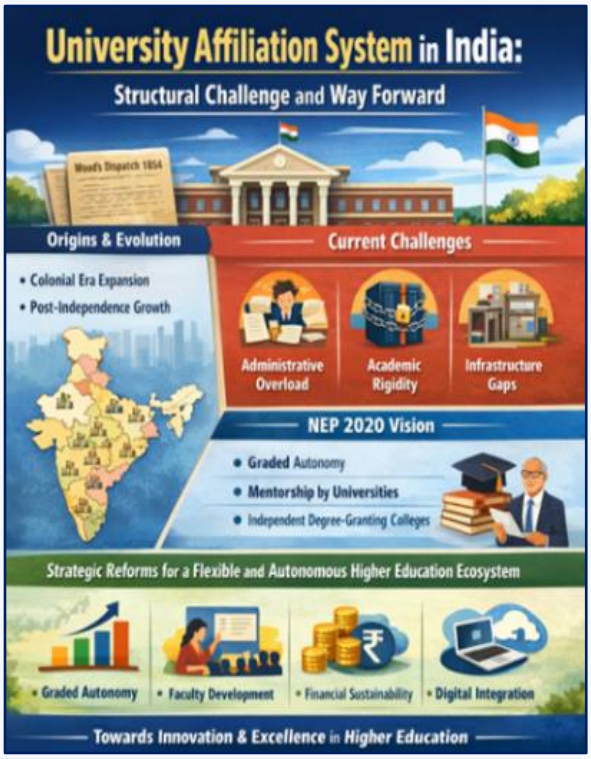

অধিভুক্তি ব্যবস্থার বিবর্তন ও যৌক্তিকতা

ভারতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থার শিকড় রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে, বিশেষ করে **১৮৫৪ সালের উড'স ডেসপ্যাচ** (Wood's Dispatch)-এর পর। একে ভারতের ইংরেজি শিক্ষার **"ম্যাগনা কার্টা"** বলা হয়।

ক. ঔপনিবেশিক ভিত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নকশা:

- **উড'স ডেসপ্যাচ** প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিল।
- এটি তৎকালীন **লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের** অনুকরণে 'অধিভুক্তি মডেল' গ্রহণ করে, যা তখন মূলত একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা ছিল।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মূলত **পরীক্ষা গ্রহণ এবং অধিভুক্তি প্রদানকারী সংস্থা** হিসেবে দেখা হতো, শিক্ষকতা বা গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে নয়।
- **উদ্দেশ্য:** একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং শিক্ষার মানদণ্ড তৈরি করা।

খ. স্বাধীনতা-পরবর্তী বিস্তার:

১৯৪৭ সালের পর জনশিক্ষার প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থাটি বজায় রাখা হয়। এর মাধ্যমে সরকার দ্রুত উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়। একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের **"ব্র্যান্ড নেম"** এবং একটি নির্দিষ্ট **সিলেবাস** ব্যবহার করে শত শত ছোট বা গ্রামীণ কলেজকে ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার আওতায় আসে।

অধিভুক্তি মডেলের মূল উদ্দেশ্যসমূহ (Core Objectives)

- **শিক্ষার প্রসার** (Expansion of Access): পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করেই দ্রুত অসংখ্য কলেজ খোলার সুযোগ প্রদান।
- **অভিন্নতা ও মানকীকরণ** (Uniformity and Standardisation): একটি সাধারণ পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং একাডেমিক মানদণ্ড নিশ্চিত করা।
- **প্রশাসনিক দক্ষতা:** বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

অধিভুক্তি ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো (Present Structure)

বর্তমানে বিশেষ করে **রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো** (State Universities) শত শত কলেজের সাথে যুক্ত। এদের প্রধান দায়িত্বগুলো হলো:

- **পরীক্ষা পরিচালনা** এবং **ডিগ্রি প্রদান**।
- **পাঠ্যক্রম প্রণয়ন** এবং সংশোধন।
- শিক্ষক এবং অবকাঠামোগত **মান নিয়ন্ত্রণ**।
- একাডেমিক এবং প্রশাসনিক **তদারকি**।

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের** (UGC) নির্দেশিকা অনুযায়ী কলেজগুলিকে অধিভুক্তি প্রদান করে। এই অধিভুক্তির মূল উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে **একাডেমিক মান** (Academic standards) বজায় রাখা।
- **অভিন্ন পাঠ্যক্রম** (Uniform curriculum) এবং **প্রমিত পরীক্ষা ব্যবস্থা** (Standardised examinations) নিশ্চিত করা।
- **অবকাঠামো** (Infrastructure), শিক্ষকের গুণমান এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা।

অধিভুক্তি প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **অস্থায়ী এবং সময়াবদ্ধ:** অধিভুক্তি কোনো স্থায়ী অনুমোদন নয়। এটি সাধারণত শুরুর দিকে **এক বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে** দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর (১-৩ বছর) নবায়ন করতে হয়।

- **কঠোর আনুগত্য আবশ্যিক:** অধিভুক্ত কলেজগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে:
  - প্রশাসনিক নির্দেশিকা এবং প্রবিধান।
  - নির্ধারিত **সিলেবাস (Syllabi)** এবং কোর্সের কাঠামো।
  - **পরীক্ষার ধরন (Examination patterns)** এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি।
  - ভর্তি, উপস্থিতি এবং **ফি কাঠামো (Fee structure)** সংক্রান্ত নিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তদারকি

অধিভুক্তকারী বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীনস্থ কলেজগুলোর ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যেমন:

- পাঠ্যক্রম তৈরি ও আধুনিকীকরণ।
- **কেন্দ্রীভূত মূল্যায়ন (Centralised evaluation)** এবং পরীক্ষা পরিচালনা।
- UGC এবং বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি পালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা।
- একাডেমিক গুণমান এবং **শিক্ষক নিয়োগ (Faculty appointments)** তদারকি করা।

এই ব্যবস্থার ফলে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শত শত কলেজ এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী চলে আসে, যা একটি **অত্যধিক কেন্দ্রীভূত এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামো (Centralised and bureaucratic structure)** তৈরি করে।

মানসম্মত শিক্ষার পথে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান ব্যবস্থাকে "মানসম্মত গুণমানহীন কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা বেশ কিছু গুরুতর **চ্যালেঞ্জসমূহ** তৈরি করে:

১. **বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ**

- **আমলাতান্ত্রিক জট (Bureaucratic Congestion):** বড় বড় রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০টি কলেজ পরিচালনা করে। ফলে তারা গবেষণার চেয়ে **পরীক্ষা পরিচালনা** এবং ফলাফল প্রকাশে বেশি ব্যস্ত থাকে।
- **গবেষণায় ব্যাঘাত:** সম্পদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল 'প্রশাসনিক সচিবালয়' হিসেবে কাজ করে। ফলে **উদ্ভাবন (Innovation)** এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মতো মূল কাজগুলো অবহেলিত হয়।
- **পরিসংখ্যান:** AISHE ২০২১-২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির অধীনে ১০০-এর বেশি কলেজ রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে এই চাপ প্রবল।

২. **একাডেমিক কঠোরতা এবং উদ্ভাবনে বাধা**

- **পাঠ্যক্রমিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব (Lack of Curricular Autonomy):** কলেজগুলো আইনত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস মানতে বাধ্য। ফলে তারা স্থানীয় শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক কোর্স (যেমন- AI বা Fintech) ডিজাইন করতে পারে না।
- **সৃজনশীলতায় বাধা:** এই "এক মাপে সবার জন্য" (One-size-fits-all) মডেলটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩. **পাঠ্যক্রম সংস্কারে স্থবিরতা**

- **সিলেবাস আপডেট করতে দেরি:** শত শত কলেজের জন্য সিলেবাস পরিবর্তন করতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে যখন কোনো সংস্কার কার্যকর হয়, ততক্ষণে সেই বিষয়বস্তু **অপ্রাসঙ্গিক বা সেকেলে (Obsolete)** হয়ে যায়।
- **তৎপরতার অভাব (Agility Deficit):** একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সাথে এই ধীরগতির মডেলটি মানিয়ে নিতে পারে না।

৪. **অবকাঠামো এবং গুণমানের বৈষম্য**

- **অসম পরিষেবা:** একই সিলেবাস থাকা সত্ত্বেও ল্যাবরেটরি সুবিধা বা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের পার্থক্যের কারণে শিক্ষার প্রকৃত গুণমান ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়।

- **দক্ষতার ঘাটতি (Skill Competency Gaps):** একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মান আলাদা হয়, যা ওই **ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতাকে (Credibility)** কমিয়ে দেয়।

NEP ২০২০-এর সংস্কার লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০ একটি আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে:

- **পরামর্শদাতা (Mentors):** বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজগুলোর জন্য মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবে।
- **ন্যূনতম মানদণ্ড (Minimum Benchmarks):** কলেজগুলোকে একাডেমিক, পাঠদান, শাসন ব্যবস্থা (Governance), অর্থায়ন এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড অর্জন করতে হবে।
- **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসন (Graded Autonomy):** পর্যায়ক্রমিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে কলেজগুলো ধীরে ধীরে **স্বীকৃতি (Accreditation)** লাভ করবে এবং স্বনির্ভর **স্বায়ত্তশাসিত ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে** রূপান্তরিত হবে।
- **পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তি:** আগামী **১৫ বছরের মধ্যে** এই অধিভুক্তি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বা 'ফেজ আউট' করা হবে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

বিশ্বের অনেক উন্নত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কঠোর অধিভুক্তি মডেল থেকে সরে এসে **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন (Institutional Autonomy)** এবং শক্তিশালী গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে:

- **যুক্তরাষ্ট্র:** এখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত স্বাধীন এবং আঞ্চলিক সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত। কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় শত শত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে না। এই স্বকীয়তা দ্রুত **উদ্ভাবন (Innovation)** এবং শিল্পের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করে।
- **যুক্তরাজ্য:** সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। গুণমান বজায় রাখা হয় Teaching Excellence Framework (TEF)-এর মতো বাহ্যিক কাঠামোর মাধ্যমে, আমলাতান্ত্রিক তদারকির মাধ্যমে নয়।
- **জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া:** এখানে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা এবং শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর মনোনিবেশ করে এবং বাজারের চাহিদায়ে দ্রুত সাড়া দেয়।

উত্তরণের পথ: গুণমান, সাম্য এবং নমনীয়তা বৃদ্ধির সংস্কার

নীতির উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন:

১. **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তর:** এই প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হতে হবে। NIRF র‍্যাঙ্কিং এবং NAAC অ্যাক্রেডিটেশন স্কোরকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে কলেজগুলোকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

২. **শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building):** কলেজগুলোকে স্বনির্ভর করতে শিক্ষকদের **পাঠ্যক্রম প্রণয়ন (Curriculum design)** এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে দক্ষ করে তুলতে হবে।

৩. **আর্থিক দৃঢ়তা (Financial Robustness):** সরকার এবং মূল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কলেজগুলোর জন্য একটি টেকসই আর্থিক মডেল তৈরিতে সহায়তা করতে হবে, যা কেবল ছাত্রছাত্রীদের ফি-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

৪. **ডিজিটাল একীকরণ: একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট (ABC)**-এর সঠিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা বাড়াবে এবং স্বায়ত্তশাসিত কলেজগুলোকে তাদের বিশেষায়িত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ দেবে।

উপসংহার

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা একসময় শিক্ষার প্রসারের হাতিয়ার থাকলেও, বিশেষায়িত শিক্ষার এই যুগে এটি একটি **প্রতিবন্ধক (Bottleneck)** হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্বায়ত্তশাসন, নমনীয়তা এবং উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর। এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি কেবল একটি নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন নয়; বরং এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে **বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক (Globally competitive)** করে গড়ে তোলার এবং ভারতীয় যুবসমাজকে আধুনিক ও উচ্চমানের দক্ষতায় সজ্জিত করার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

Q. The university affiliation system, once a tool for expansion of higher education, has now become a constraint on quality and innovation." Critically examine in the light of the National Education Policy (NEP) 2020.

2.3.7. ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) বা টিবি

প্রেক্ষাপট

ভারত ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG 3.3) পাঁচ বছর আগেই, অর্থাৎ **২০২৫ সালের মধ্যে টিবি নির্মূল করার লক্ষ্য** নির্ধারণ করেছিল। যদিও ২০১৫ সাল থেকে ভারতে টিবি আক্রান্তের হার ২১% কমেছে (যা বিশ্বে দ্রুততম হ্রাসের একটি রেকর্ড), তবুও ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে।

- **বর্তমান পরিস্থিতি:** বিশ্বের মোট টিবি রোগীর **২৫%** এবং মাল্টি-ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি (MDR-TB) রোগীর **৩২%** এখনও ভারতে রয়েছে।
- **সর্বশেষ থিম (বিশ্ব টিবি দিবস ২০২৬): "হ্যাঁ! আমরা টিবি শেষ করতে পারি!"**

ক্ষয়রোগ (TB): একটি ক্লিনিকাল ওভারভিউ

- **জীবাণু: মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস** (ব্যাকটেরিয়া)।
- **সংক্রমণ: বায়ুবাহিত** (কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে নির্গত জলকণা)।
- **শ্রেণীবিন্যাস:**
  - **পালমোনারি টিবি:** ফুসফুসকে আক্রান্ত করে (এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং সংক্রামক)।
  - **এক্সট্রাপালমোনারি টিবি:** লিম্ফ নোড, হাড়, কিডনি বা মস্তিষ্ককে (মেনিনজাইটিস) আক্রান্ত করে।
  - **সুপ্ত (Latent) টিবি:** শরীরে জীবাণু আছে কিন্তু ব্যক্তি অসুস্থ নন; এটি অন্যদের মধ্যে ছড়ায় না (বিশ্বের ২৫% মানুষের শরীরে সুপ্ত টিবি রয়েছে)।

টিবি নির্মূলে সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. **জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা (NSP) ২০১৭-২০২৫:** একটি বহুমুখী পরিকল্পনা যার লক্ষ্য ছিল **শনাক্তকরণ (Detect), চিকিৎসা (Treat), প্রতিরোধ (Prevent) এবং নির্মাণ (Build)** — এই চারটি স্তম্ভের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি নির্মূল করা।

২. **নিশয় পোষণ যোজনা (NPY):** এটি একটি ফ্ল্যাগশিপ **ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)** স্কিম। এর মাধ্যমে প্রত্যেক টিবি রোগীকে চিকিৎসার পুরো সময় জুড়ে পুষ্টির সহায়তার জন্য প্রতি মাসে **৫০০ থেকে ১,০০০ টাকা** সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়।

৩. **প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান:** এটি একটি জন-অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ যেখানে **'নিশয় মিত্র'**-দের ধারণা আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, এনজিও বা কর্পোরেট সংস্থাগুলি টিবি রোগীদের **'দত্তক'** নিতে পারে এবং তাদের বাড়তি পুষ্টি, রোগ নির্ণয় এবং বৃত্তিমূলক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৪. **ইউনিভার্সাল ড্রাগ সাসসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং (U-DST):** এটি একটি বড় নীতিগত পরিবর্তন। এখানে চিকিৎসার শুরুতে ব্যর্থতার জন্য অপেক্ষা না করে, শুরুতেই CB-NAAT বা TrueNat-এর মতো আণবিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি টিবি রোগীর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়।

৫. **BPaLM পদ্ধতির প্রবর্তন:** ২০২৪-২০২৫ সাল থেকে ভারত **BPaLM** (Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid, এবং Moxifloxacin) চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে মাল্টি-ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি (MDR-TB) চিকিৎসার সময়সীমা ২০ মাস থেকে কমে মাত্র **৬ মাস** হয়ে গেছে।

৬. **টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত অভিযান:** এটি একটি বিকেন্দ্রীকৃত **'জন আন্দোলন'**। এর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রামের টিবি রোগী শনাক্ত করতে, সামাজিক কলঙ্ক দূর করতে এবং গ্রামকে 'টিবি-মুক্ত' হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

টিবি নির্মূলে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা (MDR/XDR-TB):** ভারতে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি-র বোঝা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী, ব্যয়বহুল এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যুক্ত, যার ফলে রোগীরা মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দেন।
- **সামাজিক কারণের অভাব: অপুষ্টি** হলো টিবি হওয়ার প্রধান কারণ (প্রায় ৪০% ক্ষেত্রে দায়ী)। এছাড়া ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস এবং শহুরে বস্তিতে পর্যাপ্ত বাতাসের অভাব টিবি সংক্রমণের চক্রকে বজায় রাখে।
- **বেসরকারি খাতের বিচ্ছিন্নতা:** অনেক রোগী প্রথমে বেসরকারি চিকিৎসকের কাছে যান। সেখানে অনেক সময় সঠিক তথ্য জানানো হয় না বা চিকিৎসার সঠিক নিয়ম মানা হয় না, ফলে রোগটি জটিল হয়ে পড়ে।
- **সুপ্ত (Latent) টিবির ভাণ্ডার:** আনুমানিক ৩৫-৪০ কোটি ভারতীয়র শরীরে **সুপ্ত টিবি** (LTBI) সংক্রমণ রয়েছে। তারা এখন অসুস্থ না হলেও ভবিষ্যতে যেকোনো সময় আক্রান্ত হতে পারেন, যা একটি **'টিকিং টাইম বোম'**-এর মতো।
- **সামাজিক কলঙ্ক ও দেরিতে রোগ নির্ণয়:** সামাজিক অপবাদের ভয়ে মানুষ বিশেষ করে মহিলারা উপসর্গ লুকিয়ে রাখেন। এর ফলে রোগ নির্ণয়ে দেরি হয় এবং সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়ে।

টিবি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী সাফল্য: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অঞ্চল/দেশ	মূল সাফল্য (২০১৫–২০২৪)	প্রাথমিক চালিকাশক্তি ও কৌশল
আফ্রিকান অঞ্চল	মৃত্যুহার **-৪৬%** (বিশ্বে দ্রুততম হ্রাস) এবং আক্রান্তের হার -২৮%।	**HIV-TB সমন্বয়:** ৯০% কো-ইনফেকটেড রোগী অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি (ART) পাচ্ছেন। বিদেশি সাহায্যের বদলে জাতীয় অর্থায়নে জোর দেওয়া।
ইউরোপীয় অঞ্চল	আক্রান্তের হার **-৩৯%** কমেছে।	**ডিজিটাল স্বাস্থ্য:** হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং এবং ভিডিওর মাধ্যমে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ। সর্বাধুনিক ৬ মাসের মৌখিক চিকিৎসা।
চীন	২০২৫ সালের মধ্যে 'মাঝারি থেকে নিম্ন' সংক্রমণের দেশ।	**শূন্য-টিবি সম্প্রদায়:** ব্যাপক স্ক্রিনিং এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা। **AI-স্মার্ট স্ক্রিনিং:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এক্স-রে করে ৪০% দ্রুত রোগ নির্ণয়।

টিবি নির্মূলের ভবিষ্যৎ পথ

- **প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার (TPT) প্রসার:** শুধুমাত্র সক্রিয় রোগীদের চিকিৎসা না করে, **সুপ্ত (Latent) টিবি** দমনে আরও আগ্রাসী হতে হবে। ভবিষ্যতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে টিবি রোগীর পরিবারের সকল সদস্যকে এই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার আওতায় আনা জরুরি।
- **"ওয়ান হেলথ" (One Health) পদ্ধতির সমন্বয়:** টিবি-কে শুধু একটি শ্বাসকষ্টের রোগ হিসেবে না দেখে, এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অসুস্থতার দিকেও নজর দিতে হবে। **ডায়াবেটিস, এইচআইভি (HIV) এবং তামাক সেবনের** ফলে চিকিৎসার ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়ে, তাই এগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং প্রয়োজন।
- **পুষ্টির নিরাপত্তা জোরদার করা:** শুধু ১,০০০ টাকার সরাসরি সুবিধা (DBT) প্রদানই যথেষ্ট নয়; বরং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরাসরি **পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার এবং উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত রেশন কিট** সরবরাহ করতে হবে। অপুষ্টির চিকিৎসা করাই হলো টিবি-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর "সামাজিক টিকা"।

- **সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় (PPM) অপ্টিমাইজেশন:** "পেশেন্ট প্রোভাইডার সাপোর্ট এজেন্সি" (PPSA) মডেলটিকে সর্বজনীন করতে হবে। এর ফলে বেসরকারি খাতে চিকিৎসা নেওয়া প্রতিটি রোগীর তথ্য নথিভুক্ত হবে এবং তারা সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে **আণবিক পরীক্ষা ও ওষুধ** পাবেন।
- **প্রাপ্তবয়স্কদের টিকার গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D):** ১০০ বছরের পুরনো বিসিজি (BCG) টিকা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর নয়। তাই দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ভারতকে **VPM1002** বা **MTBVAC**-এর মতো নতুন টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়াল বা পরীক্ষা দ্রুত শেষ করতে হবে।
- **জন-আন্দোলন ও সামাজিক সচেতনতা:** পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং **"নিশয় মিত্র"**-দের ব্যবহার করে এই রোগের সামাজিক কলঙ্ক দূর করতে হবে। টিবি নির্মূল কর্মসূচিকে একটি নিছক চিকিৎসা ব্যবস্থার বদলে একটি **সামাজিক আন্দোলনে** রূপান্তর করতে হবে যাতে "নিখোঁজ লক্ষ লক্ষ" রোগীকে খুঁজে বের করা যায়।

উপসংহার

২০৩০ সালের মধ্যে টিবি নির্মূল করতে হলে ভারতকে নিছক ক্লিনিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে একটি **সামাজিক-প্রযুক্তিগত আন্দোলনের** দিকে এগোতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকা, এআই-চালিত (AI) রোগ নির্ণয় এবং পুষ্টির স্বনির্ভরতাকে কাজে লাগিয়ে একটি **"টিবি-মুক্ত ভারত"** নিশ্চিত করা সম্ভব।

Q. With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the Bill and their implications.

***

Scan to attempt more questions...

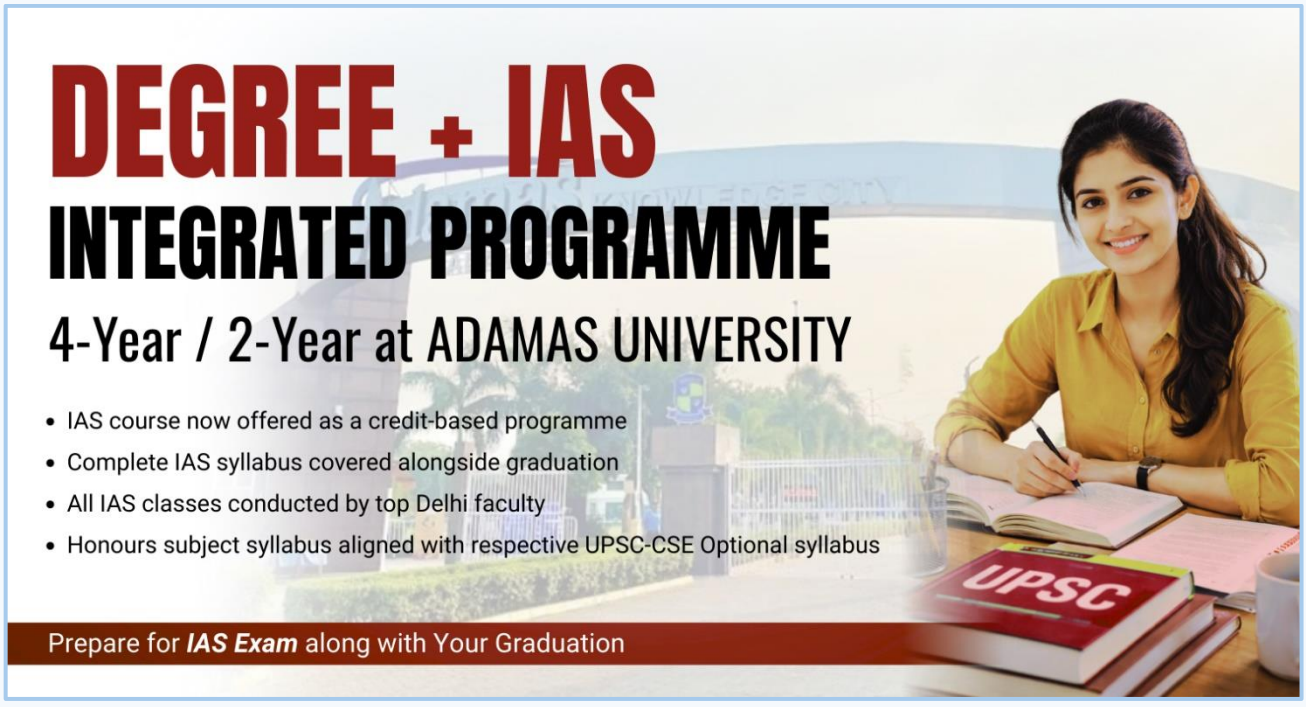

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. ভারতের নারী কৃষক

প্রেক্ষাপট

যেহেতু জাতিসংঘ **২০২৬ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ'** হিসেবে ঘোষণা করেছে, তাই এই নারী শ্রমিকদের দক্ষ ও ক্ষমতায়িত উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিতে নারীদের বাস্তব চিত্র

- **শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ:** গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের **৮০%**-এরও বেশি কৃষিকাজে নিযুক্ত।
- **শ্রমের অবদান:** বপন, আগাছা পরিষ্কার, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনার মতো প্রায় **৭০%** কৃষি কাজ নারীরাই করেন।
- **মালিকানার অভাব:** কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও, কৃষি শুমারি অনুযায়ী ভারতের মাত্র **১৩.৯%** আবাদি জমির মালিকানা নারীদের হাতে রয়েছে।
- **উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা:** FAO-এর মতে, পুরুষদের মতো নারীদেরও যদি উৎপাদনশীল সম্পদে সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তারা তাদের খামারের ফলন **২০–৩০%** পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারেন।
- **FLFPR প্রবণতা: ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** অনুযায়ী, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার (FLFPR) বেড়ে **৪২%** হয়েছে, যার প্রধান চালিকাশক্তি হলো গ্রামীণ কৃষিখাত।

ভারতে নারী কৃষকদের গুরুত্ব

১. **পুষ্টি নিরাপত্তা ও SDG ২ (ক্ষুধামুক্তি)**

নারীরা "পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি" বা Nutrition-Sensitive Agriculture-কে অগ্রাধিকার দেন। বাণিজ্যিক চাষের বদলে নারী-পরিচালিত খামারগুলো বৈচিত্র্যময় খাদ্যশস্য চাষে মনোযোগ দেয়, যা সরাসরি গ্রামীণ পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

- **উদাহরণ:** পোষণ অভিযানের (POSHAN Abhiyaan) অধীনে **"পুষ্টি-বাগান" (Poshan Vatika)** উদ্যোগ, যেখানে নারীরা শিশুদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা দূর করতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করেন।

২. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান**

নারীরা ভারতের প্রধান **"বীজ রক্ষক"**। তারা ঐতিহ্যবাহী বীজ নির্বাচন, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষজ্ঞ, যা উচ্চ-ফলনশীল বীজের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল।

- **উদাহরণ: রাহিবাই পোপেরে** (ভারতের "বীজ মাতা" বা Seed Mother), যিনি শত শত দেশীয় বীজ সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী বীজ ব্যাংক তৈরির জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

৩. **"প্রাকৃতিক কৃষিতে" (BPKP) নেতৃত্ব**

নারীরা **ভারতীয় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি**র স্বাভাবিক পথপ্রদর্শক। গবাদি পশু পালনে তাদের প্রথাগত ভূমিকার কারণে তারা **জিওয়ামৃত** এবং **ঘনজিওয়ামৃত**-এর মতো জৈব সার ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ।

- **উদাহরণ: অন্ধ্রপ্রদেশে** 'কমিউনিটি-ম্যানেজড ন্যাচারাল ফার্মিং' (APCNF) মডেলটি সফল হয়েছে মূলত **৬০ লক্ষ নারীর** অংশগ্রহণের কারণে, যারা ব্যয়বহুল রাসায়নিক সার ত্যাগ করে প্রাকৃতিক চাষ বেছে নিয়েছেন।

৪. **গ্রামীণ কৃষি-পরবর্তী অর্থনীতির স্তম্ভ**

নারীরা খামার এবং বাজারের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করেন। তারা **"মূল্য সংযোজন"** (Value Addition) কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন, যা ফসলের অপচয় কমায় এবং খামারের আয় বৃদ্ধি করে।

- **উদাহরণ:** মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের **নারী-চালিত** FPO (কৃষক উৎপাদক সংস্থা), যারা কাঁচা মিলেটকে (Millet) সরাসরি খাওয়ার উপযোগী স্ন্যাকসে রূপান্তরিত করে মুনাফা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৫. **পুরুষদের "শহরমুখী অভিবাসনের" মোকাবিলা**

কাজের সন্ধানে গ্রামীণ পুরুষরা শহরে চলে যাওয়ায়, নারীরা খামার ব্যবস্থার মূল পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এর ফলে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন স্থিতিশীল থাকছে।

- **উদাহরণ: হিমালয় এবং বিহার অঞ্চলে**, যেখানে পুরুষদের পরিযান সবথেকে বেশি, সেখানে নারীরাই জমি লাঙল দেওয়া থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত সব দায়িত্ব পালন করে জমিকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন।

৬. ***প্রযুক্তিগত অগ্রণী ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি***

নারীরা কৃষিতে "প্রযুক্তিগত বাধা" ভেঙে দিচ্ছেন এবং প্রমাণ করছেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে লিঙ্গ কোনো বাধা নয়।

- **উদাহরণ: নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প**, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) হাজার হাজার নারীকে ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা কীটনাশক ও সার ছিটানোর কাজে দক্ষ **"এগ্রি-টেকনিশিয়ান"** হয়ে উঠছেন।

নারী কৃষকদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **জমির মালিকানা ও আইনি অদৃশ্যতা:** পুরুষতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থার কারণে জমির মালিকানা মূলত পুরুষদের হাতে থাকে; নারীদের মালিকানায় মাত্র **১৪%-এরও কম** আবাদি জমি রয়েছে। এই "কৃষক" স্বীকৃতির অভাবে তারা কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কেবল **"কৃষি শ্রমিক"** হিসেবেই গণ্য হন।

২. **ঋণ ও বীমা সুবিধা থেকে বঞ্চিত:** ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে জমির দলিল বন্ধক রাখা বাধ্যতামূলক (Collateral Barrier)। এর ফলে নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং **প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার** মতো সরকারি নিরাপত্তা বলয় থেকে বঞ্চিত হন, যা তাদের চড়া সুদে মহাজনদের কাছে যেতে বাধ্য করে।

৩. **প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও শারীরিক কষ্ট:** অধিকাংশ কৃষি যন্ত্রপাতি পুরুষদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী তৈরি। নারীবান্ধব ও আরামদায়ক সরঞ্জামের অভাবে তাদের প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।

৪. **কাঠামোগত মজুরি বৈষম্য:** অসংগঠিত কৃষি খাতে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য প্রবল। PLFS **২০২৫-২৬** এর তথ্য অনুযায়ী, একই পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় মাত্র **৭০-৮০%** মজুরি পান।

৫. **ডিজিটাল বিভাজন ও তথ্যের অভাব:** স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সীমিত ব্যবহারের কারণে নারীরা আধুনিক চাষাবাদ এবং e-NAM-এর মতো ডিজিটাল বাজার থেকে দূরে থাকেন। কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সরকারি পরিষেবাগুলোও মূলত পুরুষকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

৬. **সময়ের দারিদ্র্য (দ্বিমুখী বোঝা):** গ্রামীণ নারীদের "ডাবল ডে" বা দ্বিমুখী পরিশ্রম করতে হয়। তারা কৃষি কাজের পাশাপাশি প্রতিদিন গড়ে **৩৬০ মিনিট** ঘরের অবৈতনিক কাজ (রান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) করেন, যার ফলে তারা নতুন দক্ষতা শেখার বা বাজারে যাওয়ার সময় পান না।

নারী কৃষকদের জন্য প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

1. **নমো ড্রোন দিদি:** নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে **৮০% ড্রোন ভর্তুকি** (৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) প্রদানের মাধ্যমে তাদের আধুনিক "এগ্রি-উদ্যোক্তা" হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।
2. **লখপতি দিদি মিশন:** ২০২৯ সালের মধ্যে **৬ কোটি গ্রামীণ নারীকে** বার্ষিক অন্তত **১ লক্ষ টাকা** আয়ের স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
3. **কৃষি সখী প্রোগ্রাম (KSCP):** নারীদের **সার্টিফাইড প্যারা-এক্সটেনশন ওয়ার্কার** হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বার্ষিক ৬০,০০০–৮০,০০০ টাকা আয়ের পথ তৈরি করা।
4. **মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP):** প্রায় **৩.৫ কোটি নারীকে** জলবায়ু-সহনশীল প্রাকৃতিক চাষাবাদে দক্ষ করে তোলা।
5. **জেম (GeM)-এ ওম্যানিয়া:** নারী পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে সরাসরি সরকারি কেনাকাটার বাজারের সাথে যুক্ত করা, যেখানে ইতিমধ্যে **৮০,০০০ কোটি টাকার** ওপর ক্রয়াদেশ নিশ্চিত হয়েছে।
6. **লিঙ্গ ভিত্তিক বাজেট ও বরাদ্দ:** কৃষি প্রকল্পগুলোতে (RKVY/MIDH) **৩০% তহবিল** নারীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা এবং কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের (AIF) মাধ্যমে **৩% সুদে ছাড়** প্রদান।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **নারী কৃষকের স্বীকৃতি:** এম.এস. স্বামীনাথনের প্রস্তাবিত **২০১১ সালের নারী কৃষক এনটাইটেলমেন্ট বিল** অনুযায়ী, জমির মালিকানা নির্বিশেষে চাষের কাজের ভিত্তিতে নারীদের "কৃষক" হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া।

২. **জমির অধিকার শক্তিশালী করা:** নারীদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করলে **স্ট্যাম্প ডিউটি মকুব** (যেমন- ইউপি ও হরিয়ানা) এবং স্বামী-স্ত্রীর **যৌথ মালিকানা** উৎসাহিত করা।

৩. **ঋণ ও সম্পদের সহজলভ্যতা:** কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার জন্য **জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ (JLG)** মডেলকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া।

৪. **নারী-কেন্দ্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠান:** মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট কমাতে এবং e-NAM প্ল্যাটফর্মে দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে **নারী-পরিচালিত FPO** (কৃষক উৎপাদক সংস্থা) শক্তিশালী করা।

৫. **প্রযুক্তি ও পরিষেবা উন্নয়ন:** ICAR-এর মতো সংস্থাগুলোর উচিত নারীদের শারীরিক গঠন উপযোগী হালকা ও আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম (যেমন- পাওয়ার টিলার, উইডার) তৈরি করা।

৬. **পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি:** ভারতের পুষ্টি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় **শ্রী অন্ন (মিলেট)** চাষে নারীদের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগানো।

উপসংহার

ভূমি অধিকার এবং **এগ্রি-টেক** (Agri-Tech) এর মাধ্যমে নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন **বিকশিত ভারত @২০৪৭** স্বপ্নের জন্য অপরিহার্য। ২০২৬ সালে তাদের নেতৃত্বকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্তি একটি জলবায়ু-সহনশীল ও খাদ্য-সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

Q. "ভারতের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় নারী কৃষকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তবুও নীতি নির্ধারণ এবং জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তারা অনেকটা অদৃশ্যই থেকে গেছেন।" ভারতে নারী কৃষকদের প্রতিকূলতাগুলো পরীক্ষা করুন এবং তাদের ক্ষমতায়নের উপায় বাতলে দিন।

3.1.2. ভারতের আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ভূমিকা

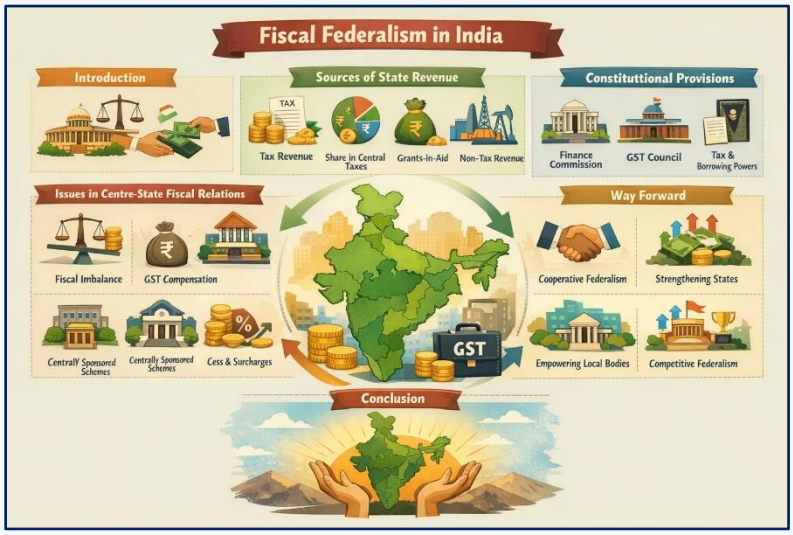

- **সংজ্ঞা:** আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা Fiscal Federalism হলো সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আয় (রাজস্ব) এবং ব্যয় কীভাবে বণ্টিত হবে তার একটি বিশেষ অধ্যয়ন।
- **প্রকৃতি:** ভারত একটি **আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federal)** আর্থিক কাঠামো অনুসরণ করে। যদিও কেন্দ্রের কাছে আয়ের অধিক স্থিতিস্থাপক উৎস (যেমন আয়কর, কর্পোরেট কর) রয়েছে, কিন্তু গ্রাউন্ড-লেভেল বা **তৃণমূল স্তরের ব্যয়ের** (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি) সিংহভাগ দায়িত্ব বহন করে রাজ্যগুলো।
- **মাসগ্রেভ-এর তিনটি কাজ:** এর লক্ষ্য হলো সম্পদের **বরাদ্দকরণ** (জনকল্যাণমূলক পরিষেবা), **বণ্টন** (সাম্য বজায় রাখা) এবং **স্থিতিশীলতা** (সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য) নিশ্চিত করা।

আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান

ভারতের আইনি কাঠামো মূলত সংবিধানের **দ্বাদশ খণ্ডে (অনুচ্ছেদ ২৬৮-২৯৩)** বর্ণিত আছে।

১. **কর আরোপের ক্ষমতার বিভাজন (ভিত্তি)**

- **অনুচ্ছেদ ২৪৬ (সপ্তম তফসিল):**
  - **কেন্দ্রীয় তালিকা (তালিকা-১):** আয়কর (কৃষি ব্যতীত), শুল্ক (Customs), কর্পোরেট কর এবং তামাক ও পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির ওপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ধার্য করার একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে।
  - **রাজ্য তালিকা (তালিকা-২):** ভূমি রাজস্ব, মদের ওপর রাজ্য আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং কৃষি আয়ের ওপর কর ধার্য করার একচেটিয়া ক্ষমতা রাজ্যের হাতে।
  - **যুগ্ম তালিকা (তালিকা-৩):** কর আরোপের ক্ষমতা খুবই সামান্য; মূলত নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে।
- **অনুচ্ছেদ ২৪৬A (১০১তম সংশোধনী):** এটি একটি **"বিশেষ বিধান"** যা সপ্তম তফসিলকে এড়িয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই একই লেনদেনের ওপর GST ধার্য করার অনুমতি দেয়।

২. **রাজস্ব বণ্টন (পদ্ধতি)**

- **অনুচ্ছেদ ২৬৮:** কেন্দ্র কর ধার্য করে কিন্তু রাজ্যগুলো তা সংগ্রহ ও ভোগ করে (যেমন- স্ট্যাম্প ডিউটি)।
- **অনুচ্ছেদ ২৬৯:** কেন্দ্র কর ধার্য ও সংগ্রহ করে কিন্তু তা রাজ্যগুলোকে অর্পণ করা হয় (যেমন- আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ওপর কর, যদিও এখন এটি মূলত IGST-র অন্তর্ভুক্ত)।
- **অনুচ্ছেদ ২৭০ (বিভাজ্য তহবিল):** সমস্ত কেন্দ্রীয় করের (সেস ও সারচার্জ বাদে) **"নিট লব্ধ অর্থ"** কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করা বাধ্যতামূলক।
  - **বর্তমান অবস্থা: ১৬তম অর্থ কমিশন** ২০২৬-৩১ সালের জন্য উল্লম্ব হস্তান্তরের (Vertical Devolution) হার **৪১%** বজায় রেখেছে।
- **অনুচ্ছেদ ২৭১:** কেন্দ্রের **সেস (Cess)** এবং **সারচার্জ (Surcharge)** ধার্য করার ক্ষমতা। এগুলি বিভাজ্য তহবিলের অংশ নয়, অর্থাৎ কেন্দ্র এই আয়ের ১০০% নিজের কাছে রাখে। এটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি প্রধান **বিরোধের জায়গা**।

৩. **আর্থিক অনুদান (ঘাটতি পূরণ)**

- **অনুচ্ছেদ ২৭৫ (বিধিবদ্ধ অনুদান):** অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রাজ্যগুলোকে বাধ্যতামূলক অনুদান দেওয়া হয়। এটি ভারতের **সঞ্চিত তহবিল** (Consolidated Fund of India) থেকে প্রদান করা হয়।
- **অনুচ্ছেদ ২৮২ (বিবেচনামূলক অনুদান):** কেন্দ্র বা রাজ্য যে কোনো "জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে" অনুদান দিতে পারে। বেশিরভাগ **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম** (CSS) এই অনুচ্ছেদের অধীনে অর্থায়ন করা হয়।
  - **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** ১৬তম অর্থ কমিশন এখন কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক অনুদানের (Performance-linked grants) দিকে ঝুঁকছে (যেমন- স্থানীয় সংস্থাগুলোর ২০% অনুদান এখন কাজের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল)।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ**

- **অনুচ্ছেদ ২৮০ (অর্থ কমিশন):** এটি একটি আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা যা প্রতি ৫ বছর অন্তর কর বণ্টনের সূত্র নির্ধারণের জন্য গঠিত হয়।
- **অনুচ্ছেদ ২৭৯A (GST কাউন্সিল):** যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এখানে সিদ্ধান্তের জন্য **৭৫% সংখ্যাগরিষ্ঠতা** প্রয়োজন, যেখানে কেন্দ্রের হাতে ১/৩ ভাগ এবং রাজ্যগুলোর হাতে ২/৩ ভাগ ভোটের ক্ষমতা থাকে।

৫. **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ঋণ গ্রহণ**

- **অনুচ্ছেদ ২৯২:** সংসদ নির্ধারিত সীমার মধ্যে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের জামানতে কেন্দ্রের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা।
- **অনুচ্ছেদ ২৯৩:** রাজ্যগুলোর ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা।
  - **সীমাবদ্ধতা:** যদি কোনো রাজ্যের কেন্দ্রের কাছে বকেয়া ঋণ থাকে, তবে কেন্দ্রের সম্মতি ছাড়া সেই রাজ্য নতুন ঋণ নিতে পারে না (**অনুচ্ছেদ ২৯৩(৩)**)।
  - **সাম্প্রতিক সংঘাত:** কেন্দ্র এই নিয়ম ব্যবহার করে রাজ্যের ঋণের সীমার মধ্যে **"অফ-বাজেট বোরোয়িং"** (বাজেট বহির্ভূত ঋণ)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা কেরালা সহ অনেক রাজ্য চ্যালেঞ্জ করেছে।

রাজ্যের আয়ের উৎস

১. **রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব** (SOTR)

রাজ্যের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **রাজ্য GST (SGST):** আয়ের একক বৃহত্তম উৎস। এটি রাজ্যের ভেতরে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের ওপর ধার্য করা করের অংশ।
- **রাজ্য আবগারি শুল্ক:** মূলত মানুষের পানের জন্য ব্যবহৃত মদ এবং মাদকদ্রব্যের ওপর ধার্য করা হয়।
- **পেট্রোলিয়ামের ওপর ভ্যাট** (VAT)**:** পেট্রোল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল GST-র বাইরে থাকায় রাজ্যগুলো এগুলোর ওপর ভ্যাট ধার্য করে।
- **স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি:** সম্পত্তি হস্তান্তর এবং আইনি নথিপত্রের ওপর ধার্য করা হয়।
- **যানবাহন কর:** মোটর যানবাহনের ওপর এককালীন বা বার্ষিক কর।
- **ভূমি রাজস্ব:** কৃষি জমির ওপর কর (ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এর অংশ কমেছে)।
- **বিদ্যুৎ শুল্ক:** বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিক্রির ওপর কর।

২. **রাজ্যের নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব**

এটি প্রায়ই অবহেলিত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে:

- **ব্যবহারকারী চার্জ** (User Charges)**:** সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবার ফি (যেমন- সেচ কর, সরকারি কলেজের টিউশন ফি, হাসপাতালের ফি)।

- **সুদ প্রাপ্তি:** রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (PSU) বা স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দেওয়া ঋণের ওপর অর্জিত সুদ।
- **লভ্যাংশ ও মুনাফা:** রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত আয়।
- **খনিজ রয়্যালটি:** খনিজ উত্তোলনের জন্য খনি সংস্থাগুলোর দেওয়া ফি (ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
- **লটারি:** কেরালা এবং সিকিমের মতো রাজ্যগুলোর জন্য এটি আয়ের বড় উৎস।

৩. **কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ**

- **কর হস্তান্তর (অনুচ্ছেদ ২৭০):** কেন্দ্রীয় করের (আয়কর, কর্পোরেট কর, CGST ইত্যাদি) **৪১%** অংশ রাজ্যগুলো পায়।
- **আর্থিক অনুদান (অনুচ্ছেদ ২৭৫):**
  - **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান:** কর হস্তান্তরের পরেও যে রাজ্যগুলো আর্থিক ঘাটতিতে থাকে, তাদের এটি দেওয়া হয়।
  - **স্থানীয় সংস্থা অনুদান:** পঞ্চায়েত এবং শহরতলি এলাকার (RLBs/ULBs) জন্য বরাদ্দ।
- **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম (CSS):** নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য (যেমন- জল জীবন মিশন, পিএম-কিষাণ) অনুচ্ছেদ ২৮২-এর অধীনে অর্থ পাঠানো হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের সমস্যাগুলো

১. **উল্লম্ব আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (Vertical Fiscal Imbalance):** কেন্দ্র মোট রাজস্বের প্রায় **৬০%** সংগ্রহ করে, কিন্তু রাজ্যগুলোকে মোট জনব্যয়ের **৬০%** সম্পন্ন করতে হয়। এটি রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

২. **সেস (Cess) এবং সারচার্জের বৃদ্ধি: অনুচ্ছেদ ২৭১**-এর অধীনে, কেন্দ্র বিভিন্ন সেস (যেমন—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস) ধার্য করে যা রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না। এটি কার্যত **"বিভাজ্য তহবিল" (Divisible Pool)** কমিয়ে দিয়েছে।

- **দ্রষ্টব্য:** ১৬তম অর্থ কমিশন সম্প্রতি একটি **"গ্র্যান্ড বারগেন" (Grand Bargain)** বা বড় চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে সেসগুলোকে যদি সাধারণ তহবিলে যুক্ত করা হয়, তবে রাজ্যগুলো কর হস্তান্তরের শতাংশ কিছুটা কমাতে রাজি হতে পারে।

৩. **স্বায়ত্তশাসনের ক্ষয় (GST): "এক দেশ, এক কর"** ব্যবস্থা অধিকাংশ পণ্যের ওপর করের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা রাজ্যগুলোর থেকে কেড়ে নিয়েছে, যার ফলে তারা কেন্দ্রের **"পেনশনভোগী"**-তে পরিণত হয়েছে।

৪. **ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা (অনুচ্ছেদ ২৯৩):** কেন্দ্র একটি **নিট ঋণের সীমা (Net Borrowing Ceiling - NBC)** আরোপ করে। কেরালা সহ অনেক রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, এই যুক্তিতে যে এটি তাদের নিজস্ব অর্থ ব্যবস্থাপনার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

৫. **কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম (CSS):** রাজ্যগুলোর মতে, এই স্কিমগুলো (যেমন—MGNREGA বা আয়ুষ্মান ভারত) সবার জন্য একই রকম বা **"One-size-fits-all"**। এটি রাজ্যগুলোকে তাদের সীমিত সম্পদ কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকারের কাজে ব্যয় করতে বাধ্য করে, যেখানে প্রায়ই **৬০:৪০** বা **৯০:১০** অনুপাতে অর্থায়ন করতে হয়।

ভবিষ্যৎ পথ: আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

১. **সেস নিরপেক্ষকরণ (Cess Neutralization):** প্রধান সেসগুলোকে বিভাজ্য তহবিলের সাথে যুক্ত করে একটি **"বড় চুক্তি"** বাস্তবায়ন করা। এটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং মোট কর রাজস্বে রাজ্যগুলোর ভাগ কমে যাওয়া রোধ করবে।

২. **GST ২.০ সংস্কার:** একটি সহজতর **দ্বি-স্তরীয় কর কাঠামো** (যেমন—৫% এবং ১৮%) প্রবর্তন করা এবং পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎকে GST-র আওতায় আনার একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা, যাতে উৎপাদন খরচ কমে এবং রাজস্বের ভিত্তি প্রশস্ত হয়।

৩. **সর্বনিম্ন রাজস্বের নিশ্চয়তা (Revenue Floor Guarantee):** দক্ষতা-ভিত্তিক মানদণ্ডের (যেমন—GDP-তে অবদান) কারণে তৈরি হওয়া **"উত্তর-দক্ষিণ"** বিভেদ কমাতে কেন্দ্রের উচিত নিশ্চিত করা যে, পরিবর্তনের সময়ে কোনো রাজ্যের প্রকৃত রাজস্ব পূর্ববর্তী স্তরের নিচে নামবে না।

৪. **স্থানীয় সংস্থার ক্ষমতায়ন:** পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলোর জন্য **"অনুদান-নির্ভরতা"** কমিয়ে **"আর্থিক স্বায়ত্তশাসন"**-এর ওপর জোর দেওয়া। স্থানীয় সম্পত্তি কর সংগ্রহ বাড়াতে রাজ্যগুলোকে অবশ্যই **রাজ্য অর্থ কমিশন** (SFC)-এর রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. **ফ্লেক্সি-সিএসএস মডেল** (Flexi-CSS Model): কঠোর কেন্দ্রীয় স্কিমগুলোর পরিবর্তে **"ফলাফল-ভিত্তিক নির্দিষ্ট অনুদান"** চালু করা। এটি রাজ্যগুলোকে স্থানীয় ভৌগোলিক এবং জনতাত্ত্বিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো সাজানোর নমনীয়তা দেবে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক ঐকমত্য:** ঋণ সীমা এবং বাজেট বহির্ভূত দায় নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (অনুচ্ছেদ ২৬৩)**-কে পুনরুজ্জীবিত করা। এর ফলে আর্থিক দ্বন্দ্বগুলো বিচারবিভাগের পরিবর্তে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

ভারতের আর্থিক কাঠামোকে **"কেন্দ্রীভূত সমন্বয়"** থেকে **"ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্বে"** রূপান্তর করতে হবে। ১৬তম অর্থ কমিশনের দক্ষতা-ভিত্তিক মানদণ্ডকে কাজে লাগিয়ে এবং সেসগুলোকে মূল তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি আর্থিকভাবে স্থিতিস্থাপক **"বিকশিত ভারত"** গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?

3.1.3. ভারতের জন্য টেকসই জ্বালানি

ভূমিকা

টেকসই শক্তি বলতে এমন শক্তিকে বোঝায় যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করে না। এটি একই সাথে **জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা** এবং **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করে।

টেকসই শক্তির মূল নীতিসমূহ

(ক) **পরিবেশগত স্থায়িত্ব:** শক্তি উৎপাদন এমনভাবে হতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি এবং **কার্বন নিঃসরণ** সর্বনিম্ন হয়।

(খ) **জ্বালানি নিরাপত্তা:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন এবং **নির্ভরযোগ্য সরবরাহ** নিশ্চিত করা।

(গ) **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব:** শক্তি ব্যবস্থা অবশ্যই সাশ্রয়ী হতে হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে হবে।

(ঘ) **সামাজিক ন্যায়বিচার:** সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে শক্তির **সহজলভ্যতা** এবং **সাশ্রয়ী মূল্য** নিশ্চিত করা।

কেন ভারতের জন্য টেকসই শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

১. **অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা (আমদানি বিল সংকট)**

- **আর্থিক স্থিতিশীলতা:** ভারত প্রতি বছর অপরিশোধিত তেল আমদানিতে **১৬০ বিলিয়ন ডলারের** বেশি খরচ করে। বৈদেশিক মুদ্রার এই বিশাল ব্যয় সরাসরি ভারতীয় **টাকার মূল্যের** ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** তেলের উচ্চমূল্য **"আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি"** সৃষ্টি করে, যা খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু টেকসই শক্তি (সৌর/বায়ু) উৎপাদনে কোনো জ্বালানি খরচ নেই, যা দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন**

- **"হরমুজ" প্রণালীর ঝুঁকি:** ভারতের মোট তেলের ৬০% আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। পারস্য উপসাগরে কোনো যুদ্ধ বা উত্তেজনা দেখা দিলে তা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে **পঙ্গু** করে দিতে পারে।
- **কৌশলগত স্বাধীনতা:** নবায়নযোগ্য শক্তি এবং **গ্রিন হাইড্রোজেন** ব্যবহার করে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে ভারতের জ্বালানি নির্ভরতা কমবে। এর ফলে ভারত কোনো প্রকার **জ্বালানি ব্ল্যাকমেইল** বা চাপের মুখে না পড়ে একটি নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বজায় রাখতে পারবে।

৩. **পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত বাধ্যবাধকতা**

- **বায়ুর গুণমান:** বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৪টিই ভারতে অবস্থিত। কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরে আসলে PM2.5-এর মাত্রা কমবে, যা স্বাস্থ্যসেবা খাতে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করবে।
- **জলবায়ু নেতৃত্ব:** বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম CO_2 **নিঃসরণকারী** দেশ হিসেবে, ২০৭০ সালের মধ্যে **"নেট জিরো"** লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা ভারতের বৈশ্বিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি ইউরোপ বা আমেরিকার মতো দেশগুলোর আরোপিত **"কার্বন বর্ডার ট্যাক্স"** এড়াতেও সাহায্য করবে।

৪. **"জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ" এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

- **সবুজ কর্মসংস্থান (Green Jobs):** জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অনেক বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের এই খাতে উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মিলিয়ে প্রায় **৩৪ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান** সৃষ্টি হতে পারে।
- **গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন:** বিকেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প (PM-KUSUM) কৃষকদের **"উর্জাদাতা"** বা শক্তি সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তুলছে, যা গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

ভারতে টেকসই শক্তির প্রধান উৎসসমূহ

১. *সৌর শক্তি (শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা)*

ভারতের পরিবেশবান্ধব জ্বালানি পরিবর্তনের প্রধান স্তম্ভ হলো সৌর শক্তি। জাপানকে পেছনে ফেলে ভারত বর্তমানে বিশ্বের **তৃতীয় বৃহত্তম সৌর শক্তি উৎপাদনকারী** দেশ।

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ১৪৩.৬ গিগাওয়াট (GW)।
- **মাটিতে স্থাপিত প্রকল্প:** প্রায় ১০৯.৫ গিগাওয়াট। গুজরাটের **খাবড়া (Khavda)** পার্কের মতো বিশাল প্রকল্পগুলো এর নেতৃত্বে রয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তি অঞ্চল হতে চলেছে।
- **ছাদ ভিত্তিক সৌর প্রকল্প (Rooftop Solar):** এর ক্ষমতা প্রায় ২৫ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনার** মাধ্যমে ১ কোটি বাড়িতে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্য এই গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
- **ভাসমান সৌর প্রকল্প (Floating Solar):** জমি বাঁচাতে এবং জলের বাষ্পীভবন কমাতে জলাধারগুলোতে (যেমন- ওমকারেশ্বর বাঁধ) এই প্রকল্প বাড়ানো হচ্ছে।

২. *গ্রিন হাইড্রোজেন (কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের হাতিয়ার)*

- **উৎপাদন অবস্থা:** উৎপাদন খরচ প্রতি কেজিতে **৪ ডলারের নিচে** নেমে এসেছে।
- **কৌশলগত হাব:** ভারতের তিনটি বন্দরকে "গ্রিন হাইড্রোজেন হাব" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে: **কাণ্ডলা (গুজরাট), তুতিকোরিন (তামিলনাড়ু) এবং পারাদীপ (ওড়িশা)**।
- **UPSC ফ্যাক্ট:** আমদানিকৃত গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত ইস্পাত এবং সার কারখানার মতো ভারী শিল্পগুলোতে গ্রিন হাইড্রোজেন ব্যবহার করছে।

৩. *বায়ু শক্তি (স্থলভাগ ও উপকূলীয়)*

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ৫৪ গিগাওয়াট (স্থলভাগে)।
- **উপকূলীয় অগ্রগতি:** ভিজিএফ (VGF) প্রকল্পের অধীনে গুজরাট এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে প্রথম ১ গিগাওয়াট অফশোর বা উপকূলীয় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।
- **হাইব্রিডাইজেশন:** গ্রিডে ২৪ ঘণ্টা স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এখন **"সৌর-বায়ু হাইব্রিড"** প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

৪. *পারমাণবিক শক্তি (ভিত্তিগত শক্তির স্তম্ভ)*

২০২৫ সালের **শান্তি (SHANTI) আইনের** অধীনে ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই খাতে সীমিত বেসরকারি অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

- **বর্তমান ক্ষমতা:** প্রায় ৮.৮ গিগাওয়াট।
- **ভারত স্মল রিঅ্যাক্টর (BSR):** ২২০ মেগাওয়াটের দেশীয় রিঅ্যাক্টরগুলো ভারী শিল্পের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- SMR-55: ভারতের প্রথম বিশেষায়িত ৫৫ মেগাওয়াট **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR)** বর্তমানে নির্মাণাধীন, যা বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ব্যবহারের জন্য তৈরি।

৫. *বায়ো-এনার্জি ও বৃত্তাকার অর্থনীতি*

- **ইথানল মিশ্রণ:** ২০২৫ সালে পেট্রোলে **২০% ইথানল মিশ্রণ (E20)** অর্জিত হয়েছে। এখন নির্দিষ্ট কিছু শহরে বিশুদ্ধ ইথানল (E100) চালিত যানবাহনের পরীক্ষা চলছে।
- **কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG):** খড় বা কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহার করে গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে, যা রান্নার গ্যাসের (LPG) আমদানি বিল এবং দূষণ উভয়ই কমাবে।

প্রধান সরকারি নীতি ও উদ্যোগসমূহ

১. **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর: মুফ্ত বিজলি যোজনা (২০২৪-২০২৭):** বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করা।

২. **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন (NGHM):** ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য।

৩. **শান্তি (SHANTI) আইন, ২০২৫:** পারমাণবিক শক্তিতে সরকারি একচেটিয়া আধিপত্য শেষ করে বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং SMR প্রযুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

৪. **পিএম-কুসুম (PM-KUSUM):** কৃষিক্ষেত্রে ডিজেলের ব্যবহার বন্ধ করে সৌর পাম্প সরবরাহ করা এবং কৃষকদের **"উর্জাদাতা"** হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. **পিএম ই-ড্রাইভ (PM e-DRIVE) প্রকল্প (২০২৪-২০২৮):** ইলেকট্রিক গাড়ি (২-হুইলার, ৩-হুইলার, ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স) এবং চার্জিং নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত করা।

৬. **জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতি (২০২২ সংশোধনী):** ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে পেট্রোলে ২০% ইথানল মিশ্রণ নিশ্চিত করা।

টেকসই শক্তি অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **সঞ্চয় পরিকাঠামোর অভাব:** দিনের বেলার অতিরিক্ত সৌর শক্তি রাতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় **ব্যাটারি (BESS)** এবং **পাম্পড হাইড্রো** স্টোরেজের অভাব রয়েছে।
- **খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভরতা:** ব্যাটারি এবং সোলার প্যানেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় **লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ** উপাদানের জন্য ভারত বিদেশের ওপর নির্ভরশীল।

- **অধিক মূলধনী খরচ:** এই প্রকল্পগুলোতে শুরুতে অনেক বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় এবং উচ্চ সুদের হারের কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।
- **ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিরোধ:** সৌর ও বায়ু খামারের জন্য বিশাল জমির প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় কৃষিজমি বা জীববৈচিত্র্যের (যেমন- গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড পাখি) সাথে সংঘর্ষ তৈরি করে।
- **বিদ্যুৎ সঞ্চালন সমস্যা:** বেশিরভাগ সবুজ শক্তি পশ্চিম ভারতে (রাজস্থান/গুজরাট) উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা সারাদেশে পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত **গ্রিন এনার্জি করিডোর** এখনও তৈরি হয়নি।
- **ডিসকম (DISCOM)-এর আর্থিক অবস্থা:** সরকারি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো ঋণে ডুবে থাকায় তারা নতুন গ্রিন এনার্জি চুক্তিতে উৎসাহ পায় না।
- **প্রযুক্তির জন্য আমদানি নির্ভরতা:** "মেক ইন ইন্ডিয়া" সত্ত্বেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেল এবং হাইড্রোজেনের যন্ত্রাংশের জন্য এখনও আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সমন্বিত স্টোরেজ নীতি:** সৌর ও বায়ু শক্তির অস্থিরতা সামলাতে পাম্পড হাইড্রো এবং ব্যাটারি স্টোরেজ দ্রুত চালু করা।
- **খনিজ নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব:** লিথিয়াম ও কোবাল্টের দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ নিশ্চিত করতে KABIL-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে বিদেশের সাথে খনিজ চুক্তি করা।
- **গ্রিন হাইড্রোজেনের প্রসার:** ইস্পাত ও সিমেন্টের মতো ভারী শিল্পে গ্রিন হাইড্রোজেনের ব্যবহার পরীক্ষামূলক স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে নিয়ে যাওয়া।
- **গ্রিড আধুনিকীকরণ:** স্মার্ট গ্রিড এবং গ্রিন এনার্জি করিডোর সম্পন্ন করা যাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নষ্ট না হয়।
- **দেশীয় উৎপাদনে উৎসাহ: পিএলআই (PLI)** স্কিমের মাধ্যমে ভারতে উন্নত সোলার সেল এবং হাইড্রোজেনের যন্ত্রাংশ তৈরিতে জোর দেওয়া।
- **কৃষির সাথে সমন্বয়:** কৃষিজমির ওপর সোলার প্যানেল বসিয়ে একই জমি থেকে বিদ্যুৎ ও ফসল উভয়ই পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

ভারতকে জ্বালানি নির্ভরতা থেকে **জ্বালানি সার্বভৌমত্বের** দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গ্রিন হাইড্রোজেন, ছোট পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর (SMR) এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি স্থিতিশীল ও 'নেট-জিরো' ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই হবে মূল লক্ষ্য, যা দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব রাজনীতির তেলের দামের ওঠা-নামা থেকে রক্ষা করবে।

Q. In light of rising geopolitical tensions affecting global oil supply, evaluate the role of sustainable energy in strengthening India's energy security.

3.1.4. ভারতে শ্রম সংস্কার: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিশ্রুতি বনাম কাঠামোগত বাস্তবতা

প্রেক্ষাপট

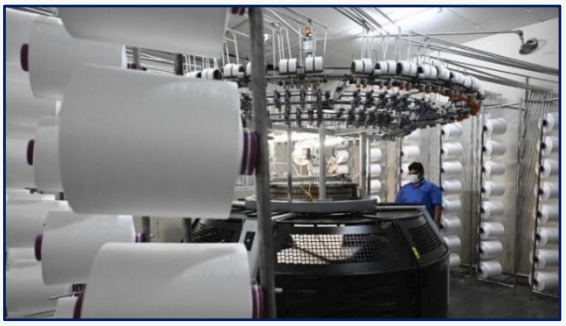

- **শ্রম বিধির একত্রীকরণ:** ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে **চারটি ব্যাপক শ্রম বিধিতে (Labour Codes)** একত্রীকরণ করা এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে এর খসড়া বিধি চূড়ান্ত করা ভারতের শ্রম নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর একটি **আমূল পরিবর্তন (Paradigm Shift)** নির্দেশ করে।
- **সম্ভাবনা বনাম চ্যালেঞ্জ:** যদিও **অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬** এই সংস্কারগুলোকে আনুষ্ঠানিকীকরণ (Formalization) এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের অনুঘটক হিসেবে দেখছে, তবুও গভীর **কাঠামোগত অনানুষ্ঠানিকতা** এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তিত ধরণ এই আশাবাদী লক্ষ্য অর্জনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পটভূমি: সাংবিধানিক ভিত্তি এবং শ্রম আইনের কাঠামোগত রূপান্তর

ভারতের শ্রম শাসনের বিবর্তন একটি খণ্ডিত ও প্রাচীন আইনি ব্যবস্থা থেকে একটি সমন্বিত ও আধুনিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দিকে রূপান্তরকে নির্দেশ করে। এই পরিবর্তন ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বিচারবিভাগীয় নির্দেশনার গভীরে প্রোথিত।

ক. শ্রম অধিকারের সাংবিধানিক এবং বিচারবিভাগীয় ভিত্তি

শ্রম কল্যাণ কেবল একটি নীতিগত লক্ষ্য নয়, বরং ভারতের সংবিধানের অধীনে একটি **মৌলিক আদেশ**।

১. **মৌলিক অধিকার (অংশ III):**

- **অনুচ্ছেদ ১৪:** আইনের চোখে **সমতা** নিশ্চিত করে, যা বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য রোধ করে।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ):** সমিতি বা **শ্রমিক ইউনিয়ন** গঠন করার অধিকার নিশ্চিত করে, যা যৌথ দরকষাকষির (Collective Bargaining) জন্য অপরিহার্য।
- **অনুচ্ছেদ ২১:** সুপ্রিম কোর্ট এই অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করে **জীবিকার অধিকারকে (Right to Livelihood)** জীবনের অধিকারের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- **অনুচ্ছেদ ২৩: বেগার শ্রম** এবং মানব পাচার নিষিদ্ধ করে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করে।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (DPSP - অংশ IV):**

- **অনুচ্ছেদ ৩৮:** সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি **সামাজিক শৃঙ্খলা** প্রচারের নির্দেশ দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৩৯(ঘ):** পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য **সমকাজে সমমজুরি** নিশ্চিত করার কথা বলে।
- **অনুচ্ছেদ ৪১:** বেকারত্ব বা বার্ধক্যের ক্ষেত্রে **কাজের অধিকার** এবং সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়।
- **অনুচ্ছেদ ৪৩:** শ্রমিকদের জন্য **জীবনধারণের মজুরি (Living Wages)** এবং একটি সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতকারী কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে।

৩. **বিচারবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ রায়:**

- **ওলগা টেলিস বনাম বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন:** আদালত রায় দেয় যে জীবনের অধিকারের মধ্যে **জীবনধারণের উপায়ের অধিকারও** অন্তর্ভুক্ত।
- **রণধীর সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন:** প্রতিষ্ঠিত করে যে **"সমকাজে সমমজুরি"** একটি সাংবিধানিক লক্ষ্য।
- **বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত ইউনিয়ন:** শ্রমিক শ্রেণীর জন্য **মানবিক মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকারের** ওপর গুরুত্বারোপ করে।

খ. শ্রম আইনের একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

জটিল আইনি বাধ্যবাধকতা হ্রাস এবং আইনি অস্পষ্টতা দূর করতে ভারত সরকার ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে চারটি বিধিবদ্ধ কোডে বা বিধিতে রূপান্তর করেছে। এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো **শিল্পের উৎপাদনশীলতা** এবং **শ্রমিক সুরক্ষার** মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।

১. **মজুরি বিধি (Code on Wages, ২০১৯):** মজুরির সংজ্ঞাকে সরলীকরণ করে এবং সেক্টর নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর জন্য **ন্যূনতম মজুরি** ও সময়মতো মজুরি প্রদানকে সার্বজনীন করে।

২. **শিল্প সম্পর্ক বিধি (Industrial Relations Code, ২০২০):স্থায়ী-মেয়াদী কর্মসংস্থান (Fixed-Term Employment - FTE)** প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমবাজারের নমনীয়তা বৃদ্ধি করে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই ও লে-অফের সীমা (Threshold) বৃদ্ধি করে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (Code on Social Security, ২০২০):** সামাজিক সুরক্ষার আওতাকে বিস্তৃত করে, বিশেষ করে **গিগ ওয়ার্কার (Gig Workers)** এবং **প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কারদের** অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

৪. **পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ বিধি (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, ২০২০):** কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের মানদণ্ডগুলোকে একীভূত করে, বিশেষ করে একাধিক রাজ্যে ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আইনি জটিলতা হ্রাস করে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬: শ্রমবাজার রূপান্তরের কৌশলগত প্রক্ষেপণ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ ভারতের শ্রমবাজারের জন্য একটি আশাবাদী রূপরেখা উপস্থাপন করেছে। সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, **নিয়ন্ত্রক জটিলতা** (Regulatory Complexity) হ্রাস করার ফলে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের একটি **"শুভ চক্র"** (Virtuous Cycle) ত্বরান্বিত হবে। **২৯টি আইনকে** চারটি কোড বা বিধিতে সংকুচিত করার মাধ্যমে সরকার নিম্নলিখিত কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে:

১. **আনুষ্ঠানিকীকরণের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য**

সমীক্ষাটি **আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে** (Formal Employment) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা বর্তমানে **৬০.৪% থেকে বেড়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৭৫.৫%-এ** পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- এই রূপান্তরটি মূলত **স্থায়ী-মেয়াদী কর্মসংস্থান** (Fixed-Term Employment - FTE)-এর আইনি স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেয়, পাশাপাশি কর্মীদের **গ্র্যাচুইটি** (Gratuity) এবং **নিয়োগপত্র** (Appointment Letters)-এর মতো আনুষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টির লভ্যাংশ**

সরলীকৃত কমপ্লায়েন্স (Simplified Compliance), যেমন—**সিঙ্গল-উইন্ডো লাইসেন্সিং** (Single-window Licensing) এবং সহজতর প্রবেশ ও প্রস্থান নীতি (Easy entry-exit norms), প্রায় **৭৭ লক্ষ কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

- অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, ব্যবসাগুলো যখন কম প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হয়, তখন তারা তাদের কার্যক্রম এবং **পেরোল** (Payrolls) বা কর্মী তালিকা সম্প্রসারণে বেশি আগ্রহী হয়।

৩. **নারী অংশগ্রহণের প্রসার**

শ্রম সংস্কারের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো **নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হারে** (Female LFPR) বৈপ্লবিক বৃদ্ধি, যা **২০১৭-১৮ সালের ২৩.৩% থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪১.৭%-এ** দাঁড়িয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি নিম্নলিখিত **লিঙ্গ-সংবেদনশীল** (Gender-responsive) বিধানগুলোর দ্বারা সমর্থিত:

- বাধ্যতামূলক সুরক্ষা প্রোটোকল নিশ্চিত করে নারীদের জন্য **নাইট শিফট বা নৈশকালীন কাজের** আইনি অনুমতি।
- **ক্রেশ বা শিশুপালন কেন্দ্রের** (Creche facilities) বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এবং বর্ধিত **মাতৃত্বকালীন সুবিধা** (Maternity Benefits)।
- ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধিবদ্ধ বাধাগুলো অপসারণ।

৪. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সুশাসন**

এই সংস্কারগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন **২০২৯-৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে** (GDP) অতিরিক্ত **১.২৫% অবদান** রাখবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

- এই প্রবৃদ্ধি একটি শাস্তিমূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা থেকে **"ইন্সপেক্টর-কাম-ফ্যাসিলিটেটর"** (Inspector-cum-Facilitator) মডেলে স্থানান্তরের মাধ্যমে সহজতর হবে।
- এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রথাগত মামলা-মোকদ্দমার পরিবর্তে **প্রশাসনিক নির্দেশনা** (Administrative Guidance), **ডিজিটাল স্বচ্ছতা** (Digital Transparency) এবং সহযোগিতামূলক কমপ্লায়েন্সকে অগ্রাধিকার দেয়।

৫. **উন্নত দক্ষতা উন্নয়ন**

- **জাতীয় শিক্ষানবিশ প্রবর্তনা যোজনা** (NAPS) এবং শিল্প-সংলগ্ন প্রশিক্ষণের সমন্বয় ঘটিয়ে এই সংস্কারগুলো **দক্ষতার ঘাটতি** (Skill Gap) দূর করার লক্ষ্য রাখে।
- **স্কিল ইমপ্যাক্ট বন্ড** (Skill Impact Bonds) এবং বৃত্তির জন্য **সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর** (Direct Benefit Transfer - DBT)-এর মতো টুলগুলো অর্থায়নকে সরাসরি যাচাইকৃত কর্মসংস্থানের ফলাফলের সাথে যুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

শ্রম বিধি বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ

ভারতের শ্রম সংস্কারের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, বেশ কিছু **কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা** (Structural Constraints), শ্রমবাজারের বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এই শ্রম বিধিগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। যদিও এই সংস্কারগুলোর লক্ষ্য হলো **আনুষ্ঠানিকীকরণ** (Formalisation), শ্রমের নমনীয়তা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, তবুও **অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের** (Informal Employment) আধিপত্য এবং দুর্বল প্রয়োগ ব্যবস্থা এদের প্রকৃত প্রভাবকে সীমিত করতে পারে।

১. **স্থায়ী উচ্চ অনানুষ্ঠানিকতা** (Persistently High Informality)

- ভারতের শ্রমশক্তির **৮০%-এরও বেশি** অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত, যাদের প্রায়ই কোনো লিখিত চুক্তি, **চাকরির নিরাপত্তা** (Job Security), সামাজিক সুরক্ষা এবং শ্রম অধিকার থাকে না।
- এই শ্রমিকদের একটি বড় অংশ শ্রম বিধির বিভিন্ন বিধানসহ শ্রম নিয়ন্ত্রণের কার্যকর আওতার বাইরে থেকে যায়।
- ফলস্বরূপ, শ্রম সংস্কার কেবল শ্রমশক্তির একটি সীমিত অংশকে উপকৃত করতে পারে, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ **অনিশ্চিত কর্মসংস্থানে** (Precarious Employment) থেকে যায়।

২. **ক্রমবর্ধমান চুক্তিবদ্ধকরণ এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের হ্রাস**

- সংগঠিত খাতের মধ্যেও স্থায়ী কর্মসংস্থান থেকে **চুক্তিভিত্তিক** (Contractual) এবং ক্যাজুয়াল শ্রমের দিকে ঝোঁক বাড়ছে।
- কারখানায় সরাসরি কর্মসংস্থান ২০১১ সালের ৬১% থেকে কমে ২০২৩ সালে ৪৭%-এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক বেড়ে দাঁড়িয়েছে কারখানার শ্রমশক্তির প্রায় ৪২%।
- ২০২৪ সালে, কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগগুলোতে (CPSEs) নিয়মিত কর্মসংস্থান প্রায় ৩০,০০০ কমেছে, যাদের অনেককেই ক্যাজুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- এই বিধির অধীনে শ্রমবাজারের অধিকতর **নমনীয়তা** (Flexibility) সংস্থাগুলোকে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে অস্থায়ী বা **স্থায়ী-মেয়াদী** (Fixed-term) নিয়োগের দিকে আরও উৎসাহিত করতে পারে।

৩. **উচ্চতর নিয়ন্ত্রক সীমা এবং "আনুষ্ঠানিকীকরণের বিভ্রম"**

- শ্রম বিধিগুলোতে বেশ কিছু **নিয়ন্ত্রক সীমা** (Regulatory Thresholds) বাড়ানো হয়েছে, যা শ্রম সুরক্ষার আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে।
    - **পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য** (OSH) **বিধি**-র অধীনে কারখানার সংজ্ঞা বাড়িয়ে ২০ জন শ্রমিক (বিদ্যুৎসহ) এবং ৪০ জন শ্রমিক (বিদ্যুৎহীন) করা হয়েছে।
    - চুক্তিভিত্তিক শ্রমের সীমা ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ জন শ্রমিক করা হয়েছে।
    - ছাঁটাই এবং লে-অফের জন্য সরকারি অনুমোদনের সীমা ১০০-র পরিবর্তে এখন কেবল ৩০০-র বেশি শ্রমিক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

- যদিও এই পরিবর্তনগুলো **কমপ্লায়েন্স বা আইনি বাধ্যবাধকতার বোঝা** (Compliance Burden) কমায়, তবে এটি অনেক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে, যা চাকরির গুণমান বা নিরাপত্তার উন্নতির পরিবর্তে পরিসংখ্যানে একটি **"আনুষ্ঠানিকীকরণের বিভ্রম"** (Formalisation Illusion) তৈরি করতে পারে।

৪. **স্থায়ী-মেয়াদী কর্মসংস্থানের (FTE) প্রসার**

- শ্রম বিধিগুলো **স্থায়ী-মেয়াদী কর্মসংস্থানকে** (Fixed-Term Employment) স্বীকৃতি দেয়, যা সংস্থাগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেয়।
- কর্মীরা নিয়োগপত্র, সমান মজুরি এবং এক বছর পর **গ্র্যাচুইটি** (Gratuity) সহ নির্দিষ্ট সুবিধা পায়।
- তবে, FTE চাকরির নিরাপত্তা, স্থিতিশীল আয় এবং **যৌথ দরকষাকষির ক্ষমতাকে** (Collective Bargaining Power) দুর্বল করতে পারে, যা আনুষ্ঠানিক চাকরিকেও অস্থায়ী ও অনিশ্চিত করে তোলে।

৫. **গিগ ওয়ার্কার কল্যাণে অস্পষ্টতা**

- সামাজিক নিরাপত্তা বিধি **গিগ ওয়ার্কারদের** (Gig Workers) জন্য কল্যাণের বিধান রেখেছে (যারা রাইড-হেলিং বা খাবার ডেলিভারির মতো প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক বা অ্যাপ-নির্ভর কাজে নিযুক্ত)।
- প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলোকে তাদের বার্ষিক টার্নওভারের **১-২%** গিগ ওয়ার্কার কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে হবে।
- তবে, তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি, সুবিধার পরিধি, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এখনও অস্পষ্টতা রয়েছে, যা এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

৬. **পুনঃদক্ষতা (Reskilling) কাঠামোয় অনিশ্চয়তা**

- শ্রম বিধিগুলোতে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য একটি **পুনঃদক্ষতা তহবিলের** (Reskilling Fund) প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে নিয়োগকর্তাদের প্রতি শ্রমিকের ১৫ দিনের মজুরি জমা দিতে হবে।
- তবে, এই তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ফলাফলের তদারকি সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে, যা এই উদ্যোগের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে।

৭. **মজুরি নির্ধারণে স্পষ্টতার অভাব**

- মজুরি বিধি **জাতীয় ফ্লোর মজুরি** (National Floor Wage) এবং **জাতীয় ন্যূনতম মজুরি** (National Minimum Wage)-র ধারণা প্রবর্তন করেছে।
- তবে, এই মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি, রাজ্যগুলোর মজুরির সাথে সমন্বয় এবং সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে, যা রাজ্যগুলোর মধ্যে নীতিগত অসঙ্গতি তৈরি করতে পারে।

৮. **শ্রম প্রয়োগ ব্যবস্থার দুর্বলতা**

- শ্রম পরিদর্শকদের পদবি পরিবর্তন করে **"ইন্সপেক্টর-কাম-ফ্যাসিলিটেটর"** করা হয়েছে, যাদের মূল কাজ হবে কঠোর প্রয়োগের পরিবর্তে নির্দেশনা প্রদান।
- নিয়োগকর্তারা জরিমানা দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু লঙ্ঘন সংশোধন (Compound) করতে পারবেন, যা জরিমানার পরিমাণ কম হলে আইন ভাঙার প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।
- দুর্বল ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব রয়েছে এমন ক্ষেত্রে, পরিদর্শনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় **জবাবদিহিতা** (Accountability) সীমিত হতে পারে।

আগামীর পথ: অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রম শাসনের দিকে

শ্রম সংস্কার যাতে ন্যায়বিচার এবং প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে, তার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত পদক্ষেপ প্রয়োজন:

- **সামাজিক নিরাপত্তার সার্বজনীন বহনযোগ্যতা** (Portability): **ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর** (UAN)-কে সম্পূর্ণ সচল করা যাতে শ্রমিক যে কোনো সেক্টর বা রাজ্যে কাজ করুক না কেন, তার সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাগুলো বজায় থাকে।

- **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক মজুরি নির্ধারণ:** জাতীয় ন্যূনতম মজুরির জন্য একটি স্পষ্ট, **মুদ্রাস্ফীতি-সংযুক্ত** (Inflation-indexed) পদ্ধতি তৈরি করা।
- **সেবা অর্থনীতিকে** (Care Economy) **প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (LFPR) বজায় রাখতে **অঙ্গনওয়াড়ি ও ক্রেশ (শিশুপালন কেন্দ্র)**-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো খাত হিসেবে বিবেচনা করা।
- **প্রয়োগের জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা:** প্রযুক্তিনির্ভর এবং **র‍্যান্ডমাইজড** (Randomized) **পরিদর্শন** ব্যবস্থার মাধ্যমে 'ফ্যাসিলিটেটর' মডেলকে শক্তিশালী করা।
- **দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনঃদক্ষতা বৃদ্ধি:** অটোমেশন বা ছাঁটাই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য STEM **(বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত)** শিক্ষা এবং **'ব্যাক টু ওয়ার্ক'** বা **'রিটার্নশিপ'** প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুনঃপ্রবেশ নিশ্চিত করা।

উপসংহার

শ্রম বিধিগুলো একটি উচ্চাভিলাষী অর্থনীতির রূপরেখা প্রদান করে। তবে, অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এর সাফল্য নির্ভর করবে সংস্থাগুলোর জন্য **"নমনীয়তা"** (Flexibility) এবং ভারতের শ্রমশক্তির জন্য **সামাজিক-অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা** (Resilience) ও **শ্রমের মর্যাদা** (Dignity of Labor)-র মধ্যে সঠিক ভারসাম্যের ওপর।

Q. শ্রম সংস্কারের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রয়োজন। ভারতের বিদ্যমান শ্রমবাজারের বাস্তবতার নিরিখে বিবৃতিটি মূল্যায়ন করুন।

3.1.5. ভারতের জিডিপি (GDP) সিরিজের সংশোধন: মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

প্রেক্ষাপট

ভারত পর্যায়ক্রমে তার **জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান** (National Accounts Statistics - NAS) সংশোধন করে যাতে অর্থনীতির পরিবর্তনশীল কাঠামোকে আরও নির্ভুলভাবে ধরা যায়। ২০২৬ সালে, **পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক** (MoSPI) ২০১৫ সালে প্রবর্তিত ২০১১-১২ ভিত্তি বছরের পরিবর্তে **২০২২-২৩ ভিত্তি বছরের** একটি নতুন জিডিপি সিরিজ প্রকাশ করেছে।

জিডিপি এবং সংশ্লিষ্ট পরিমাপের ধারণা

ক. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Product - GDP):

জিডিপি বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত **চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মোট আর্থিক মূল্যকে** বোঝায়। এটি একটি অর্থনীতির আকার এবং কর্মক্ষমতা পরিমাপের প্রধান সূচক।

- **জিডিপি-র গুরুত্ব:**
  - অর্থনীতির **আকার** এবং সামগ্রিক কার্যকলাপ পরিমাপ করা।
  - সময়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক **বৃদ্ধি বা সংকোচন** ট্র্যাক করা।
  - বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার **তুলনা** করা।
  - **জীবনযাত্রার মান** এবং সাধারণ অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিবর্তন মূল্যায়ন করা।

খ. বাজার মূল্যে জিডিপি (GDP-MP) **এবং উপাদান ব্যয়ে জিডিপি** (GDP-FC):

- **বাজার মূল্যে জিডিপি** (GDP-MP): এটি ভোক্তাদের দ্বারা প্রদত্ত মূল্যে পরিমাপ করা হয়, যার মধ্যে **পরোক্ষ কর** (Indirect Taxes) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং **ভরতুকি** (Subsidies) বাদ দেওয়া হয়।

- **উপাদান ব্যয়ে জিডিপি (GDP-FC):** এটি উৎপাদনের উপাদানগুলোর (ভূমি, শ্রম, মূলধন, উদ্যোক্তা) দ্বারা অর্জিত আয় পরিমাপ করে।
- **সম্পর্ক:**

GDP-MP = GDP-FC + **পরোক্ষ কর - ভরতুকি**

গ. **নামমাত্র জিডিপি (Nominal GDP) বনাম প্রকৃত জিডিপি (Real GDP)**

- **নামমাত্র জিডিপি (Nominal GDP):** এটি **চলতি বাজার মূল্যে (Current market prices)** পরিমাপ করা হয়।
  - এটি বর্তমান বছরের প্রচলিত দামের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
  - এতে **মুদ্রাস্ফীতির (Inflation)** প্রভাব অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **প্রকৃত জিডিপি (Real GDP):** এটি একটি নির্দিষ্ট **ভিত্তি বছরের (Base Year)** স্থির মূল্যে পরিমাপ করা হয়।
  - এটি মুদ্রাস্ফীতি বা দামের ওঠানামার প্রভাব দূর করে।
  - এটি উৎপাদনের স্তরের প্রকৃত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।
  - বিভিন্ন বছরের মধ্যে প্রবৃদ্ধির তুলনা করার জন্য **প্রকৃত জিডিপি** একটি উন্নত সূচক।

ঘ. **মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added - GVA):**

জিভিএ (GVA) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি করা মূল্য পরিমাপ করে।

সূত্র: GVA = **উৎপাদিত পণ্যের মূল্য - অন্তর্বর্তী উপকরণের (Inputs) মূল্য**

- **জিডিপি এবং জিভিএ-র মধ্যে সম্পর্ক:**
- GDP = GVA + পণ্য কর - পণ্য ভরতুকি
- **তাৎপর্য:** জিভিএ অর্থনীতির **ক্ষেত্রভিত্তিক (Sector-wise)** উৎপাদন কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে জিডিপি সরকারি কর ও ভরতুকি সহ সামগ্রিক উৎপাদন প্রকাশ করে।

ঙ. **ভিত্তি বছর (Base Year) এবং সংশোধন (Rebasing):**

- **ভিত্তি বছর:** এটি একটি রেফারেন্স বছর যার দাম ব্যবহার করে প্রকৃত জিডিপি গণনা করা হয়। বর্তমানে ভারতের নতুন ভিত্তি বছর হলো **২০২২-২৩**।
- **সংশোধন (Rebasing):** উন্নত তথ্য উৎস, আধুনিক পদ্ধতি এবং পরিমার্জিত পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করে ভিত্তি বছর আপডেট করার প্রক্রিয়া।
- **এটি যা প্রতিফলিত করে:**
  - উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন।
  - প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।
  - ভোক্তাদের ব্যবহারের বা ব্যয়ের অভ্যাসের পরিবর্তন।

ভারতে জিডিপি (GDP) গণনার পদ্ধতি

ভারত তার জিডিপি অনুমিতিগুলো জাতিসংঘের **SNA 2008 (System of National Accounts)** কাঠামো অনুযায়ী সংকলন করে এবং ভবিষ্যতে **SNA 2025** মানদণ্ডে উন্নীত হওয়ার পরিকল্পনা করছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) **Special Data Dissemination Standard (SDDS)**-এর সদস্য হিসেবে ভারত পরিসংখ্যানগত স্বচ্ছতা এবং তথ্যের গুণমান বজায় রাখতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিয়মাবলি অনুসরণ করে।

ক. জিডিপি গণনার পদ্ধতিসমূহ (Approaches to GDP Calculation)

জিডিপি প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে গণনা করা হয়, যার প্রতিটি অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে।

১. উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach বা Output Method)

এই পদ্ধতি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি করা **মূল্য সংযোজন (Value Added)** পরিমাপ করে।

- **প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:**
  - কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।
  - শিল্প (উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং, খনি, নির্মাণ ইত্যাদি)।
  - পরিষেবা ক্ষেত্র। এই সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে মোট মূল্য সংযোজনই জিডিপি গণনার ভিত্তি তৈরি করে।

২. ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)

এই পদ্ধতিতে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার ওপর করা মোট ব্যয়ের সমষ্টির মাধ্যমে জিডিপি পরিমাপ করা হয়।

- **এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**
  - **ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় (PFCE)**
  - **সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় (GFCE)**
  - **মোট মূলধন গঠন (বিনিয়োগ)**
  - **নিট রপ্তানি (রপ্তানি – আমদানি)**

সূত্র: GDP = ভোগ + সরকারি ব্যয় + বিনিয়োগ + নিট রপ্তানি

৩. আয় পদ্ধতি (Income Approach)

উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে উৎপন্ন সমস্ত আয়ের যোগফল দিয়ে এই পদ্ধতিতে জিডিপি পরিমাপ করা হয়।

- **এই আয়ের মধ্যে রয়েছে:**
  - মজুরি এবং বেতন (শ্রমের আয়)।
  - সংস্থা বা ফার্মের মুনাফা।
  - সম্পত্তি থেকে অর্জিত খাজনা।
  - মূলধনের ওপর অর্জিত সুদ। সংশোধিত জিডিপি সিরিজে উন্নত তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে আরও উন্নত **সমন্বয় (Reconcile)** করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খ. ত্রৈমাসিক জিডিপি অনুমিতি (Quarterly GDP Estimation)

বার্ষিক হিসাবের পাশাপাশি, **জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (NSO)** ত্রৈমাসিক জিডিপি রিপোর্ট তৈরি করে।

- **বেঞ্চমার্ক–ইন্ডিকেটর পদ্ধতি (Benchmark–Indicator Method):** আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত **প্রোপোরশনাল ডেন্টন পদ্ধতি (Proportional Denton method)** ব্যবহার করে এই হিসাব করা হয়।
- **প্রক্রিয়া:**
  - **বার্ষিক জিডিপি** অনুমিতিগুলো বেঞ্চমার্ক বা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।
  - অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি ট্র্যাক করতে **উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি নির্দেশক (High-frequency indicators)**, যেমন মাসিক বা ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক তথ্য ব্যবহার করা হয়।
  - এই নির্দেশকগুলোকে বেঞ্চমার্ক অনুমিতির ওপর প্রয়োগ করে ত্রৈমাসিক জিডিপির পরিসংখ্যান বের করা হয়।

এই পদ্ধতিটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

- UN System of National Accounts (SNA 2008)
- IMF Quarterly National Accounts Manual (2017)

সংশোধিত জিডিপি (GDP) সিরিজের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Highlights)

- **সংশোধিত ভিত্তি বছর (২০২২–২৩):** জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানের (National Accounts Statistics) ভিত্তি বছর ২০১১–১২ থেকে পরিবর্তন করে **২০২২–২৩** করা হয়েছে। ২০২২–২৩ অর্থবছরটি বেছে নেওয়ার কারণ হলো, কোভিড-১৯ মহামারীর (২০১৯–২০২১) বিপর্যয়ের পর এটিই ছিল সবচেয়ে সাম্প্রতিক **"স্বাভাবিক" (Normal)** বা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক সময়কাল।
- **উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি তথ্যের ব্যবহার (High-Frequency Data):** অর্থনৈতিক কার্যকলাপের নির্ভুলতা এবং পরিধি বাড়াতে এই সিরিজে রিয়েল-টাইম প্রশাসনিক ডেটাসেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে **জিএসটি (GST) সংগ্রহ, ই-বাহন (e-Vahan)** পোর্টাল এবং **পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PFMS)**।
- **সিঙ্গেল ডিফ্লেশন থেকে ডাবল ডিফ্লেশনে রূপান্তর:** নতুন পদ্ধতিতে **ডাবল ডিফ্লেশন (Double Deflation)** প্রবর্তন করা হয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদন (Manufacturing) এবং কৃষি খাতে। এখানে পণ্যের উৎপাদন মূল্য (Output) এবং উপকরণের মূল্য (Input)—উভয়কেই মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা হয়।
    - এটি আগের **সিঙ্গেল ডিফ্লেশন** পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করেছে। (**সিঙ্গেল ডিফ্লেশন** হলো এমন একটি কৌশল যেখানে কেবল পণ্যের উৎপাদন মূল্যে মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করা হতো, কিন্তু উপকরণের খরচ বা ইনপুট কস্ট আলাদাভাবে ডিফ্লেট করা হতো না)।
- **সাপ্লাই অ্যান্ড ইউজ টেবিল (SUT) কাঠামোর প্রয়োগ: সাপ্লাই অ্যান্ড ইউজ টেবিল (SUT)** ফ্রেমওয়ার্ককে জাতীয় হিসাব ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা হয়েছে। এটি উৎপাদন-ভিত্তিক এবং ব্যয়-ভিত্তিক জিডিপি অনুমিতির মধ্যে অমিল (Inconsistencies) কমাতে সাহায্য করে এবং জাতীয় হিসাব তথ্যের সামগ্রিক সংহতি উন্নত করে।
- **ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়ের (PFCE) উন্নত পরিমাপ:** পরিবারের ভোগ বা ব্যয়ের ধরণ আরও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার জন্য **পণ্য প্রবাহ পদ্ধতি (Commodity flow approach)**, প্রশাসনিক ডেটাসেট এবং সরাসরি উৎপাদন-ভিত্তিক হিসাবকে একত্রিত করে PFCE-এর ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।
- **সরকারি খাতের অ্যাকাউন্টিংয়ে সমন্বয়:** সরকারি ব্যয়ের হিসাবে এখন **ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS)** এবং **ওল্ড পেনশন স্কিম (OPS)**—উভয়ের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি ব্যয় এবং পেনশন দায়বদ্ধতার (Pension liabilities) হিসাব আরও স্বচ্ছ হবে।
- **ঘরোয়া বা ডোমেস্টিক সেক্টরের পরিধি বৃদ্ধি:** সংশোধিত জিডিপি হিসাবে এখন **গৃহকর্মী (Hired domestic workers)** এবং **ডিজিটাল, প্ল্যাটফর্ম ও গিগ ইকোনমি (Gig Economy)** সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **অনানুষ্ঠানিক বা ইনফরমাল খাতের উন্নত পরিমাপ:** গৃহস্থালি এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান সঠিকভাবে বোঝার জন্য **অসংগঠিত ক্ষেত্র এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কিত বার্ষিক জরিপ (ASUSE)** এবং **পর্যায়কালিক শ্রম শক্তি জরিপ (PLFS)**-এর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সংশোধিত জিডিপি (ভিত্তি বছর ২০২২–২৩) এর প্রভাব

- **নামমাত্র জিডিপি (Nominal GDP) হ্রাস:** নতুন পরিসংখ্যানগত কাঠামোর কারণে ২০২৫–২৬ অর্থবছর এবং এর আগের তিন বছরের জন্য ভারতের **নামমাত্র জিডিপি (Nominal GDP)** প্রায় **৩–8%** হ্রাস পেয়েছে। এটি মূলত পরিমাপ পদ্ধতি এবং তথ্যভাণ্ডারের (Datasets) পরিবর্তনের প্রতিফলন।
- **রাজকোষীয় ঘাটতির (Fiscal Deficit) লক্ষ্যের ওপর চাপ:** যেহেতু রাজকোষীয় ঘাটতি নামমাত্র জিডিপির শতাংশ হিসেবে গণনা করা হয়, তাই জিডিপির ভিত্তি (Base) ছোট হয়ে যাওয়ায় ঘাটতির অনুপাত বেড়ে যায়।

- **প্রভাব:** ২০২৫–২৬ অর্থবছরের রাজকোষীয় ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা, যা আগে ৪.৪% ধরা হয়েছিল, নতুন সিরিজে তা বেড়ে প্রায় **৪.৫%** হয়েছে।
- **ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ:** ২০২৬–২৭ অর্থবছরের জন্য ৪.৩% ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে নামমাত্র জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় **১৩–১৪%** হওয়া প্রয়োজন। এটি ২০২৬–২৭ বাজেটে ধরা ১০% প্রবৃদ্ধির অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি, যার ফলে সরকারকে তার ঋণ নেওয়ার কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে।

- **ঋণ-জিডিপি অনুপাত (Debt-to-GDP Ratio) বৃদ্ধি:** জিডিপির আকার কমে যাওয়ায় **ঋণ-জিডিপি অনুপাত** বৃদ্ধি পায়। সংশোধিত সিরিজ অনুযায়ী, ২০২৫–২৬ অর্থবছরে কেন্দ্রের ঋণের অনুপাত ৫৬.২% থেকে বেড়ে প্রায় **৫৮.১%** হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উপসংহার

২০২২-২৩ ভিত্তি বছরে এই রূপান্তর পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতার পথে একটি **মাইলফলক**। যদিও জিডিপির প্রকৃত আকার হ্রাস পাওয়া রাজকোষীয় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, তবুও এটি ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পের জন্য একটি আরও বাস্তবসম্মত এবং **"সৎ" ভিত্তি (Honest Baseline)** প্রদান করে। জিএসটি (GST) এবং গিগ-ওয়ার্কের মতো আধুনিক তথ্যসূত্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই নতুন সিরিজটি নিশ্চিত করে যে ভারতের অর্থনৈতিক পরিমাপ পদ্ধতি একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত।

Q. জিডিপি-র ভিত্তি বছর (Base Year) সংশোধন ভারতের রাজকোষীয় সূচক (Fiscal Indicators) এবং ক্ষেত্রভিত্তিক অনুমিতিকে (Sectoral Estimates) কীভাবে প্রভাবিত করে? ২০২২-২৩ ভিত্তি বছরের জিডিপি সিরিজের প্রেক্ষিতে আলোচনা করুন।

3.1.6. ভারতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)

ভূমিকা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) বলতে বোঝায় যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনই শেষ কথা নয়, বরং সমাজের উপকারে আসে এমন কাজ এবং লাভের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারতে এটি কেবল একটি দানশীলতার কাজ নয়, বরং **কোম্পানি আইন ২০১৩**-এর অধীনে একটি আইনি বাধ্যবাধকতা।

সংবিধিবদ্ধ কাঠামো: কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১৩৫

ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নির্দিষ্ট শ্রেণির কোম্পানিগুলোর জন্য CSR বাধ্যতামূলক করেছে।

- **প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী:** যদি কোনো কোম্পানি গত অর্থ বছরে নিচের যেকোনো একটি শর্ত পূরণ করে, তবে তাদের CSR খাতে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক:
  - **মোট সম্পদ (Net Worth):** ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি।
  - **বার্ষিক লেনদেন (Turnover):** ১,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি।
  - **নিট লাভ (Net Profit):** ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি।
- **ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা:** যোগ্য কোম্পানিগুলোকে তাদের আগের টানা তিন বছরের গড় নিট লাভের অন্তত **২%** অংশ CSR কার্যক্রমে ব্যয় করতে হবে।
- **শাসন ব্যবস্থা:** কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই একটি CSR **কমিটি** গঠন করতে হবে (যেখানে অন্তত একজন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন)। এই কমিটি CSR **নীতিমালা** তৈরি এবং তা তদারকি করবে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্রসমূহ

কোম্পানি আইন ২০১৩-এর তফসিল VII-এ বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রমকে কৌশলগতভাবে এই **৬টি মূল স্তম্ভে** ভাগ করা যেতে পারে:

১. **মানবসম্পদ ও সমাজকল্যাণ**

- **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি দূরীকরণ; প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিচ্ছন্নতা বা স্যানিটেশনের প্রসার (যার মধ্যে **স্বচ্ছ ভারত কোষে** অবদান রাখা অন্তর্ভুক্ত)।
- **অসহায় গোষ্ঠী:** বৃদ্ধাশ্রম, দিবা যত্ন কেন্দ্র (day care centers), এবং মহিলা ও এতিমদের জন্য হোস্টেল স্থাপন; **তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST), ওবিসি (OBC)** এবং সংখ্যালঘুদের বৈষম্য কমানোর পদক্ষেপ।

২. **শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি**

- **শিক্ষা:** সাক্ষরতা এবং বিশেষ শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
- **জীবিকা:** কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকারী বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রদান, বিশেষ করে শিশু, মহিলা এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা।

৩. **পরিবেশগত তদারকি ও স্থায়িত্ব**

- **বাস্তুসংস্থানিক ভারসাম্য:** গাছপালা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পশুকল্যাণ এবং কৃষি-বনায়ন।
- **সম্পদ সংরক্ষণ:** মাটি, বাতাস এবং জলের গুণমান বজায় রাখা (যার মধ্যে **ক্লিন গঙ্গা ফান্ডে** অবদান রাখা অন্তর্ভুক্ত)।

৪. **ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়**

- **সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ:** ঐতিহাসিক ভবন, স্থান এবং শিল্পকর্ম রক্ষা ও পুনরুদ্ধার।
- **শিল্পের প্রসার:** ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের উন্নয়ন এবং পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন।

৫. **গবেষণা, উদ্ভাবন ও ক্রীড়া**

- **গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D):** বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসার গবেষণার জন্য সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়, IIT এবং জাতীয় ল্যাবরেটরিগুলোতে (যেমন DRDO, ICAR, CSIR) অনুদান দেওয়া।
- **ক্রীড়া:** গ্রামীণ খেলাধুলা, জাতীয়ভাবে স্বীকৃত খেলাধুলা, প্যারা অলিম্পিক এবং অলিম্পিক গেমসের প্রশিক্ষণে সহায়তা।

৬. **জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা ও ত্রাণ তহবিল**

- **সশস্ত্র বাহিনী:** প্রাক্তন সৈনিক, যুদ্ধের বিধবা এবং তাদের নির্ভরশীলদের কল্যাণে পদক্ষেপ (যার মধ্যে CAPF এবং CPMF পরিবারগুলোও অন্তর্ভুক্ত)।
- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন কার্যক্রম; **PM CARES ফান্ড** বা প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে অবদান।

ভারতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) গুরুত্ব

১. **রাষ্ট্রের সক্ষমতাকে সহায়তা করা CSR**

সরকারি নীতি এবং বেসরকারি দক্ষতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে। এটি কর্পোরেট পুঁজি, প্রযুক্তি এবং পরিচালনার দক্ষতাকে এমন সব উন্নয়নমূলক খাতে (যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) পৌঁছাতে সাহায্য করে, যেখানে সরকার একা সম্পূর্ণ অর্থায়ন বা বাস্তবায়ন করতে হিমশিম খেতে পারে।

২. **এসডিজি (SDG)-এর স্থানীয়করণ**

তৃণমূল পর্যায়ে জাতিসংঘের **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা** (SDG) অর্জনের জন্য CSR কার্যক্রম একটি প্রধান মাধ্যম। স্থানীয় স্যানিটেশন, লিঙ্গ সমতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যগুলোকে ভারতের বাস্তবতায় রূপান্তর করে।

৩. **নৈতিক কর্পোরেট সুশাসন প্রচার**

এই আইনি বাধ্যবাধকতা কোম্পানিগুলোকে শুধু লাভের চিন্তা থেকে বের করে **"ট্রিপল বটম লাইন"** বা **৩টি মূল ভিত্তি (মানুষ, পৃথিবী, মুনাফা)** মেনে চলার দিকে উৎসাহিত করে। এটি ভারতীয় কর্পোরেট জগতের মধ্যে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের একটি সংস্কৃতি তৈরি করে।

৪. **মানবসম্পদ উন্নয়ন**

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে CSR ভারতের **"দক্ষতার অভাব"** মেটাতে সাহায্য করে। এটি আরও বেশি কর্মসংস্থানযোগ্য জনশক্তি তৈরি করে, যা সরাসরি **স্কিল ইন্ডিয়া** এবং **আত্মনির্ভর ভারত**-এর মতো জাতীয় উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করে।

৫. **সামাজিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ** CSR তহবিলের মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্কুল, ক্লিনিক এবং সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থার মতো টেকসই সামাজিক সম্পদ তৈরি হচ্ছে। এটি মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে।

৬. **পরিবেশগত তদারকি**

বাস্তুসংস্থান রক্ষা এবং সম্পদ সংরক্ষণে ব্যয় বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে CSR শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের **কার্বন ফুটপ্রিন্ট** বা দূষণ কমাতে উৎসাহিত করে। এটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকে ত্বরান্বিত করে এবং প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের লক্ষ্যগুলো (NDCs) পূরণে সহায়তা করে।

ভারতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা**

CSR তহবিলের একটি বড় অংশ মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং কর্ণাটকের মতো শিল্পোন্নত রাজ্যগুলোতে জমা হচ্ছে। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পিছিয়ে পড়া **আকাঙ্ক্ষী জেলাগুলো** (Aspirational Districts) অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এটি "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি" বা সবার সমান উন্নয়নের লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।

২. **খাতভিত্তিক অসমতা**

কর্পোরেট ব্যয় মূলত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো "সহজ" খাতগুলোর দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। কিন্তু তফসিল VII-এর অধীনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন—জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা, গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচার এবং বস্তি এলাকার উন্নয়ন খুব কম তহবিল পায়।

৩. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা (NGO) সংক্রান্ত সমস্যা**

অনেক কোম্পানির নিজস্ব প্রকল্প পরিচালনার দক্ষতা নেই এবং তারা NGO-এর ওপর নির্ভর করে। তবে অনেক স্থানীয় এনজিও-র মধ্যে পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা এবং বড় অঙ্কের কর্পোরেট তহবিল পরিচালনা করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে। এছাড়া আইনের প্রয়োজনে কঠোর **"প্রভাব মূল্যায়ন"** (Impact Assessment) করার সক্ষমতাও তাদের অনেকের নেই।

৪. **"গ্রিনওয়াশিং" ও লোক দেখানো কমপ্লায়েন্স**

কিছু কোম্পানি CSR-কে কেবল একটি আইনি বোঝা বা প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে দেখে (যাকে **"গ্রিনওয়াশিং"** বলা হয়)। দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিবর্তনের পরিবর্তে তারা কেবল চেকে সই করে টাকা দেওয়া বা নামমাত্র কিছু অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেয়, যার কোনো বাস্তব সামাজিক প্রভাব থাকে না।

৫. জনঅংশগ্রহণের অভাব

CSR প্রকল্পগুলো প্রায়ই কোম্পানি বোর্ডগুলো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়, যেখানে স্থানীয় মানুষের সাথে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয় না। এর ফলে **"স্থানীয় মালিকানাবোধ"** তৈরি হয় না এবং স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা না থাকায় তৈরি করা সম্পদগুলো (যেমন টয়লেট বা লাইব্রেরি) অবহেলায় পড়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. আকাঙ্ক্ষী জেলাগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া

আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা দূর করতে সরকার এবং কর্পোরেটদের উচিত ১১২টি **আকাঙ্ক্ষী জেলাকে** (Aspirational Districts) অগ্রাধিকার দেওয়া। উত্তর-পূর্ব এবং আদিবাসী প্রধান রাজ্যগুলোতে ব্যয় করার জন্য ট্যাক্স সুবিধা বা **"CSR ক্রেডিট"** দেওয়ার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২. "ব্যয়" থেকে "ফলাফল"-এর দিকে রূপান্তর

কোম্পানিগুলোকে কেবল "কত টাকা খরচ হলো" তা রিপোর্ট করার বদলে "সামাজিক প্রভাব কী হলো" তা পরিমাপ করতে হবে। তৈরি করা সম্পদগুলো (যেমন স্কুল বা ক্লিনিক) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এবং দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা দিচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলকভাবে **তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন** এবং **সামাজিক অডিট** চালু করা উচিত।

৩. "সম্মিলিত CSR" বা কালেক্টিভ সিএসআর প্রচার

একটি **কনসোর্টিয়াম মডেল** বা জোট গঠন উৎসাহিত করা উচিত যেখানে একাধিক কোম্পানি তাদের ২% তহবিল একত্রিত করে বড় আকারের এবং উচ্চ-প্রভাবশালী অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করবে (যেমন বিশাল জল শোধন প্ল্যান্ট)। এটি ছোট ছোট অকার্যকর প্রকল্পে টাকা ছড়ানো বন্ধ করবে।

৪. সরকারি প্রকল্পগুলোর সাথে সমন্বয়

CSR উদ্যোগগুলোকে কৌশলগতভাবে গতি শক্তি (অবকাঠামো), পোষণ ২.০ (পুষ্টি) এবং লাইটহাউস ট্যুরিজমের মতো জাতীয় মিশনগুলোর সাথে যুক্ত করা উচিত। এটি একটি **"মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট"** তৈরি করবে, যেখানে বেসরকারি তহবিল সরকারি ব্যবস্থার সাথে মিলে বড় পরিবর্তন আনতে পারবে।

৫. এনজিও-র সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

সরকারের উচিত একটি **জাতীয় CSR এক্সচেঞ্জ পোর্টাল** তৈরি করা—এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হবে যা যাচাইকৃত ও দক্ষ এনজিও-দের সাথে কর্পোরেট দাতাদের যুক্ত করবে। এটি মধ্যস্বত্বভোগী সমস্যা কমাবে, স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং গ্রামীণ এলাকার ছোট এনজিও-দের পেশাদার তহবিল পেতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) তহবিল মুনাফা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করে। টেকসই উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসাগুলো পরিমাপযোগ্য **সামাজিক প্রভাব** তৈরি করে, ব্র্যান্ডের সুনাম বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী **নৈতিক প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করে।

Q. অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলকে বিবেচনায় রেখে, নতুন 'কোম্পানি বিল, ২০১৩' পরোক্ষভাবে 'কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা' (CSR)-কে একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছে। আন্তরিকতার সাথে এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা আলোচনা করুন। পাশাপাশি, বিলটিতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিধানসমূহ এবং সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করুন।

3.1.7. জাতীয় গ্যাস গ্রিড

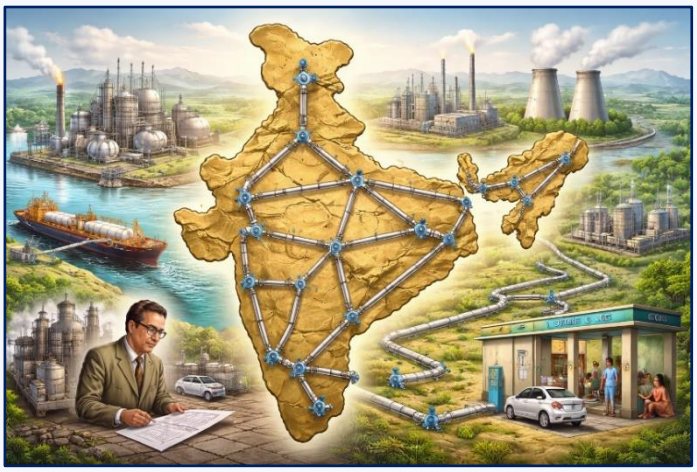

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে চলমান **পশ্চিম এশিয়া সংকটের** কারণে **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে ভারতের **এলপিজি** (LPG) **আমদানির ৯০%** ব্যাহত হয়েছে। ফলস্বরূপ, দেশের তীব্র জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার **'ন্যাচারাল গ্যাস (সাপ্লাই রেগুলেশন) অর্ডার, ২০২৬'** জারি করেছে, যেখানে **পিএনজি** (PNG) এবং **সার** (Fertilizer) উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় গ্যাস গ্রিডের (NGG) পটভূমি

১. **প্রাথমিক ধারণা (১৯৫০-১৯৭০-এর দশক)**

ভারতে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের ধারণাটি ১৯৫৫ সালে প্রথম শুরু হয়, যখন **সৈয়দ হোসেন জহির** কয়লা গ্যাসীকরণের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশব্যাপী গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

- তিনি একটি **"টাউন গ্যাস সাপ্লাই স্কিম"**-এর পরিকল্পনা করেছিলেন:
  - কয়লা থেকে **গ্যাস উৎপাদন** করা হবে।
  - পাইপলাইনের মাধ্যমে সেই গ্যাস **শহর এবং শিল্পাঞ্চলে** পৌঁছে দেওয়া হবে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Vision & Goals)

- **"এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড":** আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোকে একটি একক জাতীয় ইউনিটে একীভূত করা যাতে সব জায়গায় সমানভাবে গ্যাস বণ্টন করা যায়।
- **উদ্দেশ্য:** ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট জ্বালানি ব্যবহারের মিশ্রণে প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশ **৬.৭% থেকে বাড়িয়ে ১৫%** করা।

৩. **নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো** (Regulatory Framework)

- **PNGRB অ্যাক্ট, ২০০৬:** প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবহন, মজুত এবং বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই বিধিবদ্ধ বোর্ড গঠন করা হয়।
- **কমন ক্যারিয়ার নীতি** (Common Carrier Principle): এটি পাইপলাইনে **"সবার জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার"** নিশ্চিত করে, যাতে কোনো একটি সংস্থা একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।
- **ইউনিফাইড ট্যারিফ (২০২৩):** আগে পাইপলাইনের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা খরচ লাগত। এখন **"এক দেশ, এক ট্যারিফ"** মডেলের মাধ্যমে খরচ কমানো হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো দূরবর্তী অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য অনেক সাশ্রয়ী।

৪. **বিবর্তন ও গঠন** (Structural Evolution)

- **প্রাথমিক পর্যায়:** এটি HBJ **(হাজিরা-বিজয়পুর-জগদীশপুর)** পাইপলাইনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, যা মূলত উত্তর ভারতের সার এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহ করত।
- **আঞ্চলিক সংযুক্তি:**
  - **দক্ষিণ ভারত:** কোচি-মাঙ্গালুরু পাইপলাইনের মাধ্যমে যুক্ত।
  - **পূর্ব ভারত: প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা** (JHBDPL) প্রকল্পের মাধ্যমে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশাকে যুক্ত করা হয়েছে।

- **উত্তর-পূর্ব ভারত: ইন্দ্রধনুশ গ্যাস গ্রিড (IGGL)** উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যকে জাতীয় নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করছে।

জাতীয় গ্যাস গ্রিডের প্রয়োজনীয়তা

১. **গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে রূপান্তর**

- **লক্ষ্য পূরণ:** ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ১৫%-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য এই গ্রিড অপরিহার্য।
- **সেতুবন্ধন জ্বালানি (Bridge Fuel):** ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট জিরো'** লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়লা বা তেলের মতো 'নোংরা' জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে এটি একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. **"জ্বালানি দারিদ্র্য" দূর করা (আঞ্চলিক ভারসাম্য)**

- **ভৌগোলিক সমতা:** এটি পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের গ্যাস-সমৃদ্ধ অঞ্চলের সাথে গ্যাস-স্বল্পতার শিকার **পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে** যুক্ত করে।
- **সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি:** শিল্প উন্নয়ন যাতে কেবল উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করে।

৩. **কৌশলগত শক্তি নিরাপত্তা (Energy Security)**

- **আমদানি বৈচিত্র্য:** এটি ভারতকে যেকোনো বন্দর (পশ্চিম বা পূর্ব উপকূল) থেকে দেশের যেকোনো প্রান্তে গ্যাস পাঠানোর সুবিধা দেয়, যা **২০২৬ সালের পশ্চিম এশিয়া সংকটের** মতো পরিস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরি।
- **কৌশলগত মজুত:** ভবিষ্যতে **কৌশলগত গ্যাস ভাণ্ডারকে** শিল্প ও ঘরোয়া কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করার জন্য এটি প্রয়োজন।

৪. **শিল্প ও কৃষি উৎপাদনশীলতা**

- **সার ভর্তুকি নিয়ন্ত্রণ:** ইউরিয়া কারখানাগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে, যা উৎপাদন খরচ কমায় এবং সরকারের **ভর্তুকির বোঝা** লাঘব করে।
- **শিল্পের কাঁচামাল:** ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো ভারী শিল্পের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি।

৫. **পরিচ্ছন্ন শহর ও রান্না**

- **দূষণ নিয়ন্ত্রণ:** সিজিডি (CGD) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ডিজেল/পেট্রোল বদলে **সিএনজি (CNG)** ব্যবহার বাড়ানো, যা শহরের ধোঁয়াশা কমায়।
- **এলপিজি প্রতিস্থাপন:** সরাসরি পাইপের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছে দিলে এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির খরচ এবং পরিবহনের ঝামেলা কমে।

৬. **ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি (হাইড্রোজেন এবং বায়োগ্যাস)**

- **মিশ্রণ কেন্দ্র:** গ্রামীণ এলাকায় উৎপাদিত **সবুজ হাইড্রোজেন (Green Hydrogen)** এবং **কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG)** সারা দেশে পরিবহনের জন্য এই গ্রিডই একমাত্র পথ।

জাতীয় গ্যাস গ্রিডের গুরুত্ব

১. **শক্তি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা**

- এটি কয়লা বা তেলের ওপর একক নির্ভরতা কমায় এবং ভূ-রাজনৈতিক সংকটের সময় গ্যাসের সরবরাহ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**

- **শিল্পের প্রতিযোগিতা:** সার, ইস্পাত এবং কাঁচ শিল্পে সস্তা ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ করে।
- **খরচ হ্রাস:** ইউনিফাইড ট্যারিফের ফলে উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত শিল্পগুলোও সস্তায় গ্যাস পায়।

৩. **পরিবেশগত প্রভাব**

- এটি কয়লার তুলনায় **৪০% কম কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)** নির্গত করে এবং ধূলিকণা (PM) নিঃসরণ প্রায় শূন্য, যা ভারতের পরিবেশগত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক।

৪. **সামাজিক ও পরিকাঠামো সুবিধা**

- **গ্রাহকদের সুবিধা:** সরাসরি রান্নাঘরে পিএনজি (PNG) সরবরাহ এলপিজি সিলিন্ডারের ঝুঁকি ও ঝক্কি দূর করে।
- **আঞ্চলিক উন্নয়ন:** অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে মূলধারার শিল্প অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে।

৫. **কৌশলগত একীকরণ**

- বিদ্যমান পাইপলাইনে **বায়োগ্যাস** এবং **সবুজ হাইড্রোজেন** মিশিয়ে ভবিষ্যতের জ্বালানি পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।

জাতীয় গ্যাস গ্রিডের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আমদানির ওপর উচ্চ নির্ভরশীলতা**

ভারত তার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় **৫০% এলএনজি (LNG)** হিসেবে আমদানি করে। বিশ্ববাজারে দামের অস্থিরতা (যা **২০২৬-এর পশ্চিম এশিয়া সংকটের** কারণে আরও বেড়েছে) ঘরোয়া কয়লার তুলনায় গ্যাসকে মহার্ঘ করে তোলে। এর ফলে গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তাদের পূর্ণ ক্ষমতায় চলতে পারে না।

২. **জিএসটি (GST) থেকে বহির্ভূত থাকা**

প্রাকৃতিক গ্যাস এখনো **পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)**-এর আওতায় আসেনি। এর ফলে রাজ্যভেদে ভ্যাট (VAT) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের ভিন্নতার কারণে করের ওপর কর (Cascading Effect) চাপানো হয়। ফলে অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের চূড়ান্ত খরচ **১০-১৫%** বেড়ে যায়।

৩. **জমি অধিগ্রহণ ও 'রাইট অফ ওয়ে' (RoW) সংক্রান্ত সমস্যা**

পাইপলাইন বসানোর জন্য **'রাইট অফ ওয়ে'** বা পথ ব্যবহারের অধিকার পাওয়া একটি বড় বাধা। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের মতো জনবহুল রাজ্যগুলোতে আইনি জটিলতা এবং ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি হওয়ার ফলে প্রকল্পের খরচ অনেক বেড়ে যায়।

৪. **অব্যবহৃত বা 'পড়ে থাকা' সম্পদ (Stranded Assets)**

আমদানিকৃত গ্যাসের উচ্চ মূল্যের কারণে প্রায় **১৪.৩ গিগাওয়াট** গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ, এই গ্যাস দিয়ে তৈরি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাগুলোর (Discoms) কাছে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়।

৫. **শেষ প্রান্তের সংযোগ (Last-Mile Connectivity)**

প্রধান পাইপলাইনগুলো (Trunk Pipelines) সম্প্রসারিত হলেও, পুরনো ও ঘিঞ্জি শহরগুলোতে **সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD)** নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে ঘরবাড়িগুলোতে পিএনজি (PNG) সংযোগ পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।

৬. **কারিগরি ও সুরক্ষা ঝুঁকি**

বিদ্যমান ইস্পাত পাইপলাইনে **সবুজ হাইড্রোজেন** এবং **কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG)** মেশানোর ক্ষেত্রে কিছু প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন 'হাইড্রোজেন এমব্রিটলমেন্ট' (ধাতুর দুর্বল হয়ে যাওয়া)। এটি সমাধানের জন্য পরিকাঠামোর ব্যয়বহুল আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

১. **পরিকাঠামো প্রকল্প**

- **প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা (PMUG):** উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মতো গ্যাস-স্বল্পতার শিকার পূর্ব ভারতকে যুক্ত করা। এটি বন্ধ হয়ে যাওয়া সার কারখানাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করছে এবং পশ্চিমবঙ্গের **ম্যাট্রিক্স (Matix)** সার কারখানাকে সহায়তা দিচ্ছে।

- **উত্তর-পূর্ব গ্যাস গ্রিড (NEGG):** আইজিজিএল (IGGL) দ্বারা বাস্তবায়িত এই ১,৬৫৬ কিমি দীর্ঘ পাইপলাইনটি **২০২৬ সালের ৩১ মার্চের** মধ্যে সম্পূর্ণ চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যকে জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত করবে।

২. **মূল্য নির্ধারণ ও ট্যারিফ সংস্কার**

- **ইউনিফাইড পাইপলাইন ট্যারিফ (২০২৩-২০২৬):** 'এক দেশ, এক গ্রিড, এক ট্যারিফ' মডেল। এটি একাধিক ট্রানজিট ফি দূর করে। এর ফলে আগরতলার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকও উপকূলীয় টার্মিনালের (যেমন দাহেজ) কাছাকাছি থাকা গ্রাহকের সমান হারে পরিবহন খরচ দেবেন।
- **কিরিট পারিখ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন:** বাজার-ভিত্তিক মূল্য ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া, যেখানে দেশীয় গ্যাসের জন্য একটি **'সর্বনিম্ন' (Floor)** এবং **'সর্বোচ্চ' (Ceiling)** দাম নির্ধারণ করা থাকে যাতে উৎপাদক ও গ্রাহক উভয়ই সুরক্ষিত থাকে।

৩. **জৈব-জ্বালানি একীকরণ**

- **সাতাত (SATAT) উদ্যোগ:** কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG) উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ২০২৬ সাল থেকে সরকার সকল সিজিডি (CGD) সংস্থাগুলির জন্য **সিবিজি ব্লেন্ডিং অবলিগেশন (CBO)** বা বায়োগ্যাস মেশানো বাধ্যতামূলক করেছে যাতে এলএনজি আমদানি কমানো যায়।
- **জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন:** বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনে সবুজ হাইড্রোজেন মেশানোর উপযোগী করে গ্রিডকে আধুনিকীকরণ করা।

৪. **গ্যাসের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি**

- **সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD) বিডিং:** ১২তম সিজিডি বিডিং রাউন্ডের মাধ্যমে ভারতের মানচিত্রের প্রায় **১০০% অংশ** এখন অনুমোদিত গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।
- **পিএম উজ্জ্বলা যোজনা ২.০:** যদিও এটি এলপিজি-র ওপর গুরুত্ব দেয়, তবে এটি গ্রামীণ ভারতে 'পরিচ্ছন্ন রান্নার' অভ্যাস তৈরি করে পিএনজি (PNG)-র পথ প্রশস্ত করছে। ২০২৬ সালের শুরুর দিকে এর সুবিধাভোগীর সংখ্যা **১০.৪ কোটি** ছাড়িয়ে গেছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **আর্থিক একীকরণ (GST):** প্রাকৃতিক গ্যাসকে **জিএসটি (GST)**-এর আওতায় আনা প্রয়োজন যাতে রাজ্যভেদে করের পার্থক্য দূর হয়। এতে শিল্পের জ্বালানি খরচ ১০-১৫% কমবে এবং একটি প্রকৃত জাতীয় বাজার তৈরি হবে।

২. **কৌশলগত গ্যাস ভাণ্ডার তৈরি:** লবণ খনি (Salt Caverns) বা পরিত্যক্ত কূপে **কৌশলগত প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার** গড়ে তোলা। এটি সামুদ্রিক সংকটের (যেমন **২০২৬-এর হরমুজ প্রণালী সংকট**) সময় ৩০-৬০ দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৩. **পরিকাঠামো আইন (Legal Reform):** একটি **'জাতীয় পরিবহন করিডোর আইন'** প্রণয়ন করা যাতে গ্যাস পাইপলাইনগুলো মহাসড়ক বা রেলপথের মতো আইনি মর্যাদা পায়। এটি জমি অধিগ্রহণ সহজ করবে এবং পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যে প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রতা কমাবে।

৪. **স্বাধীন সিস্টেম অপারেটর (TSO):** গ্রিড পরিচালনার জন্য একটি **স্বাধীন টিএসও (Independent TSO)** গঠন করা। এটি পাইপলাইনে তৃতীয় পক্ষের নিরপেক্ষ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে এবং গ্যাসের 'পরিবহন' ও 'বিপণন' ব্যবসাকে আলাদা করবে।

৫. **'গ্রিন ব্লেন্ডিং' বা সবুজ সংমিশ্রণ:** বিদ্যমান গ্রিডে **কম্প্রেসড বায়োগ্যাস (CBG)** এবং **সবুজ হাইড্রোজেন** মেশানো বাধ্যতামূলক করা এবং এতে ভর্তুকি দেওয়া। এটি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জাতীয় গ্যাস গ্রিডকে একটি 'কার্বনমুক্ত মহাসড়কে' পরিণত করবে।

৬. **চাহিদার সমন্বয় ও ডিজিটাল টুইন (Digital Twins):** রিয়েল-টাইম ডেটা মনিটরিং এবং গ্রিডের **'ডিজিটাল টুইন'** প্রযুক্তি ব্যবহার করা। এটি রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করবে এবং চাহিদা অনুযায়ী আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি চুক্তিতে দর কষাকষিতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

জাতীয় গ্যাস গ্রিড হলো ভারতের **২০৭০ সালের নেট জিরো** লক্ষ্যমাত্রার কৌশলগত মেরুদণ্ড। এটি একটি বহুমুখী **'জ্বালানি মহাসড়ক'** হিসেবে বিকশিত হচ্ছে, যা প্রাকৃতিক গ্যাস, সবুজ হাইড্রোজেন এবং বায়োগ্যাসকে একসূত্রে গেঁথে দিচ্ছে।

Q. "Examine the role of the National Gas Grid in enhancing India's energy security and regional equity. What are the major bottlenecks in its effective implementation?"

3.2. পরিবেশ

3.2.1. ভারতে জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা

প্রেক্ষিত

- ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত COP 30 সম্মেলনে, জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখানে জলকে অভিযোজন কৌশলের মূল স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- UAE Framework for Global Climate Resilience-এর অধীনে বৈশ্বিক অভিযোজন সূচকগুলি জল, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (WASH) ব্যবস্থাকে জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের কেন্দ্রে রেখেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে জল ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে

জলবায়ু পরিবর্তন জলচক্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে একটি **"হুমকি বৃদ্ধিকারক" (Threat Multiplier)** হিসেবে কাজ করে।

- **চরম আবহাওয়ার তীব্রতা (বন্যা-খরা কূটাভাস):** তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জলচক্র তীব্র হয়; **প্রতি ১°C বৃদ্ধিতে বাতাস প্রায় ৭% বেশি আর্দ্রতা ধারণ করতে পারে**। ফলে স্বল্প সময়ে অতিবৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক স্পেল দেখা যায়।
  - এর ফলে একইসাথে শহরে বন্যা এবং গ্রামে খরা সৃষ্টি হয়। কংক্রিটে ঢাকা শহর বৃষ্টির জল শোষণ করতে পারে না, যা বন্যা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে।
  - **উদাহরণ:** ২০২৩ সালের উত্তর ভারতের বন্যা এবং চেন্নাইয়ের বারবার ঘটে যাওয়া বন্যা এর প্রমাণ। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াদার মতো অঞ্চলগুলি অনিয়মিত বর্ষার কারণে ফসলের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
- **হিমালয়ের হিমবাহের অস্থিতিশীলতা ("তৃতীয় মেরু" সংকট):** হিমালয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধুর মতো বারোমাসি নদী ব্যবস্থার উৎস।
  - উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ দ্রুত গলছে। শুরুতে এটি নদীর প্রবাহ এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ালেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি প্রাকৃতিক **"জল ব্যাংক"** খালি করে দিচ্ছে, যা নদীগুলোর বারোমাসি চরিত্রকে হুমকির মুখে ফেলছে। এছাড়া হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যার (GLOFs) ঝুঁকিও বাড়ছে।
  - **উদাহরণ:** ২০২৩ সালে সিকিমের দক্ষিণ লহোনাক হ্রদ বিস্ফোরণে তিস্তা-III জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

- **উপকূলীয় ঝুঁকি এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ:** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে নোনা জল মিষ্টি জলের স্তরে (aquifers) ঢুকে পড়ে, যা **লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ (Saline Intrusion)** নামে পরিচিত। এটি পানীয় ও সেচের জলকে দূষিত করে এবং মাটির লবণাক্ততা বাড়িয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।
    - **উদাহরণ: সুন্দরবনে** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষকরা ধান চাষ ছেড়ে লবণ-সহিষ্ণু ফসল বা চিংড়ি চাষে বাধ্য হচ্ছেন, যা মাটির গুণমান আরও নষ্ট করছে।
- **কৃষি চাপ এবং জল-খাদ্য-জলবায়ু নেক্সাস:** কৃষি জলের উপর নির্ভরশীল এবং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার ও কারণ উভয়ই। প্রথাগত ধান চাষ বৈশ্বিক মিথেন নির্গমনের ১০-১৫% জন্য দায়ী।
    - ভারতের ৫০% নিট চাষযোগ্য জমি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল, ফলে বর্ষার সময় পরিবর্তনের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ও মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বাড়ছে (যেমন- ২০২৪ সালের তাপপ্রবাহ ও অকাল বৃষ্টিতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গমের ফলন হ্রাস)।
- **জল-শক্তি ফিডব্যাক লুপ:** ভূপৃষ্ঠের জল কমে গেলে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, যার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।
    - এই বিদ্যুৎ মূলত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও তীব্র করে।
    - **উদাহরণ: তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানায়** ভূগর্ভস্থ জলের স্তর **৩০০-৫০০ মিটার** নিচে নেমে যাওয়ায় কৃষি বিদ্যুতের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে।

বেলেম অভিযোজন সূচক

৫৯টি বেলেম অভিযোজন সূচক, যা UAE Framework for Global Climate Resilience-এর অধীনে গৃহীত হয়েছে, জলনিরাপত্তার সংজ্ঞাকে পুনর্নির্ধারণ করেছে। এটি কেবল পরিকাঠামো বা **'সম্পদ সৃষ্টি' (Asset Creation)** নয়, বরং জলবায়ু সংকটের সময় জল ব্যবস্থার **'কার্যকরী নির্ভরযোগ্যতা' (Functional Reliability)** নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়। এটি দুটি প্রধান স্তরে বিভক্ত:

- **স্তর ১ - জলবায়ু-সহনশীল WASH ব্যবস্থা:** জলবায়ু-প্ররোচিত জলের অভাব হ্রাস এবং বন্যা ও খরা মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরি করা। এর লক্ষ্য হলো পরিকাঠামোকে এমনভাবে উন্নত করা যাতে চরম আবহাওয়ার সময়ও **নিরাপদ পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ** বজায় থাকে।
- **স্তর ২ - প্রো-অ্যাক্টিভ রিস্ক গভর্নেন্স:** এটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেয়। এর লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে সর্বজনীন **মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম** চালু করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশের **জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন (Vulnerability Assessments)** আপডেট করা।

জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব

জল হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করার প্রধান মাধ্যম, যা পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং মানব অস্তিত্বের মধ্যে **'কানেক্টিভ টিস্যু'** হিসেবে কাজ করে। শহরের জলাশয়গুলো কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার (BGI)**।

ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার (BGI)-এর সংজ্ঞা: এটি মূলত প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক এলাকার একটি পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক।

- **'ব্লু' (Blue):** নদী, হ্রদ এবং জলাভূমি।
- **'গ্রিন' (Green):** পার্ক, গাছপালা এবং উদ্যান। এর মূল লক্ষ্য হলো **'রিজেনারেটিভ আরবানজম'** (প্রকৃতিকে জলচক্র ব্যবস্থাপনার সুযোগ দেওয়া যাতে বৃষ্টির জল ড্রেন দিয়ে বের না করে সেখানেই শোষণ ও সঞ্চয় করা যায়)।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান বার্তাবাহক:** জলবায়ু পরিবর্তন মূলত জলচক্রের চরম অবস্থার একটি **'ত্রয়ী' (Trilemma)** হিসেবে প্রকাশ পায়: অতিবৃষ্টি (বন্যা), অনাবৃষ্টি (খরা) এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি।

- **বন্যা প্রশমন ও বাফারিং:** জলাভূমিগুলো **'প্রাকৃতিক স্পঞ্জ'** হিসেবে কাজ করে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল শোষণ করে। চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের বন্যা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে জলাশয় ভরাটের কারণেই সেখানে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে।
- **ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ:** কংক্রিটে ঢাকা শহরে জলাশয়গুলোই হলো বৃষ্টির জল মাটির নিচে পৌঁছানোর প্রধান পথ। **বেঙ্গালুরুতে** জলাশয় কমে যাওয়ায় ২০ বছরে জলের স্তর ২৮ মিটার থেকে ৩০০ মিটারের নিচে নেমে গেছে।
- **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ:** বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলাশয়গুলো শহরের তাপমাত্রা কমিয়ে **'আরবান হিট আইল্যান্ড' (UHI)** প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।
- **প্রাকৃতিক জল পরিশোধন:** জলাভূমিগুলো শহরের **'প্রাকৃতিক কিডনি'** হিসেবে কাজ করে দূষক ও বর্জ্য ফিল্টার করে। **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (EKW)** প্রতিদিন কোনো খরচ ছাড়াই ৯০০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল পরিশোধন করে।
- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** জলাশয়গুলো শহরের ধূসর ধূসর পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট হিসেবে কাজ করে। হায়দ্রাবাদের **নেকনমপুর হ্রদ 'ফ্লোটিং ট্রিটমেন্ট ওয়েটল্যান্ড'** ব্যবহার করে পাখির আবাসস্থল ফিরিয়ে এনেছে।

জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের শহুরে জনসংখ্যা **৬৭ কোটি ৫০ লক্ষ** ছুঁয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ২০২৩ সালের **জলাশয় শুমারি (Waterbody Census)** অনুযায়ী, ভারতের ২৪ লক্ষ জলাশয়ের মাত্র **২.৯%** শহরে অবস্থিত, যার একটি বড় অংশ দূষণ ও জবরদখলের কারণে বর্তমানে অব্যবহৃত।

১. **পদ্ধতিগত অভাব এবং পরিকাঠামোর দুর্বলতা:** ভারতের জল পরিকাঠামো মূলত গড় আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা চরম জলবায়ু পরিস্থিতির জন্য **"স্ট্রেস-টেস্ট"** (Stress-tested) করা হয়নি।

- **মূল সমস্যা:** মনোযোগ কেবল সংযোগ বাড়ানোর ওপর, কিন্তু জরুরি অবস্থার জন্য **উৎসের বৈচিত্র্যকরণ** এবং **সিস্টেম রিডানড্যান্সি** (বিকল্প ব্যবস্থা) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

২. **অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর অভিযোজন অর্থায়ন:** ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক **১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের** বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকৃত অর্থায়ন অনিশ্চিত। জল প্রকল্পগুলোকে প্রায়ই **"সেক্টরাল কস্ট"** (সাধারণ খরচ) হিসেবে দেখা হয়, উচ্চ-মূল্যের **"জলবায়ু বিনিয়োগ"** হিসেবে নয়।

- **মূল সমস্যা:** পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে শহরগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বদলে কেবল **দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের** (Reactive) ওপর মনোনিবেশ করে।

৩. **মানবকেন্দ্রিক বনাম পরিবেশকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব:** অনেক পুনরুদ্ধার প্রকল্প পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের চেয়ে **কসমেটিক বিউটিফিকেশন** (যেমন গ্রানাইটের জগিং ট্র্যাক বা ফোয়ারা) ওপর জোর দেয়। এই ধরণের হস্তক্ষেপ জলাশয়ের **হাইড্রোলজিক্যাল ফাংশন** (জল শোধন বা ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করার ক্ষমতা) নষ্ট করে দেয়।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন (Silos):** জল শাসনের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিভক্ত। যেমন—রাজস্ব বিভাগ জমির মালিক, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গুণমান তদারকি করে এবং পুরসভা জল সরবরাহ নিশ্চিত করে।

- **মূল সমস্যা:** এই সমন্বয়হীনতা **"ইমপ্লিমেন্টেশন প্যারালাইসিস"** সৃষ্টি করে, যেখানে এক বিভাগের প্রচেষ্টা অন্য বিভাগের সিদ্ধান্তের কারণে ব্যর্থ হয়।

৫. **ডিজিটাল ব্যবধান এবং খণ্ডিত তথ্য:** ভারতের প্রচুর হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য থাকলেও তা বিভিন্ন বিভাগে খণ্ডিত অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনায় **AI-চালিত রিয়েল-টাইম তথ্যের** সমন্বয় খুবই নগণ্য।

- **মূল সমস্যা:** তথ্যের সঠিক আদান-প্রদান না থাকায় শহর পরিচালকরা দ্রুত ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

কেস স্টাডি	অবস্থান	মূল উদ্ভাবন/মডেল
জাক্কুর লেক	বেঙ্গালুরু	**ইন্টিগ্রেটেড মডেল:** জল শোধনের জন্য স্যুয়ারেজ প্ল্যান্টের সাথে প্রাকৃতিক জলাভূমির সমন্বয়।
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি	পশ্চিমবঙ্গ	**"প্রাকৃতিক কিডনি":** প্রতিদিন ৯০০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল শোধন করে এবং মৎস্য চাষে সহায়তা করে।
নেকনমপুর লেক	হায়দ্রাবাদ	**NbS মডেল:** পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি 'ফ্লোটিং ট্রিটমেন্ট ওয়েটল্যান্ড' ব্যবহার।
চেওংইয়েচিওন	সিউল, দ. কোরিয়া	**গ্রিনওয়ে মডেল:** একটি হাইওয়ে সরিয়ে ঢাকা পড়ে থাকা নদী পুনরুদ্ধার; এটি তাপমাত্রা ৩-৫°C কমিয়ে দিয়েছে।
সিঙ্গাপুর/চীন-		**স্পঞ্জ সিটি মডেল:** বৃষ্টির জল শোষণের জন্য প্রাকৃতিক নদী এবং ফ্লাডপ্লেন ব্যবহার।

জলকেন্দ্রিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **সমন্বিত জল শাসন:** বিভিন্ন জল-সম্পর্কিত বিভাগগুলোকে একীভূত করতে **জল শক্তি মন্ত্রক (Ministry of Jal Shakti)** গঠন করা হয়েছে, যা জল সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।
- **ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনা: ন্যাশনাল অ্যাকুইফার ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলস্তরের (Aquifers) মানচিত্র তৈরি এবং ভূগর্ভস্থ জলের টেকসই ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **পানীয় জল নিরাপত্তা: জল জীবন মিশন (Jal Jeevan Mission)** প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে কার্যকরী ট্যাপ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- **নদী পুনরুজ্জীবন: ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (NMCG)** গঙ্গা অববাহিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারে কাজ করে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা: জলীয় স্থিতিস্থাপকতার জন্য একটি পুনরুজ্জীবনমূলক রোডম্যাপ

১. **নীতির অভিসরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক একীকরণ (Policy Convergence):** নতুন কোনো মিশন তৈরির বদলে বর্তমান মিশনগুলোকে (যেমন- **জল জীবন**, AMRUT 2.0, **স্মার্ট সিটি**) **বেলেম সূচকগুলোর (Belém Indicators)** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
   - **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি:** ২০১৯ সালে **জল শক্তি মন্ত্রক** গঠনের মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যেই সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি তৈরি করেছে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** মিশন ড্যাশবোর্ডগুলোতে **'ক্লাইমেট স্ট্রেস মেট্রিক্স'** অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে চরম আবহাওয়ায় পরিকাঠামোর কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায়।

২. **সমন্বিত হাইড্রোলজিক্যাল পরিকল্পনা (Integrated Hydrological Planning):** শহরগুলোকে জলাশয়কে কেবল একটি 'সম্পদ' বা রিয়েল এস্টেট হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে। **লেক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (LMPs)**-কে আইনিভাবে **সিটি মাস্টার প্ল্যান**-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** NAQUIM 2.0-এর তথ্য ব্যবহার করে কেবল মানচিত্র তৈরি নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। জলাশয়ের পুরো **ক্যাচমেন্ট এরিয়া** (জল সংগ্রহের এলাকা) এবং ইনলেট ড্রেনগুলো রক্ষা করা জরুরি।

৩. **"স্পঞ্জ সিটি" (Sponge City) কাঠামোর গ্রহণ:** শহুরে নকশাকে জল 'নিষ্কাশন' করার বদলে জল 'শোষণ' করার দিকে চালিত করতে হবে। শহরগুলোকে একটি স্পঞ্জের মতো নকশা করতে হবে যা বৃষ্টির জল শোষণ, সঞ্চয় এবং পরিশোধন করতে পারে।

- **মূল পদক্ষেপ:** বৃষ্টির জল সরাসরি ড্রেনে না পাঠিয়ে তা মাটিতে রিচার্জ করার জন্য **নেচার-বেসড সলিউশন (NbS)** যেমন- পারমিবল পেভমেন্ট এবং রেইন গার্ডেন ব্যবহার করা।

৪. **চক্রাকার জল অর্থনীতি:** জলের ব্যবহারকে 'রৈখিক' (ব্যবহার ও ফেলে দেওয়া) থেকে **'চক্রাকার'** (হ্রাস-পুনঃব্যবহার-পুনশ্চক্রায়ন) মডেলে নিয়ে আসতে হবে। শোধিত বর্জ্য জলকে আবর্জনা না ভেবে জলাশয় পুনরুজ্জীবনের সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে।

- **মূল পদক্ষেপ:** ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ কমাতে শিল্পকারখানা এবং কুলিং সিস্টেমে **শোধিত বর্জ্য জলের পুনঃব্যবহার** বাধ্যতামূলক করা।

৫. **পরিকাঠামোর ক্লাইমেট স্ট্রেস-টেস্টিং:** বাঁধ, পাইপ এবং ড্রেন সহ সমস্ত জল পরিকাঠামোকে চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতির জন্য **'স্ট্রেস-টেস্ট'** করতে হবে।

- **মূল পদক্ষেপ:** ঐতিহাসিক গড় বৃষ্টিপাতের তথ্যের ওপর নির্ভর না করে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় **"১০০ বছরে একবার ঘটা" (1-in-100-year)** বন্যার মতো চরম পরিস্থিতি সামলানোর উপযোগী নকশা নিশ্চিত করা।

৬. **ডিজিটাল পরিকাঠামো ও AI-এর সমন্বয়:** ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এমন **ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করতে হবে যা সেন্সর এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।

- **মূল পদক্ষেপ: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)** ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সাথে শহরের জল ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সরাসরি সংযোগ ঘটানো।

৭. **গোষ্ঠীগত তদারকি ও সাধারণ সম্পদের সুরক্ষা:** স্থিতিস্থাপকতা তখনই সফল হয় যখন তা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়। স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে একটি **তদারকি মডেলে** (Stewardship Model) নিয়ে যেতে হবে যা প্রথাগত ব্যবহারকারীদের অধিকার রক্ষা করে।

- **মূল পদক্ষেপ: মহল্লা সমিতি** এবং স্থানীয় এনজিওগুলোকে (যেমন- বেঙ্গালুরুর PNLIT) ক্ষমতায়ন করা, যাতে মৎস্যজীবী এবং কৃষকরা জলাশয়গুলোকে তাদের অভিন্ন ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি জলীয় চ্যালেঞ্জ, কারণ জলচক্রের বিঘ্ন বন্যা, খরা এবং জল নিরাপত্তাহীনতাকে বাড়িয়ে তোলে। কেবল সম্পদ সৃষ্টির বদলে পদ্ধতিগত স্থিতিস্থাপকতার ওপর জোর দিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ মিশনগুলোকে **বেলেম সূচকের** সাথে সমন্বয় করে ভারত গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল তৈরি করতে পারে, যা **Water Vision 2047**-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

Q. জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি জল সংকট। জলচক্রের বিঘ্ন কীভাবে ভারতে আর্থ-সামাজিক দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলছে তা পরীক্ষা করুন।

3.2.2. জলবায়ু বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা: কঠোর প্রমাণ এবং ক্রস-ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ

ভূমিকা

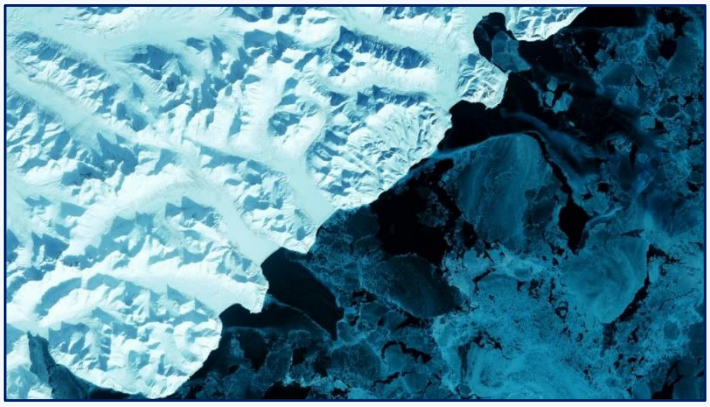

- **জলবায়ু বিজ্ঞান** পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ, **ভৌত সূত্র** (Physical Laws) এবং **স্বতন্ত্র যাচাইকরণের** (Independent Verification) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- সাম্প্রতিককালে বিশ্ব উষ্ণায়নের বাস্তবতা নিয়ে— বিশেষ করে **সমুদ্রের তাপ ধারণক্ষমতা** (Ocean Heat Content) এবং **পৃথিবীর শক্তির**

ভারসাম্যহীনতা (EEI) নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো, বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্যতা কীভাবে নিশ্চিত করা হয় তা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।

- এটি প্রমাণিত যে, জলবায়ু বিজ্ঞানের শক্তি কোনো বিচ্ছিন্ন ডেটাসেট থেকে আসে না, বরং একাধিক **স্বতন্ত্র পদ্ধতির সমন্বয় (Convergence of Independent Methods)** থেকে আসে। এর মাধ্যমেই এর **নির্ভুলতা (Accuracy)**, **নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)** এবং **নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা (Policy Relevance)** নিশ্চিত করা হয়।

পটভূমি

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) বলতে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনকে বোঝায়, যা মূলত মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন **গ্রিনহাউস গ্যাসের (Greenhouse Gas)** ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের কারণে ঘটে। ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং UNEP কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত IPCC **(Intergovernmental Panel on Climate Change)** তাদের **অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (Assessment Reports - AR6)** এর মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রমাণগুলি সংশ্লেষণ করে।

IPCC AR6-এর প্রধান ফলাফলসমূহ:

- **অতিরিক্ত তাপ (Excess Heat):** উৎপাদিত অতিরিক্ত তাপের **৯০%-এরও বেশি** অংশ **সমুদ্র (Oceans)** দ্বারা শোষিত হয়।
- **ত্বরান্বিত উষ্ণায়ন (Acceleration):** সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলি নিশ্চিত করে যে **সমুদ্রের তাপ ধারণক্ষমতা (Ocean Heat Content)** ২০২৫ সালে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০০৫ সালের পরবর্তী উষ্ণায়নের হার পূর্ববর্তী দশকগুলোর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এই তথ্যগুলি **প্যারিস চুক্তির (Paris Agreement)** মতো আন্তর্জাতিক কাঠামোকে সমর্থন করে এবং ভারতের NDC (Nationally Determined Contributions) সংক্রান্ত জলবায়ু নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে।
- **পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যহীনতা (Earth's Energy Imbalance - EEI):** আগত সৌর বিকিরণ এবং নির্গত পার্থিব বিকিরণের মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ EEI, ১৯৭১-২০১৮ সালের মধ্যে ছিল প্রায় **০.৫৭ W/m^2**, যা ২০০৬-২০১৮ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় **০.৭৯ W/m^2**।
- **তাপমাত্রা বৃদ্ধি:** বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় প্রায় **১.১°C বৃদ্ধি** পেয়েছে।

মূল বৈজ্ঞানিক ধারণা

১. **তাপমাত্রা (Temperature):** এটি একটি **ইনটেনসিভ প্রপার্টি (Intensive Property)**; অর্থাৎ এটি বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না।

২. **তাপীয় শক্তি (Thermal Energy):** এটি একটি **এক্সটেনসিভ প্রপার্টি (Extensive Property)**; এটি বস্তুর **ভর (Mass)** এবং **তাপমাত্রা**—উভয়ের ওপর নির্ভর করে। সমুদ্রের মোট তাপ ধারণক্ষমতা পরিমাপের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

উত্থাপিত মূল সমস্যা এবং বৈজ্ঞানিক স্পষ্টীকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ডেটা হ্যান্ডলিং বা তথ্য পরিচালনার তিনটি নির্দিষ্ট দাবির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত পদ্ধতিগুলি ইতিমধ্যেই এই উদ্বেগগুলি সমাধান করেছে।

১. তাপমাত্রা এবং তাপ পরিমাপ সংক্রান্ত দাবি

তাপমাত্রা প্রতি অণুর গড় গতিশক্তি পরিমাপ করে এবং এটি পদার্থের ভরের ওপর নির্ভর করে না, তাই এটি একটি **ইনটেনসিভ প্রপার্টি (Intensive Property)**। সমালোচকদের মতে, এর ফলে সমুদ্রের মোট তাপের সঠিক গড় বের করা সম্ভব নয়।

- **স্পষ্টীকরণ:** বিজ্ঞানীরা **তাপীয় শক্তি (Thermal Energy)** গণনা করেন যা একটি **এক্সটেনসিভ কোয়ান্টিটি (Extensive Quantity)**। এটি তাপমাত্রা, ভর এবং আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতার গুণফল। সময়ের সাথে সাথে এই মোট শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা উষ্ণায়নের প্রমাণ দেয়।
- এই একই যুক্তি গড় বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। আয়তন এবং ঘনত্বের তথ্যের সাথে তাপমাত্রার গড় মিলিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য **হিট-কন্টেন্ট এস্টিমেট** পাওয়া যায়।

২. **আর্গো ফ্লোটস (Argo Floats) এবং সমুদ্র পর্যবেক্ষণের অনিশ্চয়তা**

আর্গো প্রোগ্রাম হাজার হাজার স্বয়ংক্রিয় ফ্লোট ব্যবহার করে যা বিশ্বজুড়ে সমুদ্রের **২,০০০ মিটার গভীরতা** পর্যন্ত তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা পরিমাপ করে। তথ্যের ঘাটতি বা **মেসোস্কেল অ্যালিয়াসিং (Mesoscale Aliasing)** নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, সমুদ্রবিজ্ঞানীরা তা নিচের পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সমাধান করেন:

- **স্বতন্ত্র গণনা পদ্ধতি:** একাধিক ভিন্ন পদ্ধতিতে গণনা করা হয় যা একই ফলাফল দেয়।
- **সংবেদনশীলতা পরীক্ষা (Sensitivity Tests):** তথ্যের কিছু অংশ সরিয়ে নিয়ে দেখা হয় ফলাফল একই থাকছে কি না।
- **স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট সিস্টেমের সাথে তুলনা:**
  - **অল্টিমেট্রি স্যাটেলাইট:** সমুদ্রপৃষ্ঠের মোট উচ্চতা বৃদ্ধি পরিমাপ করে।
  - GRACE **স্যাটেলাইট:** মাধ্যাকর্ষণ পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগ হওয়া জলের ভর ট্র্যাক করে।
  - **ফলাফল:** তাপের কারণে হওয়া সমুদ্রের **প্রসারণ (Steric Expansion)** আর্গো থেকে পাওয়া তাপের তথ্যের সাথে হুবহু মিলে যায়।

৩. CERES-Argo **ক্রস-ক্যালিব্রেশনে 'বৃত্তাকার যুক্তি' বা সার্কুলারিটি (Circularity)**

নাসা-র CERES যন্ত্রগুলি বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে আগত সৌর বিকিরণ এবং নির্গত শর্টওয়েভ ও লংওয়েভ বিকিরণ পরিমাপ করে।

- **EBAF (Energy Balanced and Filled):** এই প্রক্রিয়াটি ফ্লাক্সগুলিকে এমনভাবে সমন্বয় করে যাতে গড় নেট ফ্লাক্স আর্গো-র অনুমিত **০.৭১ W/m^2** এর সাথে মিলে যায়। সমালোচকরা একে "বৃত্তাকার" বলেন কারণ আর্গো ক্যালিব্রেশনে সাহায্য করে আবার CERES তাপের পরিমাণ যাচাই করে। কিন্তু বাস্তবে:
- **ব্যালেন্সিং (Balancing):** এটি কেবল দীর্ঘমেয়াদী গড়ের ওপর একটি **ধ্রুবক অফসেট (Constant Offset)** প্রয়োগ করে।
- **ফিলিং (Filling):** এটি মেঘের কারণে তৈরি হওয়া তথ্যের ঘাটতি পূরণ করে।
- **উষ্ণায়নের প্রবণতা:** CERES ডেটার প্রতি মাসের পার্থক্যের ওপর উষ্ণায়নের প্রমাণ নির্ভর করে, যা এই ধ্রুবক অফসেট দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি ৩.৬ একক সব মাসের সাথে যোগ করা হয়, তবে দুই মাসের পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে উষ্ণায়নের প্রমাণ **আর্গো-র ওপর নির্ভরশীল নয়**।

অতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রমাণ

বিজ্ঞানীরা আরও বেশ কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে **পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যহীনতা (EEI)** পরিমাপ করেন যা CERES-Argo ফলাফলের সাথে মিলে যায়:

- **অ্যাটমোস্ফিয়ারিক রিঅ্যানালাইসিস (Atmospheric Reanalyses)**।
- গবেষণা জাহাজ থেকে পাওয়া গভীর সমুদ্রের তাপমাত্রার রেকর্ড।
- পৃষ্ঠতলের উষ্ণায়ন দ্বারা পরিচালিত **ফিজিক্যাল ক্লাইমেট মডেল**। যদি শক্তির ভারসাম্যহীনতা শূন্য হতো, তবে এই সমস্ত স্বতন্ত্র সিস্টেমগুলিকে আলাদা আলাদা কারণে ভুল হতে হতো—যা কার্যত অসম্ভব। নির্ভরযোগ্য গবেষণায় সবসময় এই ধরনের **ফ্যালসিফিকেশন চেক (Falsification Checks)** করা হয়।

বৈশ্বিক এবং ভারতীয় নীতি কাঠামোর ওপর প্রভাব

জলবায়ু বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা কোনো একক ডেটাসেট বা জার্নালের খ্যাতির ওপর নয়, বরং **প্রমাণের সমন্বয়ের (Convergence of Evidence)** ওপর নির্ভরশীল। এই ভিত্তিটি UNFCCC, **কিয়োটো প্রোটোকল** এবং **প্যারিস চুক্তির** অধীনে তথ্য-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে।

ভারতের মতো একটি **অত্যন্ত সংকটাপন্ন (Highly Vulnerable)** দেশ, যার দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং মৌসুমি বায়ুনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে নির্ভরযোগ্য তথ্য নিচের বিষয়গুলিকে যৌক্তিক করে তোলে:

- **অভিযোজনমূলক ব্যবস্থা (Adaptation Measures):** যেমন উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ (Coastal Regulation) এবং **হিট অ্যাকশন প্ল্যান (Heat Action Plans)**।
- **প্রশমন (Mitigation):** পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ক্ষমতা)।
- **জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance):** বৈশ্বিক আলোচনায় **'সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়বদ্ধতা' (CBDR)** নীতির ভিত্তিতে ক্ষতি ও লোকসানের (Loss-and-Damage) জন্য সহায়তার দাবি জানানো।

সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পদক্ষেপ নিতে দেরি করলে তা **খাদ্য নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য** এবং **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs)** ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

আগামীর পথ: নির্ভরযোগ্যতা এবং জলবায়ু পদক্ষেপ শক্তিশালীকরণ

১. **পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা**
   - **আর্গো নেটওয়ার্কের (Argo Network)** বিস্তার গভীর সমুদ্র পর্যন্ত (২০০০ মিটারের নিচে) প্রসারিত করা।
   - **স্যাটেলাইট মিশন (CERES, GRACE)** সমূহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।
   - তথ্যের ঘাটতি এবং অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

২. **তথ্যের স্বচ্ছতা এবং সহজলভ্যতা প্রচার**
   - **উন্মুক্ত জলবায়ু ডেটাসেট (Open-access Datasets)** নিশ্চিত করা।
   - বিশ্বব্যাপী গবেষকদের মাধ্যমে **স্বতন্ত্র যাচাইকরণকে (Independent Verification)** উৎসাহিত করা।

৩. **বৈজ্ঞানিক কঠোরতা এবং পিয়ার-রিভিউ উন্নত করা**
   - **পিয়ার-রিভিউ (Peer-review)** প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করা।
   - গবেষণার পুনরাবৃত্তি এবং **ফ্যালসিফিকেশন টেস্ট (Falsification Tests)** বা ভুল প্রমাণের পরীক্ষাকে উৎসাহিত করা।

৪. **জলবায়ু সাক্ষরতা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বৃদ্ধি**
   - শিক্ষা এবং UPSC **পাঠ্যক্রমে** জলবায়ু বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা।
   - জনসমক্ষে **তথ্য-ভিত্তিক যুক্তিবাদ (Evidence-based Reasoning)** প্রচার করা এবং অপপ্রচার মোকাবিলা করা।

৫. **সুশাসনে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি**
   - জলবায়ু তথ্যকে **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (NDMA কাঠামো)** এবং নগর পরিকল্পনায় মূলধারায় নিয়ে আসা।
   - নীতি প্রণয়নে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যবহার করা।

৬. **বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করা**
   - IPCC-**নেতৃত্বাধীন** প্রমাণের সংশ্লেষণকে সমর্থন করা।
   - জলবায়ু গবেষণায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে জাতীয় নীতিগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

উপসংহার

জলবায়ু বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা ভিন্নমতকে স্তব্ধ করার ওপর নির্ভর করে না, বরং **স্বতন্ত্র প্রমাণের (Independent Proof)** ওপর নির্ভর করে। বর্তমান জলবায়ু বিজ্ঞানকে "ভুল" প্রমাণ করতে হলে যেকোনো নতুন তত্ত্বকে কেবল একটি ছোট অনিশ্চয়তা দেখালেই হবে না, বরং এটিও ব্যাখ্যা করতে হবে যে কেন স্যাটেলাইট, সমুদ্রের ফ্লোট, বরফের কোর (Ice Cores) এবং ফিজিক্যাল মডেলের মতো একাধিক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা একই সাথে একটি **সামঞ্জস্যপূর্ণ উষ্ণায়নের প্রবণতা (Consistent Warming Trend)** দেখাচ্ছে।

Q. Uncertainty is inherent in climate science, but it does not undermine its conclusions. Discuss how scientific methods address uncertainties in climate data.

3.3. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.3.1. ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক **আমেরিকা-ইরান উত্তেজনা** চলাকালীন **স্যাচুরেশন স্ট্রাইক** (একঝাঁক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা) রুখতে **প্যাট্রিয়ট (Patriot)** এবং **অ্যারো (Arrow)**-এর মতো **ইন্টারসেপ্টর** বা প্রতিষেধক ব্যবস্থার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী এবং বহুতর বিশিষ্ট ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঢালের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কী?

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (MDS) হলো একটি সামরিক কাঠামো যা কোনো শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগেই সেটিকে **শনাক্ত (Detect), অনুসরণ (Track), প্রতিহত (Intercept) এবং ধ্বংস** করতে সক্ষম।

এটি আকাশের একটি **সুরক্ষা কবজ** হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের শহর, সামরিক ঘাঁটি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে নিচের হুমকিগুলো থেকে রক্ষা করে:

- **ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র:** (দীর্ঘপাল্লার এবং উচ্চগতির ক্ষেপণাস্ত্র যা অধিবৃত্তাকার পথে চলে)
- **ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র:** (নিচু দিয়ে উড়ে আসা নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র)
- **রকেট এবং কামানের গোলা**
- **ড্রোন** বা মানুষহীন বিমান

এটি কীভাবে কাজ করে: চারটি প্রধান ধাপ

১. **শনাক্তকরণ (Detection):** শক্তিশালী ভূমি-ভিত্তিক **রাডার** বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের তাপ বা সংকেত ধরা হয়।

২. **ট্র্যাকিং ও পার্থক্যকরণ (Tracking & Discrimination):** কম্পিউটার ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ গণনা করে এবং আসল **ওয়ারহেড** বা যুদ্ধাস্ত্রের সাথে শত্রুর বিভ্রান্তিকর **"ডেকয়"** (নকল লক্ষ্যবস্তু)-এর পার্থক্য খুঁজে বের করে।

৩. **প্রতিহত করা (Interception):** একটি **ইন্টারসেপ্টর মিসাইল** উৎক্ষেপণ করা হয়, যা তার নিজস্ব সেন্সর ব্যবহার করে ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়।

৪. **ধ্বংস করা (Destruction):** ইন্টারসেপ্টরটি সরাসরি ধাক্কা মেরে (**কাইনেটিক কিল**) বা কাছে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে (**ব্লাস্ট ফ্র্যাগমেন্টেশন**) শত্রু ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ধ্বংস করে দেয়।

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব

১. **কৌশলগত গুরুত্ব: "নো ফার্স্ট ইউজ" (NFU) নীতিকে মজবুত করা**

- **দ্বিতীয়বার প্রত্যাঘাতের সক্ষমতা:** ভারত নিজে আগে পরমাণু হামলা করবে না—এই নীতি মেনে চললে শত্রুর প্রথম আঘাত সহ্য করে টিকে থাকা জরুরি। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতের পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখে।
- **পরমাণু ব্ল্যাকমেইল মোকাবিলা:** এটি শত্রুর ছোট ছোট পরমাণু হামলার ভয় দেখিয়ে ভারতকে যুদ্ধের ময়দানে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

২. **জাতীয় নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষা**

- **গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু সুরক্ষা (HVTs):** এটি **নয়াদিল্লি, মুম্বাইয়ের** মতো বড় শহর এবং পারমাণবিক কেন্দ্র ও তেল শোধনাগারগুলোকে রক্ষা করে।
- **বহুস্তরীয় নিরাপত্তা:** এটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে ড্রোন পর্যন্ত সব ধরণের হুমকির বিরুদ্ধে ৩৬০-ডিগ্রি সুরক্ষা দেয়।

৩. **ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব**

- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** রাশিয়ার S-400 বা আমেরিকার প্যাট্রিয়টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থা (PAD/AAD) তৈরি করা ভারতকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সময়ও স্বাধীন রাখে।
- **আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য:** প্রতিবেশী দেশগুলোর ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতার বিরুদ্ধে এটি একটি ভারসাম্য রক্ষা করে এবং আঞ্চলিক অস্থিরতা কমায়।

৪. **প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

- **প্রযুক্তির উন্নয়ন: সোর্ডফিশ রাডার (Swordfish radar)** এবং উন্নত সফটওয়্যারের বিকাশ ভারতের **"আত্মনির্ভর ভারত"** অভিযানকে শক্তিশালী করছে।
- **প্রতিরক্ষা রপ্তানি: আকাশ (Akash)**-এর মতো ব্যবস্থা রপ্তানি করে ২০২৯ সালের মধ্যে **৫০,০০০ কোটি টাকার** রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করবে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব**

- **জনসাধারণের আস্থা:** একটি দৃশ্যমান সুরক্ষা কবজ থাকলে উত্তেজনার সময়ে সাধারণ মানুষের মনোবল অটুট থাকে এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয় না।

ভারতের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা কর্মসূচি

১. **দীর্ঘপাল্লার প্রতিরক্ষা (Long-Range)**

এটি ৩০০ কিমি থেকে ৫,০০০ কিমি দূরের পারমাণবিক সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি মোকাবিলা করে।

- **ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স (BMD):**
  - Phase-I: ২,০০০ কিমি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে সক্ষম (চালু আছে)। এতে আছে PAD (মহাকাশে ধ্বংস করে) এবং AAD (বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ধ্বংস করে)।
  - Phase-II: ৫,০০০ কিমি+ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে সক্ষম (পরীক্ষাধীন)। এতে AD-1 এবং AD-2 ইন্টারসেপ্টর রয়েছে।
- **S-400 ট্রায়াম্ফ:** রাশিয়ার তৈরি ব্যবস্থা যা **৪০০ কিমি** দূর থেকেই একসাথে ৩৬টি লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে।
- **প্রজেক্ট কুশা (Project Kusha):** ভারতের নিজস্ব "S-400" যা **১৫০, ২৫০ এবং ৪০০ কিমি** পাল্লার লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারবে।

২. **মাঝারি পাল্লার প্রতিরক্ষা (Medium-Range: ৭০ কিমি – ১৫০ কিমি)**

- MRSAM (Barak-8): ইসরায়েলের সাথে যৌথভাবে তৈরি। এর পাল্লা **৭০-১০০ কিমি**।
- Akash-NG (Next Generation): ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নত ব্যবস্থা যার পাল্লা **৭০ কিমি**।

৩. **স্বল্প পাল্লার ও টার্মিনাল প্রতিরক্ষা (Short-Range: ৫০ কিমির নিচে)**

- **আকাশ (Akash):** ২৫-৩০ কিমি পাল্লার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা।
- QRSAM: সেনাবাহিনীর চলমান কলামকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা।

- **VSHORADS:** কাঁধে রেখে চালানো যায় এমন অতি স্বল্প পাল্লার (৬ কিমি পর্যন্ত) ব্যবস্থা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

- **আমেরিকা (USA):** বহুমুখী দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (THAAD, Patriot, Aegis/SM-3, মহাকাশ ভিত্তিক সেন্সর) এবং ভ্রাম্যমাণ মিসাইল-ডিফেন্স অ্যারে।
- **ইসরায়েল (Israel):** সমন্বিত বহুস্তরীয় মডেল। রকেটের জন্য Iron Dome, মাঝারি পাল্লার জন্য David's Sling এবং দীর্ঘপাল্লার জন্য Arrow। এটি স্বল্প ব্যয়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদে পারদর্শী।
- **রাশিয়া ও চীন:** দীর্ঘপাল্লার 'এরিয়া ডিনায়াল' আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (S-400, S-500 ক্লাস) — যেখানে রাডার এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।
- **চীন (উদীয়মান শক্তি):**
  - **HQ-9 সিরিজ:** এটি আমেরিকার Patriot বা রাশিয়ার S-300 এর সমতুল্য।
  - **CNMD (চীনা জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা):** আঞ্চলিক ব্যালিস্টিক হুমকি মোকাবিলায় আমেরিকার GMD-এর মতো 'মিড-কোর্স ইন্টারসেপ্টর' পরীক্ষা করছে।

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ**

- **হাইপারসনিক হুমকি: হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল (HGVs)** যা শব্দের চেয়ে ৫ গুণ বেশি গতিতে চলে এবং দিক পরিবর্তন করতে পারে, সেগুলোকে বর্তমান ব্যবস্থায় শনাক্ত করা ও ধ্বংস করা কঠিন।
- **MIRV প্রযুক্তি:** একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে অনেকগুলো স্বাধীন যুদ্ধাস্ত্র (MIRV) বের হলে তা প্রতিরক্ষা কবজকে বিভ্রান্ত করতে পারে (যেমন- চীনের DF-41)।
- **লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ:** মহাকাশের শূন্যতায় আসল পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র এবং বিভ্রান্তিকর **"ডেকয়"** (বেলুন বা ধাতব টুকরো)-এর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা অত্যন্ত জটিল।

২. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ**

- **অস্ত্র প্রতিযোগিতা (Security Dilemma):** প্রতিরক্ষা কবজ দেখে প্রতিপক্ষ দেশগুলো তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, যা আঞ্চলিক অস্থিরতা তৈরি করে।
- **নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা:** প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেশগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক পদক্ষেপে উৎসাহিত করতে পারে, যা পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **কৌশলগত বেষ্টনী:** চীন ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জটিল করে তোলে।

৩. **অর্থনৈতিক ও কার্যক্ষম চ্যালেঞ্জ**

- **উচ্চ ব্যয়:** একটি সস্তা রকেট বা ড্রোন ধ্বংস করতে ব্যবহৃত ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের (যেমন- S-400 বা PAD) দাম অনেক সময় কয়েক গুণ বেশি হয়।
- **ভৌগোলিক অবস্থান:** ভারতের বিশাল এলাকা জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রচুর পরিমাণে রাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি প্রয়োজন।
- **সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন:** রুশ (S-400), ইসরায়েলি (Barak) এবং ভারতীয় (Akash) ব্যবস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন**

- **হাইপারসনিক মোকাবিলা:** হাইপারসনিক গ্লাইড যান ধ্বংস করতে **AD-1** এবং **AD-2** ইন্টারসেপ্টর (**Phase-II**) তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।
- **ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন (DEWs):** সস্তা ড্রোন আক্রমণ রুখতে লেজার-ভিত্তিক প্রযুক্তি (যেমন- **"Durga-2"**) তৈরি করা, যা প্রতিটি আক্রমণের খরচ কমিয়ে আনবে।

২. **মহাকাশ-ভিত্তিক পরিকাঠামো**

- **আর্লি ওয়ার্নিং স্যাটেলাইট:** মহাকাশে ইনফ্রারেড সেন্সর মোতায়েন করা, যাতে শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মুহূর্তেই তা ধরা পড়ে এবং পাল্টা ব্যবস্থার জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যায়।
- **নেটওয়ার্ক সেন্ট্রিসিটি:** S-400, **প্রজেক্ট কুশা** এবং নৌবাহিনীর ব্যবস্থাকে একটি একক **Integrated Air Command and Control System (IACCS)**-এর অধীনে নিয়ে আসা।

৩. **কৌশলগত ও কূটনৈতিক গভীরতা**

- **প্রজেক্ট কুশার সম্প্রসারণ:** বিদেশি যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় **"প্রজেক্ট কুশা"** দ্রুত সম্পন্ন করে **"আত্মনির্ভরতা"** অর্জন করা।
- **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** শত্রুর গতিবিধির ওপর নজরদারি বাড়াতে **"Quad"** বা বন্ধু দেশগুলোর সাথে রাডার তথ্য ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি করা।

উপসংহার

AI-চালিত Phase-II ইন্টারসেপ্টর এবং **ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন** (লেজার অস্ত্র)-এর সমন্বয়ে ভারত একটি ভবিষ্যৎমুখী **"আত্মনির্ভর"** সুরক্ষা কবজ তৈরি করছে। এটি হাইপারসনিক হুমকি মোকাবিলা করে ভারতের কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং নিরাপদভাবে দ্বিতীয়বার প্রত্যাঘাত করার সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

Q. "অস্থিতিশীল আঞ্চলিক পরিবেশে জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী করার জন্য ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করুন এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় বাতলে দিন।"

3.3.2. অ্যানথ্রপিক বনাম মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং ওপেনএআই-এর কৌশলগত প্রবেশ

প্রেক্ষিত

- সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (**U.S. Department of Defense**) এবং ক্লদ এআই-এর (Claude AI) নির্মাতা সংস্থা **অ্যানথ্রপিক**-এর (Anthropic) মধ্যে একটি মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে।
- মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে **স্বয়ংক্রিয় ড্রোন হামলা** বা **অটোনোমাস স্ট্রাইক** সক্ষমতার ক্ষেত্রে অ্যানথ্রপিকের এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যাপক প্রবেশাধিকার (Access) দাবি করে।
- অ্যানথ্রপিক এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ সংস্থাটির নিজস্ব **এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক** বা নীতি অনুযায়ী, তাদের প্রযুক্তি কোনোভাবেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তৈরি বা ব্যাপকভিত্তিক নজরদারি (Surveillance) কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- এর পরেই, **ওপেনএআই** (OpenAI) মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা নির্দিষ্ট কিছু সুরক্ষাকবচ মেনে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের এআই ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

পটভূমি: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এআই এবং বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

ক. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) গুরুত্ব

আধুনিক সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে এআই এখন একটি অপরিহার্য উপাদান। কৌশলগত সুবিধা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-কে অন্তর্ভুক্ত করছে।

বর্তমানে এআই প্রযুক্তি যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে:

- **সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার যুদ্ধ:** নেটওয়ার্ক সুরক্ষা এবং শত্রুদেশের সাইবার আক্রমণ মোকাবিলায়।
- **সামরিক গোয়েন্দা বিশ্লেষণ:** বিশাল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে নিখুঁত গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরি।
- **স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা:** মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম ড্রোন বা রোবটিক অস্ত্র।
- **ড্রোন পরিচালনা ও রণক্ষেত্রের লজিস্টিকস:** যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ এবং ড্রোন নিয়ন্ত্রণ।
- **কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স:** যুদ্ধের পরিস্থিতি আগে থেকে আঁচ করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং **রাশিয়ার** মতো বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের **জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের** অংশ হিসেবে এআই উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

খ. বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থার ভূমিকা

- **উৎসের পরিবর্তন:** আগে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি মূলত সরকারি গবেষণাগারে (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে DRDO) তৈরি হতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নত এআই সক্ষমতা মূলত বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর হাতে কেন্দ্রীভূত।
- **নেতৃস্থানীয় সংস্থা:** অ্যানথ্রপিক, ওপেনএআই এবং গুগলের মতো সংস্থাগুলো এখন অত্যাধুনিক **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)** এবং এআই প্ল্যাটফর্ম তৈরির কেন্দ্রে রয়েছে।
- **সহযোগিতা ও সংঘাত:** এই পরিস্থিতির ফলে একদিকে যেমন সরকারের সাথে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতা বাড়ছে, অন্যদিকে কৌশলগত ও নৈতিক প্রশ্নে বড় ধরনের সংঘাতও তৈরি হচ্ছে।

মূল প্রযুক্তিগত ভিত্তি

ক. ক্লদ এআই (Claude AI) পরিচিতি

ক্লদ এআই হলো অ্যানথ্রপিক (Anthropic) দ্বারা নির্মিত একটি উন্নত এআই চ্যাটবট এবং কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **আর্কিটেকচার:** ক্লদ মূলত **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)** আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা অত্যন্ত উন্নত মানের টেক্সট এবং প্রোগ্রামিং কোড তৈরি করতে সক্ষম।
- **সফটওয়্যার সহায়তা:** এটি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি, সম্পাদনা (Edit) এবং সেগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে (Optimize) সহায়তা করে।
- **সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন:** প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যার লাইব্রেরির অ্যাক্সেস থাকলে এই সিস্টেমটি নতুন টুল তৈরি এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও সাহায্য করতে পারে।

খ. ক্লদ কোড (Claude Code) প্ল্যাটফর্ম কী?

'ক্লদ কোড' নামক একটি বিশেষায়িত ফিচার বর্তমানে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এটি মূলত জটিল কোডিং টাস্ক এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজে পারদর্শিতা প্রদর্শনের কারণে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

গ. প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত প্রয়োগে এর গুরুত্ব

উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনার কারণে ক্লদ এআই প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছে।

এই সিস্টেমটি প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনে যেভাবে অবদান রাখতে পারে:

- **গতি ত্বরান্বিত করা:** সামরিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত জটিল সফটওয়্যার সিস্টেমগুলোর বিকাশের গতি বৃদ্ধি করা।
- **উন্নত প্ল্যাটফর্মের উন্নতি:** আধুনিক প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্ম এবং কৌশলগত প্রযুক্তিগুলোর গুণগত মানোন্নয়নে সহায়তা করা।
- **নিরাপত্তা ছাড়পত্রের (Security Clearance) জটিলতা হ্রাস:** বিশেষায়িত প্রোগ্রামারদের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তার ফলে সৃষ্ট বিলম্ব কমাতে এটি সাহায্য করে।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাধারণত অত্যন্ত গোপনীয় এবং **শ্রেণিবদ্ধ** (Classified) পরিবেশে সম্পন্ন হয়, যার ফলে যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীরগতির হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ক্লদ-এর মতো **এআই কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট** ডেভেলপমেন্টের সময়সীমাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে, বিশেষ করে যখন অভিজ্ঞ সফটওয়্যার ডেভেলপাররা সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর কাজ করেন।

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে মতপার্থক্য

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে মূলত এআই ব্যবহারের **নৈতিক সীমাবদ্ধতা** নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে; বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং নজরদারির ক্ষেত্রে।

- **প্রাথমিক সহযোগিতা:** ২০২৫ সালে অ্যানথ্রপিক মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করে। এর আওতায় সরকার **'অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস'**-এর সুরক্ষিত ক্লাউড পরিকাঠামোর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়নে **'ক্লদ এআই'** ব্যবহারের সুযোগ পায়।
- **মার্কিন সামরিক এআই নীতিতে পরিবর্তন:** ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ **"অ্যাক্সিলারেটিং আমেরিকাস মিলিটারি এআই ডমিন্যান্স"** শীর্ষক একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করেন। এই নীতির লক্ষ্য ছিল নিম্নোক্ত বাধাগুলো দূর করে সামরিক ব্যবস্থায় এআই-এর প্রয়োগ দ্রুততর করা:
  - ডেটা শেয়ারিং বা তথ্য আদান-প্রদানের সীমাবদ্ধতা।
  - দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা এবং শংসাপত্র প্রক্রিয়া।
  - চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।
- **অ্যানথ্রপিকের এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক:** অ্যানথ্রপিক **"এআই কনস্টিটিউশন"** নামক একটি নৈতিক কাঠামো অনুসরণ করে, যা নিচের বিষয়গুলোতে এআই ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে:
  - গণ-নজরদারি।
  - সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

মানুষের তদারকি ছাড়া উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। **অ্যানথ্রপিকের সিইও দারিও আমোদেই** চুক্তিতে আইনি সুরক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন যাতে ঘরোয়া নজরদারি এবং স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র তৈরিতে এআই ব্যবহৃত না হয়।

- **অবারিত অ্যাক্সেসের দাবি:** প্রতিরক্ষা দপ্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অ্যানথ্রপিকের এআই মডেলগুলোতে আরও ব্যাপক অ্যাক্সেস চেয়েছিল। কিন্তু অ্যানথ্রপিক তাদের নৈতিক নীতি শিথিল করতে অস্বীকার করলে সরাসরি সংঘাত শুরু হয়।
- **"সাপ্লাই চেইন রিস্ক" হিসেবে চিহ্নিত করার হুমকি:** প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরক্ষা দপ্তর অ্যানথ্রপিককে **"সাপ্লাই চেইন রিস্ক"** (সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ঝুঁকি) হিসেবে তালিকাভুক্ত করার হুমকি দেয়। এই তকমা থাকলে সরকারি ঠিকাদার এবং প্রতিরক্ষা সহযোগীরা অ্যানথ্রপিকের প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হবে।

ওপেনএআই-এর প্রবেশ: চুক্তি এবং মূল পার্থক্য

বিরোধের পর, **ওপেনএআই** (OpenAI) মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে নিজস্ব চুক্তি সম্পাদন করে।

ক. **চুক্তির প্রধান শর্তাবলি:** এই চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট সুরক্ষাকবচ মেনে সামরিক বাহিনী ওপেনএআই-এর সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে:

- আইনসম্মত প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহার করা যাবে।
- যেসব ক্ষেত্রে মানুষের তদারকি বাধ্যতামূলক, সেখানে এআই স্বাধীনভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।
- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অবশ্যই মানুষের হাতে থাকতে হবে।

খ. **কার্যকরী সুরক্ষাকবচ:** ওপেনএআই জানিয়েছে তাদের কাঠামোতে রয়েছে:

- মূলত ক্লাউড-ভিত্তিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে ব্যবহার।
- **'হিউম্যান-ইন-দ্য-লুপ'** (মানুষের প্রত্যক্ষ তদারকি) ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ এআই নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা।

গ. **দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:** মূল পার্থক্যটি হলো সুরক্ষাকবচের আইনি ব্যাখ্যায়:

- **অ্যানথ্রপিক** এমন কঠোর ও বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ চেয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে আইন বা সামরিক নীতি পরিবর্তিত হলেও তাদের এআই যেন স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রে ব্যবহৃত না হয়।
- **ওপেনএআই**-এর চুক্তি মূলত সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দেয়।

অ্যানথ্রপিক–DoD বিরোধের বৃহত্তর প্রভাব

১. **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সামরিকীকরণ**

- এই ঘটনাটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর দ্রুত অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে।
- উন্নত এআই সরঞ্জাম সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও এটি **স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধ** (Autonomous Warfare) এবং **অ্যালগরিদমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের** ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২. **এআই-এর নৈতিক শাসন**

- এই সংঘাতটি কর্পোরেট নৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে ফুটিয়ে তোলে।
- প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে এখন বাণিজ্যিক সুযোগ, নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং ভূ-রাজনৈতিক চাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

৩. **জাতীয় নিরাপত্তায় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা**

- বর্তমানে বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থাগুলো সামরিক শক্তিকে প্রভাবিত করার মতো উন্নত এআই সিস্টেম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- এই উন্নয়ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে:
  - প্রতিরক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে **কর্পোরেট দায়বদ্ধতা**।
  - সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি।
  - এআই প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

৪. **স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক**

- যুদ্ধে এআই-এর ব্যবহার **মারাত্মক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা** (LAWS) নিয়ে বিতর্ককে তীব্রতর করেছে।
- বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা মারণাস্ত্রে **'মানুষের অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ'** (Meaningful Human Control) নিশ্চিত করার জন্য বৈশ্বিক নিয়ম ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দাবি জানিয়েছে।

ভারতের জন্য কৌশলগত তাৎপর্য

ভারত যখন তার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করছে এবং "IndiaAI" ইকোসিস্টেম তৈরি করছে, তখন **অ্যানথ্রপিক–DoD** বিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হিসেবে কাজ করে।

- **প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ:** ডিআরডিও (DRDO) এবং **আইডেক্স (iDEX)**-এর মতো কর্মসূচিগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর ক্রমবর্ধমান সংহতিকে তুলে ধরে। তবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মানুষের তদারকি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
- **কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত স্বায়ত্তশাসন: ইন্ডিয়া এআই মিশন**-এর অধীনে ভারতকে দেশীয় এআই মডেল ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিজস্ব সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি: নীতি আয়োগ**-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩**-এর অধীনে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা দায়িত্বশীল এআই বিকাশের জন্য

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **সামরিক এআই-এর জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন:** জাতিসংঘ (United Nations)-এর মতো সংস্থাগুলোর অধীনে বিশ্বব্যাপী এমন একটি কাঠামো তৈরি করা উচিত যা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং এআই-চালিত যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মাবলি নিয়ন্ত্রণ করবে।

২. **এআই গভর্নেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সরকার এবং সংস্থাগুলোর উচিত সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করা, যার মধ্যে থাকবে:
   - উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সিস্টেমে বাধ্যতামূলক **মানুষের তদারকি (Human Oversight)**।
   - সুদৃঢ় জবাবদিহিতা এবং অডিট (Audit) ব্যবস্থা।
   - এআই প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

৩. **দায়িত্বশীল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) উৎসাহিত করা:** সরকার এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অবশ্যই নৈতিক নীতি, আইনি স্পষ্টতা এবং কার্যকর তদারকি কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৪. **উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা:** এমন নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনকে সচল রাখবে, পাশাপাশি নজরদারি বা স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রে এর অপব্যবহার রোধে কঠোর সুরক্ষাকবচ নিশ্চিত করবে।

উপসংহার

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে বিরোধ এবং পরবর্তীতে ওপেনএআই-এর সাথে চুক্তি—এই ঘটনাপ্রবাহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক শাসন এবং জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে বিবর্তনশীল সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। এআই যেহেতু ক্রমশ সামরিক সক্ষমতাকে নতুন রূপ দিচ্ছে, তাই মানুষের নিয়ন্ত্রণ, আইনি জবাবদিহিতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখা অপরিহার্য। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেন বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা রক্ষা করে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহৃত হয়।

Q. আধুনিক সামরিক সক্ষমতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় AI-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পরীক্ষা করুন এবং এর সামরিকীকরণের সাথে যুক্ত কৌশলগত ও নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন।

3.3.3. সার্বভৌম এআই: ডিজিটাল যুগে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন

প্রেক্ষিত

বর্তমান সময়ে **"কম্পিউট কলোনিয়ালিজম"** বা "গণনাগত উপনিবেশবাদ"-এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে **সার্বভৌম এআই**-এর ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমানে এআই-এর ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু উন্নত দেশের (গ্লোবাল নর্থ) বড় কর্পোরেশনের হাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সার্বভৌম এআই কী?

সার্বভৌম এআই বলতে একটি দেশের নিজস্ব **অবকাঠামো, ডেটা** (তথ্য) এবং **মেধাকে** কাজে লাগিয়ে এআই প্রযুক্তি তৈরি, ব্যবহার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়, যাতে কোনো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করতে না হয়।

সার্বভৌম কাঠামোর চারটি প্রধান স্তম্ভ:

১. **ডেটা সার্বভৌমত্ব:** ভারতের তথ্য দেশের সীমানার ভেতরে রাখা এবং এমন মডেল তৈরি করা যা আমাদের দেশের স্থানীয় সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য বুঝতে পারে।

২. **কম্পিউট সার্বভৌমত্ব:** বিদেশি সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয়ভাবে **"কম্পিউট ব্যাঙ্ক"** (GPUs) স্থাপন করা।

৩. **অ্যালগরিদমিক সার্বভৌমত্ব:** এমন মূল এআই মডেল তৈরি করা যা "পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তি" বা ভ্রান্ত ধারণার বদলে ভারতীয় **সংস্কৃতি** ও **ভাষাকে** সঠিকভাবে তুলে ধরবে।

৪. **গভর্নেন্স বা শাসন সার্বভৌমত্ব:** এআই-এর নৈতিকতা ও নিয়মকানুন যেন ভারতের নিজস্ব আইনি কাঠামোর (যেমন- DPDP Act 2023) ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

ভারতের কেন সার্বভৌম এআই প্রয়োজন?

১. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ("ডিজিটাল উপনিবেশবাদ" বন্ধ করা)**

- **ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** এটি আমেরিকা বা চীনের এআই সিস্টেমের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমায়।
- **নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** বিদেশি শক্তি যদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বা ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করে, তবুও যেন আমাদের প্রতিরক্ষা, পুলিশ এবং মহাকাশ গবেষণার মতো জরুরি পরিষেবাগুলো সচল থাকে।

২. **সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ("ভাষিণী" ফ্যাক্টর)**

- **মাতৃভাষায় ব্যবহার:** বিশ্বজুড়ে প্রচলিত এআই মডেলগুলো মূলত পশ্চিমা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ভারতের ২২টি সরকারি ভাষা এবং স্থানীয় উপভাষাগুলো বোঝার জন্য **'বচনা'** ও **'ভারত-জেন'**-এর মতো নিজস্ব মডেল প্রয়োজন।
- **প্রযুক্তির লোকতন্ত্রীকরণ:** এর ফলে গ্রামীণ ভারতের একজন কৃষক দেশের বাইরে তথ্য না পাঠিয়েই নিজের মাতৃভাষায় সরকারি পরামর্শ পেতে পারবেন।

৩. **ডেটা সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা**

- **তথ্য সুরক্ষা:** আধার, ইউপিআই (UPI) বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার মতো সংবেদনশীল জাতীয় তথ্য যেন বিদেশি সার্ভারে না যায় তা নিশ্চিত করা।
- **মেধা সম্পদ রক্ষা:** ভারতীয় স্টার্টআপগুলোর উদ্ভাবন যেন বিদেশি এআই মডেলের খোরাক হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, তা রক্ষা করা।

৪. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**

- **মূল্য ধরে রাখা:** ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি-তে এআই প্রায় **৫০০ বিলিয়ন ডলার** অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। সার্বভৌম এআই এই বিশাল অংকের অর্থ দেশের ভেতরেই রাখতে সাহায্য করবে।
- **খরচ নিয়ন্ত্রণ:** বিদেশি সংস্থাগুলোর চড়া দামের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কম খরচে কম্পিউটিং সুবিধা (যেমন- ইন্ডিয়া এআই মিশনের অধীনে সাশ্রয়ী জিপিইউ সুবিধা) প্রদান করা।

৫. **সর্বস্তরের সুশাসন**

- **ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন:** ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আধার, ইউপিআই) এর সাথে এআই-কে যুক্ত করে স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা।
- **স্থানীয় সমস্যার সমাধান:** বিদেশি মডেলগুলো সাধারণ কাজের জন্য তৈরি; কিন্তু ভারতের বর্ষার পূর্বাভাস বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ফসলের রোগ নির্ণয়ের জন্য আমাদের **"বিশেষায়িত মডেল"** প্রয়োজন।

৬. **নৈতিক এবং পক্ষপাতহীন এআই**

- **পাশ্চাত্য প্রভাব দূর করা:** আইনি বা সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাকেই "একমাত্র সঠিক" হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রোধ করা।

- **স্বচ্ছতা:** সার্বভৌম মডেল থাকলে সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারবে যে এআই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ধর্মের প্রতি বৈষম্য করছে কি না।

সার্বভৌম এআই বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"কম্পিউট" ঘাটতি:** ভারত বর্তমানে বিদেশি জিপিইউ-এর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতের নিজস্ব ক্ষমতা বাড়লেও বিশ্বসেরা টেক জায়ান্টদের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

২. **তথ্যের মান ও "টোকেন অসমতা":** ভারতের হাতে প্রচুর তথ্য থাকলেও তা সরকারি নথিপত্রে অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তথ্যের অভাব থাকায় সেই সব ভাষায় এআই ব্যবহার করা ব্যয়বহুল এবং কম নির্ভুল হয়ে পড়ে।

৩. **পাশ্চাত্য ভ্রান্ত ধারণা (Western Hallucinations):** বেশিরভাগ এআই মডেল পশ্চিমা তথ্যে শিক্ষিত হওয়ায় তারা ভারতের সামাজিক নিয়ম, জাতির বৈচিত্র্য বা স্থানীয় ঐতিহ্য বুঝতে ভুল করে, যা বিভ্রান্তিকর ফলাফল দিতে পারে।

৪. **মেধা পাচার (Brain Drain):** ভারতের প্রচুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও মূল এআই গবেষকের সংখ্যা অনেক কম। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমাদের সেরা মেধাবীরা বিদেশের (সিলিকন ভ্যালি) কোম্পানিতে চলে যাচ্ছেন।

৫. **আইনি ও নৈতিক জটিলতা:** ভারতে এখনও পূর্ণাঙ্গ "এআই আইন" নেই। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা স্পষ্ট না হওয়ায় (Black Box Problem) জনকল্যাণমূলক কাজে বৈষম্যের ঝুঁকি থেকে যায়।

৬. **আর্থিক ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা:** এআই মডেল তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদী এবং বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, যা ভারতে সীমিত। এছাড়া এআই ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর বিদ্যুৎ ও জল খরচ করে, যা ভারতের ২০৭০ সালের মধ্যে **"নেট জিরো"** বা দূষণমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সার্বভৌম এআই-এর জন্য সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. **ইন্ডিয়া এআই মিশন (IndiaAI Mission):** দেশীয় এআই ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য ১০,৩৭২ কোটি টাকার একটি "ফুল-স্ট্যাক" মিশন। এর অধীনে স্টার্টআপদের গবেষণার খরচ কমাতে অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে (প্রায় **৬৫ টাকা/ঘণ্টা**) জিপিইউ (GPU) ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

২. **ইন্ডিয়া এআই কম্পিউট পিলার (IndiaAI Compute Pillar):** ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ **১,০০,০০০ জিপিইউ** যুক্ত করে কম্পিউটিং ক্ষমতার ঘাটতি মেটানোর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, যা দেশীয় মডেলগুলোর জন্য উচ্চগতির প্রসেসিং ক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

৩. **ভারত-জেন (BharatGen) ও ভাষিণী (Bhashini):**

- **ভারত-জেন:** ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি প্রথম সরকারি অর্থায়নে নির্মিত মাল্টিমোডাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)।
- **ভাষিণী:** ২২টি তফসিলি ভাষায় রিয়েল-টাইম এআই অনুবাদের একটি মিশন, যা ডিজিটাল পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।

৪. **এআই-কোষ:** একে **"ডেটা-সাগর"** বলা হয়। এতে ৯,৫০০-এর বেশি দেশীয় ডেটাসেট রয়েছে, যা পশ্চিমা তথ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে উচ্চমানের প্রশিক্ষণের উপাদান (Data Fuel) সরবরাহ করে।

৫. **ইন্ডিয়া এআই ফিউচার স্কিলস:** ১৩,৫০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞ (PhD, PG, UG) তৈরির একটি লক্ষ্যমাত্রা। এর অধীনে ছোট শহরগুলোতে (Tier-2/3) ডেটা কিউরেশন এবং অ্যানোটেশনের জন্য **এআই ডেটা ল্যাব** স্থাপন করা হচ্ছে।

৬. **সার্বভৌম ক্ষমতা হাব:** ওড়িশা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক এআই-অপ্টিমাইজড ডেটা সেন্টার স্থাপন, যা খনি শিল্প, নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **মিতব্যয়ী উদ্ভাবন (Small Language Models - SLMs):** কৃষি বা আইনের মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ছোট এবং সাশ্রয়ী এআই মডেল (SLM) তৈরিতে জোর দেওয়া। এতে বিদ্যুৎ খরচ এবং কম্পিউটিং ক্ষমতা—উভয়ই কম লাগে।
- **সিলিকন-টু-সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন:** ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM)-এর সাথে এআই মিশনকে যুক্ত করা। নিজস্ব **এআই এক্সিলারেটর (ASICs)** ডিজাইন করলে ভারত কেবল সফটওয়্যার নয়, হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হবে।
- **'পেশেন্ট ক্যাপিটাল' বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ:** গভীর-প্রযুক্তি (Deep-tech) স্টার্টআপদের জন্য একটি **'এআই সার্বভৌম তহবিল'** গঠন করা। এতে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকবে।
- **গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব:** ভারতের এই "এআই স্ট্যাক" অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানি করা। একটি **"গ্লোবাল সাউথ এআই অ্যালায়েন্স"** গড়ে তোলার মাধ্যমে আমেরিকা-চীনের দ্বিমেরু প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানানো।
- **টেকসই এআই (Green Compute):** এআই ডেটা সেন্টারগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং **"সার্কুলার কুলিং"** প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে ভারতের ২০৭০ সালের **'নেট জিরো'** লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত না হয়।

উপসংহার

সার্বভৌম এআই কেবল একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়; এটি একটি **সভ্যতাগত প্রয়োজনীয়তা**। বিশ্ব যখন "পঞ্চম শিল্প বিপ্লব"-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত তার চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো বিদেশের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। নিজস্ব এআই স্ট্যাক তৈরির মাধ্যমে ভারত নিশ্চিত করছে যে তার ডিজিটাল ভবিষ্যৎ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নৈতিক এবং প্রকৃত অর্থেই **'আত্মনির্ভর'**।

*Q. "আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান প্রযুক্তিগত **সার্বভৌমত্ব** নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।" ভারতে একটি **সার্বভৌম এআই ইকোসিস্টেমের** প্রয়োজনীয়তা এবং এটি অর্জনের চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করুন।*

***

Scan to attempt more questions...

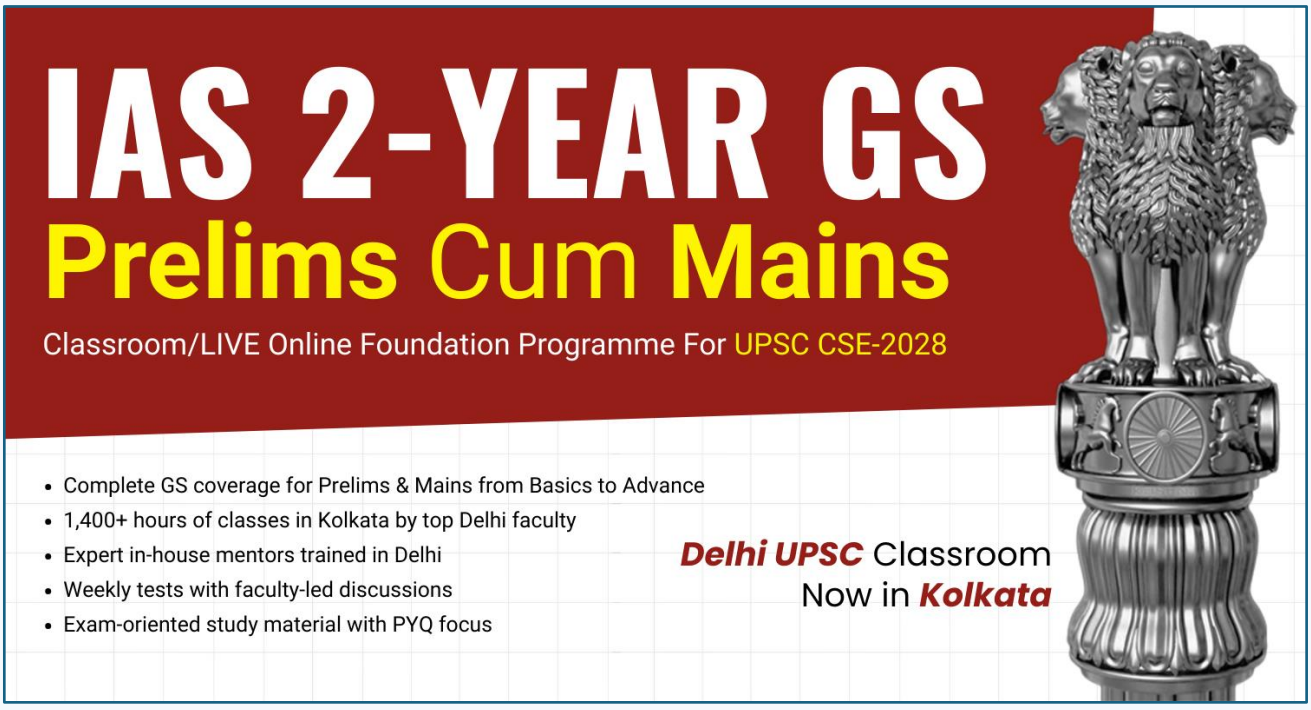

সাধারণ অধ্যয়ন ৪

4.1. নীতিশাস্ত্র

4.1.1. অমর্ত্য সেনের 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ' বা সক্ষমতা তত্ত্বের সহজ পাঠ

ভূমিকা

- ঐতিহ্যগতভাবে উন্নয়নকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিমাপ করা হতো। মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং মাথাপিছু আয়ের মতো সূচকগুলোকেই অগ্রগতির প্রধান মাপকাঠি হিসেবে দেখা হতো।
- এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক **অমর্ত্য সেন** তাঁর **সক্ষমতা তত্ত্ব (Capabilities Approach)** প্রস্তাব করেন। তিনি উন্নয়নকে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসেবে নয়, বরং মানুষের **স্বাধীনতা** এবং **পছন্দের পরিধি বিস্তৃতি** হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সক্ষমতার ধারণা: দক্ষতা ও আয়ের ঊর্ধ্বে (The Idea of Capability)

সেন-এর কাঠামোর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো **'সক্ষমতা' (Capability)**, যা প্রচলিত দক্ষতা বা যোগ্যতার চেয়ে অনেক গভীর। সক্ষমতা তত্ত্ব অনুযায়ী, সক্ষমতা হলো সেই বাস্তব স্বাধীনতা যা একজন ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন।

সেন এখানে 'ফাংশনিং' (Functioning) এবং 'ক্যাপাবিলিটি' (Capability)-এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়েছেন:

- **ফাংশনিং (Functioning):** এটি একজন ব্যক্তির বাস্তব অর্জনকে বোঝায়—যেমন সুস্থ থাকা, শিক্ষিত হওয়া বা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া।
- **সক্ষমতা (Capability):** এটি মূলত সেই সুযোগ বা স্বাধীনতাকে বোঝায় যা মানুষকে কাঙ্ক্ষিত 'ফাংশনিং' অর্জনে সাহায্য করে।

একই আয় হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সচলতার সুযোগের অভাবে দুই ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। এই সুযোগগুলো জীবনের পছন্দকে প্রশস্ত করে, আর সুযোগের অভাব পছন্দকে সীমিত করে। তাই উন্নয়নকে কেবল আয় বা ফলাফলের ভিত্তিতে নয়, বরং মানুষের প্রাপ্ত **সুযোগ ও স্বাধীনতার** ভিত্তিতে বিচার করা উচিত।

উন্নয়ন নিয়ে নতুন ভাবনা: জিডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের সীমাবদ্ধতা

১. **অর্থনৈতিক সংকোচনবাদ (Economic Reductionism):** জিডিপি কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হিসাব দেয়, কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির আংশিক চিত্রই ফুটিয়ে তোলে।

২. **বণ্টনগত অন্ধত্ব (Distributional Blindness):** উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বৈষম্যও থাকতে পারে, যা সমাজের বড় একটি অংশকে প্রান্তিক বা দরিদ্র করে রাখতে পারে।

৩. **সামাজিক দিকের অবহেলা:** জিডিপি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নাগরিক স্বাধীনতার মতো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

প্রবৃদ্ধির ভূমিকা: অমর্ত্য সেনের মতে, অর্থনৈতিক সূচকগুলো কেবল উন্নয়নের একটি **'মাধ্যম'** হওয়া উচিত; প্রকৃত উন্নয়ন নিহিত রয়েছে মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার বিস্তারের মধ্যে।

উন্নয়ন মানেই মানুষের স্বাধীনতার বিস্তার

সেন উন্নয়নকে মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা হলো উন্নয়নের **প্রাথমিক লক্ষ্য** এবং উন্নয়নের **প্রধান মাধ্যম**।

মানুষের স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক একে অপরের সাথে যুক্ত:

- **রাজনৈতিক স্বাধীনতা:** ভোট দেওয়ার অধিকার, মতপ্রকাশ এবং গণতান্ত্রিক শাসনে অংশগ্রহণ।
- **অর্থনৈতিক সুবিধা:** কর্মসংস্থান, ঋণ এবং বাজার ব্যবহারের সুযোগ।
- **সামাজিক সুযোগ:** শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য সরকারি পরিষেবা।
- **সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা:** চরম অভাব, শোষণ বা সামাজিক বর্জন থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা।

এই স্বাধীনতাগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে—যেমন, শিক্ষা ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, যা আবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়ায়। এভাবে উন্নয়ন মানুষের **পছন্দের সীমা** বাড়িয়ে দেয় এবং মানুষ কেবল সুবিধাভোগী নয়, বরং নিজের জীবন গড়ার **সক্রিয় কারিগর** (Agents of Change) হয়ে ওঠে।

স্বায়ত্তশাসনের সমতা এবং মানুষের সক্রিয় ভূমিকা

- অমর্ত্য সেনের তত্ত্বের একটি অপরিহার্য দিক হলো **স্বায়ত্তশাসনের সমতা** (Equality of Autonomy)। এটি জোর দেয় যে, প্রত্যেকের নিজের জীবন গড়ার এবং স্বপ্ন পূরণের সমান সুযোগ থাকা উচিত।
- এর জন্য শিক্ষা, তথ্যের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মতো পরিবেশ প্রয়োজন। উন্নয়ন কেবল মানুষকে সুবিধা দেওয়া নয়, বরং মানুষকে শক্তিশালী করা যাতে তারা নিজেদের জীবন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে।

নীতি ও ন্যায়: প্রতিষ্ঠান বনাম বাস্তব বিচার (Niti and Nyaya)

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে অমর্ত্য সেন **'নীতি'** (Niti) এবং **'ন্যায়'** (Nyaya)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন:

- **নীতি** (Niti): এটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম এবং ব্যবস্থার নির্ভুল দিকটিকে বোঝায়।
- **ন্যায়** (Nyaya): এটি বাস্তব জীবনে মানুষের মঙ্গলের ওপর সেই নিয়মের প্রভাব বা প্রকৃত বিচারকে বোঝায়।

সক্ষমতা তত্ত্ব বা 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ'-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সক্ষমতা নির্ধারণে আদর্শগত বিতর্ক:** সক্ষমতা তত্ত্বের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—কোনগুলো 'মূল সক্ষমতা' তা চিহ্নিত করা। **মার্থা নুসবাউম** এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের কেন্দ্রীয় সক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তাব করেছেন (যেমন—শারীরিক স্বাস্থ্য, আবেগীয় সুস্থতা, যুক্তি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ)। তিনি যুক্তি দেন যে, মানবিক মর্যাদার ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে রাষ্ট্রকে এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। তবে **অমর্ত্য সেন** সক্ষমতার কোনো সর্বজনীন তালিকা তৈরির বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি সমাজকে **গণতান্ত্রিক আলোচনার** (Public Reasoning) মাধ্যমে নিজস্ব সক্ষমতাগুলো বেছে নিতে হবে। এর ফলে একটি বড় চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়: সক্ষমতা চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো **সর্বজনীন ঐক্যমত্যের অভাব**।

২. **তত্ত্বকে নীতিতে রূপান্তরের সমস্যা (প্র্যাক্সিস সমস্যা):** তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে, যাকে দর্শনের ভাষায় **'প্র্যাক্সিস'** (Praxis) বলা হয়।
   - **নীতি নির্ধারণে চ্যালেঞ্জ:** সক্ষমতা তত্ত্ব একটি শক্তিশালী আদর্শগত কাঠামো দিলেও একে সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিতে রূপান্তর করা বেশ জটিল।
   - **শাসনে প্রয়োগ:** সরকারকে স্বাধীনতা ও সুযোগের ধারণাগুলোকে সর্বজনীন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো বাস্তব নীতিতে রূপান্তর করতে হয়।
   - **প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা:** মূল চ্যালেঞ্জ হলো প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কেবল মুখে সক্ষমতার কথা না বলে বাস্তবে মানুষের সুযোগের পরিধি বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৩. **পরিমাপ এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ:**

- **পরিমাপের সমস্যা:** জিডিপি বা আয়ের মতো সূচকগুলো সহজেই গণনা করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং অংশগ্রহণের মতো **গুণগত (Qualitative)** বিষয়গুলো পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন।
- **রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ:** বর্তমানে **'প্লুটোক্র্যাটিক পপুলিজম'** (যেখানে মুষ্টিমেয় ধনী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে সাধারণ মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে) বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়নের আলোচনা কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মতো মূল নীতিগুলো গুরুত্ব হারাচ্ছে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার বনাম বাস্তব ফলাফল:** এই তত্ত্ব ন্যায়বিচারের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে। **জন রলস** তাঁর 'ভেইল অফ ইগনোরেন্স' (Veil of Ignorance) বা 'অজ্ঞতার আবরণ' ধারণার মাধ্যমে এমন একটি ন্যায্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা বলেছেন যা সাম্য ও ন্যায়বিচার রক্ষা করবে। সেন রলসের এই কাঠামোকে সম্মান জানালেও তিনি মনে করেন যে, কেবল প্রতিষ্ঠানের গঠন দেখে ন্যায়বিচার বিচার করা যায় না। বরং নজর দিতে হবে **বাস্তব সামাজিক ফলাফল** এবং মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর। অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলো তাত্ত্বিকভাবে ন্যায্য মনে হলেও বাস্তবে বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হয়।

সক্ষমতা তত্ত্বকে শক্তিশালী করার পথনির্দেশ

১. **সক্ষমতা নির্ধারণে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ:** সমাজকে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রধান সক্ষমতাগুলো চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করতে হবে। এতে নাগরিক, বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি হবে।

২. **কার্যকর জননীতিতে রূপান্তর:** সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সক্ষমতা তত্ত্বকে যুক্ত করতে হবে। সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমবাজার তৈরির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **বহুমাত্রিক সূচক তৈরি করা:** কেবল জিডিপির ওপর নির্ভর না করে **মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)**, সামাজিক অগ্রগতি সূচক এবং জনকল্যাণমূলক পরিমাপক গ্রহণ করতে হবে যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মর্যাদাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি:** 'প্লুটোক্র্যাটিক পপুলিজম'-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা তত্ত্ব উন্নয়নের একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। যেখানে অগ্রগতি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে নয়, বরং মানুষের **স্বাধীনতা, পছন্দ এবং সক্রিয় ভূমিকার (Agency)** বিস্তৃতি দিয়ে পরিমাপ করা হবে।

Q. যদিও 'সামর্থ্য-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি' (Capabilities Approach) উন্নয়ন-সংক্রান্ত আলোচনাকে আমূল বদলে দিয়েছে, তবুও এটি বেশ কিছু ধারণাগত ও ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।

Scan to attempt more questions...

***

PROF. (DR.) SAMIT RAY
Chairman of RICE Group and
Chancellor of Adamas University

RICE IAS

Delhi's Top Notch IAS Faculty Now At Kolkata

2-YEAR GS PRELIMS & MAINS

Classroom/LIVE Online Foundation Programme

FOR UPSC-CSE 2028

Under the guidance of

S.A. MAJID

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

KNOW YOUR FACULTY MEMBERS

AKSHAY VRAT
Experience – 12+ Yrs
Subject – Environment

DR. K SHIVESH
Experience – 20+ Yrs
Subject – Modern History

ALOK KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Science & Tech.

DR. KUMUD RANJAN
Experience – 20+ Yrs
Subject – Polity & Constitution

AMIT KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Economics

VIJAY KUMAR
Experience – 07+ Yrs
Subject – Society

ANKIT SHARMA
Experience – 10+ Yrs
Subject – International Relations

KARUNA MISHRA
Experience – 07+ Yrs
Subject – Geography

PANKAJ SINGH
Experience – 10+ Yrs
Subject – AMC

DR. P M TRIPATHI
Experience – 25+ Yrs
Subject – Essay

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442

Through the Eyes of Aspirants

Monthly Current affairs magazine of RICE IAS is really helping me alot. It is comprehensively covering current events with segregation of topics in subject wise.

P.V Surendra

The topics are comprehensively covered in each magazine content was crisp, clear & to the point that are very much important for the preparation & the current is also covered with the static part. Keep up the good work:

Kishore Muddada

By reading current affairs, it has become easy to conclude the important news at the end of monthly magazine.

Shreya Mondal

The monthly magazines for current affairs are exam-oriented and written in a very concise manner suitable for performing well in the examinations.

Aindrila saha

By reading Current Affairs it has become easy to conclude the important news at the end of the month.

Kashish Kapoor

Provides gainful insights about the current relevant news. Really beneficial.

Sulagna Roy

RICE IAS

GET CLOSER TO YOUR

IAS & IPS DREAMS

"Bengal once led India in the Civil Services, producing pioneers like Satyendra Nath Tagore and Subhas Chandra Bose. Today, we must revive that legacy. With the right guidance and training, Bengal's youth can again shape governance and nation-building. When Bengal's students rise, the whole nation prospers".

Prof. (Dr.) Samit Ray

CHAIRMAN OF RICE GROUP
& CHANCELLOR OF ADAMAS UNIVERSITY

S.A. MAJID

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

Rishita Das
UPSC CSE 2024
AIR 840

Pemba Narbu Sherpa
UPSC CAPF (AC) 2022
AIR 140

Tamali Saha
IFoS 2021
AIR 94

Sealdah, Kolkata — 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi — 9933118849

At Adamas University — 8100971442